সার আর্থার কোনান ডয়েল-এর

হারানো পৃথিবী

কাজী মাহবুব হোসেন

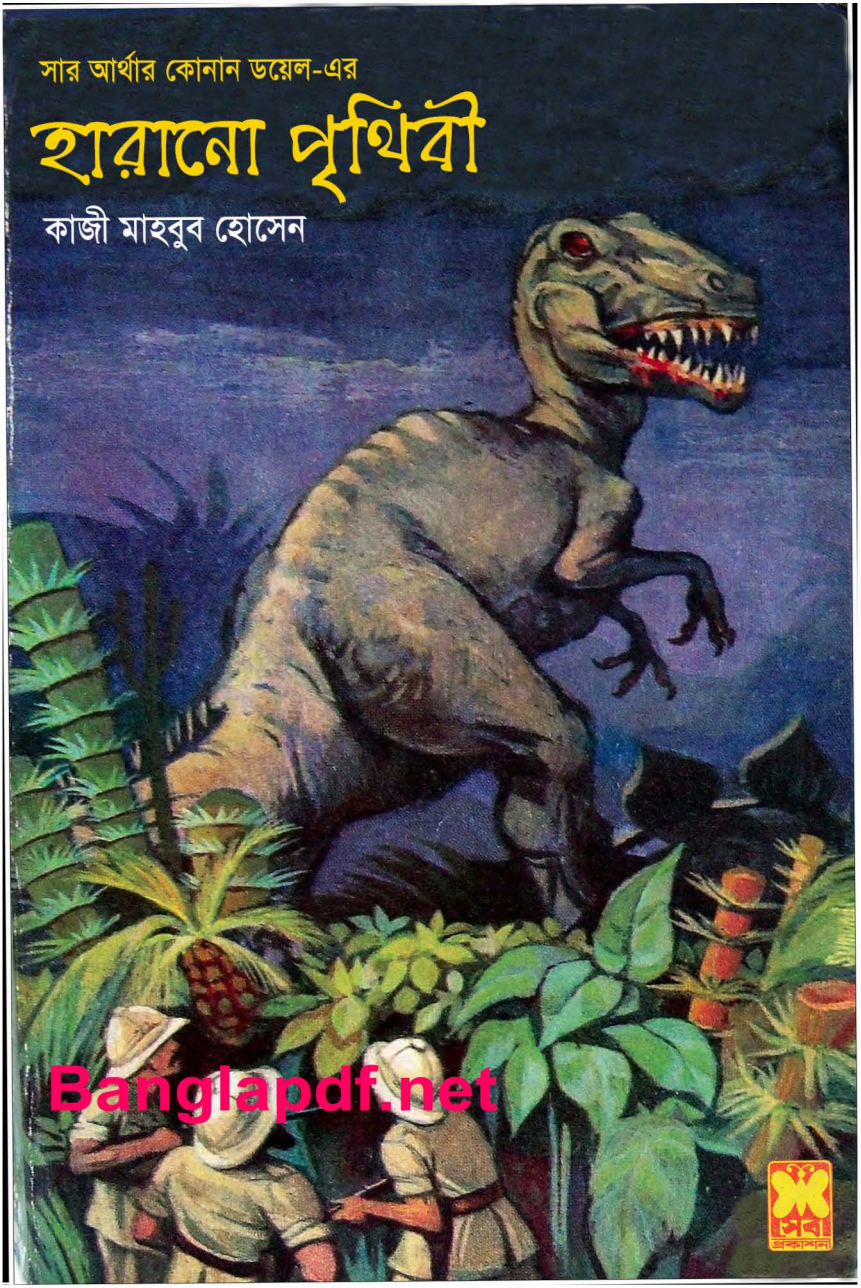

Banglapdf.net

সবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

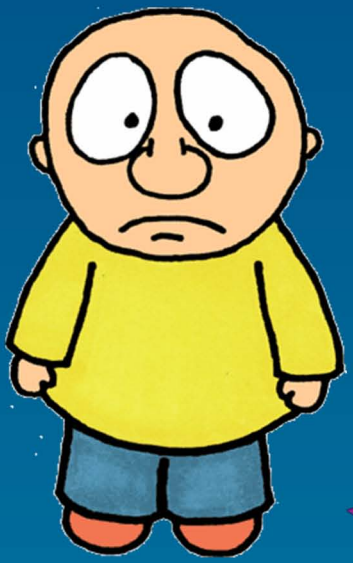

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ
ক্লিওপেট্রা/সায়েম সোলায়মান
জেস/সায়েম সোলায়মান
মন্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন
লর্ড লিটন/নিয়াজ মোরশেদ
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই
স্যার ওয়াল্টার স্কট/কাজী মায়মুর হোসেন
রব রয়
কেন ফলেট/শেখ আবদুল হাকিম
আততায়ী
লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার/কাজী আনোয়ার হোসেন
ফার্মার বয়
লিটল হাউজ অন দ্য প্রেয়ারি
অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক
লিটল টাউন অন দ্য প্রেয়ারি
রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী আনোয়ার হোসেন
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান
লাভ অ্যাট আর্মস
রূপসী বন্দিনী
টমাস হার্ডি/কাজী শাহনূর হোসেন
টেস অভ দ্য ডার্বারভিল
ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড
জুড দ্য অবসকিওর
দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ
চার্লস কিংসলে/শেখ আবদুল হাকিম
হাইপেশিয়া
এইচ. দ্য ভের স্ট্যাকপোল/মামনুন শফিক
ব্লু লেগুন
হেনরি হল কেইন/কাজী মায়মুর হোসেন
দ্য বন্ডম্যান
স্ট্যানলি ওয়েইম্যান/কাজী আনোয়ার হোসেন
আ জেন্টলম্যান অভ ফ্রান্স
আলেকযান্ডার বেলায়েভ/কাজী মায়মুর হোসেন
দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
দ্য ফিফ্‌থ কলাম/শেখ আপালা হাকিম
আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস/নিয়াজ মোরশেদ
আলেকজান্দার দ্যুমা
মার্গারেট ডি-ভ্যালয়/শেখ আপালা হাকিম
ভাইকাউন্ট দ্য ব্র্যাগেলোঁ/শেখ আপালা হাকিম
জেরাল্ড ডুরেল
মানবজন্তু/অনীশ দাস অপু
মাতাল অরণ্য/রকিব হাসান
ভিক্টোরিয়া হল্ট
স্বপ্নসখা/রোকসানা নাজনীন
এরিক মারিয়া রেমার্ক
দ্য রোড ব্যাক/মাসুদ মাহমুদ
স্বপ্ন মৃত্যু ভালোবাসা/জাহিদ হাসান
রবার্ট লুই স্টিভেনসন
কিডন্যাপড/নিয়াজ মোরশেদ
ক্যাট্রিওনা/শেখ আপালা হাকিম
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল
বাস্কারভিলের হাউন্ড/আসাদুজ্জামান
হারানো পৃথিবী/কাজি মাহবুব হোসেন
কর্নেল জে. এ. প্যাটারসন/সেলিম আনোয়ার
সাভোর মানুষখেকো
পি. জি. ওডহাউস/এ. টি. এম. শামসুদ্দীন
ক্যারি অন, জীভ্‌স্
স্টুয়ার্ট ক্লোয়েট/খসরু চৌধুরী
অভিশাপ

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়

হারানো পৃথিবী

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল/কাজি মাহবুব হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২

এক

মেয়েটির বাবা মিস্টার হাঙ্গারটন। নিতান্ত ভালমানুষ, তবে তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধির কিছুটা অভাব আছে। নিজের জগৎ আর পছন্দের বিষয়টি ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। গ্ল্যাডিসের কাছ থেকে আমাকে যদি কোনদিন সরে যেতে হয়, তার কারণ হবে মিস্টার হাঙ্গারটনের জামাতা হবার ভয়। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, সপ্তাহে তিনদিন আমি যে চেস্টনাটস যাই সেটা তাঁর সাহচর্যের লোভে; বিশেষ করে সোনা রূপা দ্বৈত ধাতুর মুদ্রা ব্যবস্থা বিষয়ে তাঁর মতামত জানার আগ্রহে।

আজ সন্ধ্যায় একঘণ্টার উপরে একঘেয়ে বক্তৃতা শুনতে হয়েছে আমাকে: কেমন করে ময়লা টাকা ভাল টাকাকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেয়; রূপার প্রকৃত প্রতীক মান কি, ভারতবর্ষে টাকার মূল্যমান হ্রাস আর মুদ্রা বিনিময়ের সত্যিকার হার, ইত্যাদি। এসব বিষয়ে উনি একজন বিশেষজ্ঞ।

'ধরো পৃথিবীর সব ধার দেনা একসাথে ফেরত চাওয়া হলো, আর কার্যকরও করা হলো–কি ঘটবে তা হলে?' প্রশ্ন করলেন মিস্টার হাঙ্গারটন।

'তা হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।' আমার স্বভাবজাত হালকা ভাবেই বললাম আমি। জবাবটা শুনে লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার হাঙ্গারটন। আমা হেন হালকা স্বভাবের লোকের সাথে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা যায় না। কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি, মেসনিক সভায় যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে।

এতক্ষণে আমি গ্ল্যাডিসকে একা পেলাম। চরম মুহূর্ত! সারাটা সন্ধ্যা আমার মনের অবস্থা ছিল একজন সৈনিকের মত। বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করার জন্যে তৈরি। সংশয়ে দুলছে মন–জয়, নাকি পরাজয়, লেখা আছে ভাগ্যে?

বসে আছে ও–পিছনের লাল পর্দায় তার গর্বিত কোমল মুখের কাঠামোটা ফুটে উঠেছে। সত্যিই সুন্দর ও, কিন্তু যেন অনেক দূরের। বন্ধুত্ব আছে আমাদের–বেশ গাঢ় বন্ধুত্ব। কিন্তু কোনদিনই ওর খুব কাছে আসতে পারিনি আমি। 'গেজেট' পত্রিকার সহকর্মীদের সাথে যেমন সহজ সরল কামনাবিহীন সম্পর্ক–গ্ল্যাডিসের সাথেও তাই। মেয়েরা আমার সাথে বেশি দিলখোলা হোক বা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করুক এটা আমার কাম্য নয়। এতে পৌরুষের হানি হয়। যৌন চেতনার শুরুতেই ভীরু-নম্রতা আর অবিশ্বাস মানুষের সঙ্গী। উত্তরাধিকার সূত্রে পুরানো আমলের নৈতিকতাহীন যুগ থেকেই প্রেম আর বলাৎকার পাশাপাশি চলেছে। নত মাথা, চোরা চাউনি, কাঁপা কাঁপা গলা, অস্থিরতা এসবই হলো কামনার লক্ষণ–অসঙ্কোচ চাউনি বা স্পষ্টবাদিতা নয়। বয়স কম হলেও এটুকু

জেনেছি আমি এরই মধ্যে। হয়তো এটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

নারীসুলভ সব গুণেরই অধিকারী গ্ল্যাডিস। নিন্দুকেরা ওকে একটু কঠিন আর আবেদনবিহীন বলে, কিন্তু সেটা নেহায়েত অন্যায়। প্রাচ্যের উজ্জ্বল তামা রঙের কোমল দেহ, ঘন কালো চুল, বড় বড় মায়াময় চোখ, টসটসে দুটো ঠোঁট। যে-কোন পুরুষের কামনা জাগানোর সব উপাদানই রয়েছে ওর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওর মধ্যে কামনা জাগানোর কৌশলটা আজও আমি আয়ত্ত করতে পারিনি। যা হোক, আজ একটা হেস্তনেস্ত করবই–পরিণাম যা-ই হোক না কেন। না হয় প্রত্যাখ্যান করবে, তার বেশি আর কি? ভাইবোনের সম্পর্ক রাখার থেকে ব্যর্থ প্রেমিক হওয়া ঢের ভাল।

নিজের চিন্তার মাঝেই ডুবে ছিলাম এতক্ষণ। অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙতে যাচ্ছি, এমন সময় বড় বড় চোখ দুটো তুলে সে চাইল আমার দিকে। অহঙ্কারী মাথাটা দুলিয়ে হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি মনে হচ্ছে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছ, নেড? সেটা না করাই ভাল। এই তো বেশ আছি।'

চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি করে জানলে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছি?'

'মেয়েরা সব সময়ই টের পায়। পৃথিবীর কোন মেয়েই অপ্রত্যাশিত বিয়ের প্রস্তাব পায়নি। কিন্তু দেখো তো, নেড, আমাদের বন্ধুত্ব কত সুন্দর আর কত মধুর। এটাকে নষ্ট করে দিও না। ভেবে দেখো, দু'জন যুবক-যুবতীর এরকম সামনাসামনি বসে গল্প করাটা কত আনন্দের!'

'জানি না, গ্ল্যাডিস। সে রকম গল্প তো আমি–আমি স্টেশন মাস্টারের সাথে মুখোমুখি বসেও করতে পারি।' কেন যে স্টেশন মাস্টারের কথা আমার হঠাৎ মনে এল তা আমি নিজেও জানি না। দু'জনে একসাথে হেসে উঠলাম। 'ওতে আমি মোটেও সন্তুষ্ট নই। আমি চাই তোমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে–তোমার মাথা থাকবে আমার বুকে। ওহ্, গ্ল্যাডিস, আমি চাই–'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল গ্ল্যাডিস। বুঝেছে সে, হয়তো যা চাই তা আদায়ের চেষ্টা করব।

'সব মাটি করে দিলে তুমি, নেড। সব কিছু এত সুন্দর, এত সহজ, স্বাভাবিক ছিল–এর মাঝে ওসব টেনে এনে পরিবেশটাই নষ্ট করে দিলে। নিজেকে সংযত রাখতে পারো না কেন?'

'এটা আমি আবিষ্কার করিনি,' ওকালতির চেষ্টা করলাম। 'এটা খুব স্বাভাবিক, এটাই প্রেম।'

'দু'পক্ষেরই প্রেম থাকলে হয়তো অন্য রকম হত, কিন্তু আমি তো অমন করে কিছু অনুভব করিনি।'

'কিন্তু, গ্ল্যাডিস, তোমার এই রূপ, এই কোমল হৃদয়–ভালবাসার জন্যেই তোমার সৃষ্টি! ভাল যে তোমাকে বাসতেই হবে।'

'অন্তর থেকে ভালবাসা না আসা পর্যন্ত অন্যজনকে অপেক্ষা করতে হয়।'

'কিন্তু আমাকে কেন ভালবাসতে পারো না তুমি? আমি কি দেখতে এতই খারাপ?'

একটু নরম হলো গ্ল্যাডিস। একটা হাত সামনে বাড়াল সে–সামনে ঝুঁকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে আমার মাথাটা একটু পিছনে ঠেলে ধরল। আমার মুখটা ভাল করে দেখে সবজান্তার মত একটু হাসল।

'না, তা নয়। তুমি আত্মাভিমানী ছেলে নও জানি। তবে বলতে দোষ নেই–কারণটা আরও গভীর।'

'আমার চরিত্র?'

প্রবল ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সে।

'কি করে শোধরাতে পারি আমি? বসো, একটু বিশদ ভাবে আলাপ করি ব্যাপারটা। তুমি না বসা পর্যন্ত কোন কথাই বলব না আমি।'

আমার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে সসঙ্কোচে বসল সে।

'এখন বলো আমার কি দোষ?'

'আমি আর একজনকে ভালবাসি,' জবাব দিল গ্ল্যাডিস।

এবার আমার চমকে উঠবার পালা।

'না, নির্দিষ্ট কাউকে নয়,' আমার মুখের ভাব দেখে হাসতে হাসতে বলল ও। 'একটা আদর্শের কথা বলছি আমি। যে মানুষের কথা বলছি, আজও তার দেখা পাইনি।'

'বলো তো সে কেমন–তোমার সেই মনের মানুষ?'

'দেখতে সে তোমার মতও হতে পারে।'

'খুবই খুশি হলাম তোমার কথায়। তা হলে সে ব্যক্তি এমনকী করতে পারে যা আমি পারি না? কি করতে হবে আমাকে বলে দাও, গ্ল্যাডিস। শুধু চা খেয়ে থাকতে হবে, নিরামিষভোজী হতে হবে, বৈমানিক, নাকি সুপারম্যান? জানলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম তোমার মনের মানুষ হতে পারি কি না।'

পেশার বৈচিত্র্য শুনে হেসে ফেলল গ্ল্যাডিস। 'প্রথমত, আমার মনে হয় না যে আমার মনের মানুষটি এমন কথা বলবে। সে হবে অনেক শক্ত আর সমর্থ। নিজেকে সে এভাবে একটা মেয়ের ইচ্ছার কাছে সঁপে দেবে না। তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বিন্দুমাত্র ভয় পাবে না। বড় বড় অনেক কাজ করতে হবে তাকে–সেই সাথে থাকবে তার নানান অভিজ্ঞতা। কোন ব্যক্তিসত্তাকে আমি ভালবাসব না, ভালবাসব তার গৌরবময় বিজয়কে। রিচার্ড বার্টনের কথাই ধরো, স্ত্রীর লেখা তাঁর জীবনী পড়ে বোঝা যায় কত গভীর ছিল তাঁর ভালবাসা। আর লেডী স্ট্যানলী–স্বামীর জীবনী যে লিখেছেন, তার শেষ অধ্যায়টা পড়েছ তুমি? এই ধরনের মানুষকে নারীরা নিজেকে ছোট না করেও ভক্তি করতে পারে। কারণ নারীর প্রেরণাতেই গৌরব অর্জন করে পৃথিবীতে সম্মান

পেয়েছে তার প্রেমিক।'

উৎসাহের আতিশয্যে ওকে তখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। নিজেকে শক্ত করে যুক্তির অবতারণা করলাম আমি, 'সবাই কি আমরা স্ট্যানলী আর বার্টন হতে পারি? আর তা ছাড়া সবাই সমান সুযোগও পায় না–অন্তত আমি তো কোনদিন তা পাইনি। পেলে নিশ্চয়ই তা লুফে নিতাম।'

'কিন্তু সুযোগ রয়েছে তোমার চারপাশে। এমন মানুষের কথা আমি বলছি, যে নিজের সুযোগ নিজেই করে নিতে জানে; যাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। এমন লোকের সাথে আজও পরিচয় হয়নি আমার অথচ তাকে কত ভালভাবেই না চিনি আমি। আমাদের চারপাশেই রয়েছে অনেক দুঃসাহসিক কাজের সুযোগ। পুরুষ করবে সে কাজ আর পুরস্কার স্বরূপ নারী নিজেকে সঁপে দেবে সেই বীরের পায়ে। ফরাসী লোকটার কথাই ধরো–এই যে গত সপ্তাহে যে বেলুনে চড়ে আসমানে উঠেছিল। ঝড় বইতে শুরু করল, কিন্তু যেহেতু আগে থেকেই প্রচার করা হয়েছিল, তাই ঝড়ের মধ্যেই জেদ ধরে রওনা হলো। ঝড় চব্বিশ ঘণ্টায় তাকে নিয়ে গেল দেড় হাজার মাইল। রাশিয়ার মাঝখানে গিয়ে নামল সে। তার প্রেমিকার কথা চিন্তা করো–অন্যান্য মেয়েরা নিশ্চয়ই ওর সৌভাগ্যকে হিংসা করে। সেটাই চাই আমি, আর সবার হিংসার পাত্রী হতে চাই।'

'তোমাকে খুশি করার জন্যে আমিও তা করতে পারতাম,' বললাম আমি।

'কিন্তু আমার প্রেমিক কেবল আমাকে খুশি করার জন্যেই কাজ করবে না। তার মন অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় বলেই করবে। নিজের অন্তরের তাগিদেই সে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদকে বরণ করবে। তুমি তো গতমাসে উইগানের কয়লা খনিতে বিস্ফোরণের বিবরণ দিয়েছিলে। নীচে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস আছে জেনেও কি তুমি ওদের সাহায্যে নামতে পারতে না?'

'অবশ্যই, নীচে নেমে সাহায্য করেছি আমি।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে বলোনি সে কথা।'

'ওটা বড়াই করে বলার মত কোন ঘটনা বলে মনে করিনি।'

'আমি জানতাম না,' আমার দিকে শ্রদ্ধার চোখে চাইল গ্ল্যাডিস। 'সাহস আছে তোমার।'

'আমাকে বাধ্য হয়েই যেতে হয়েছিল। ভাল রিপোর্ট ঘটনাস্থলে না গিয়ে লেখা যায় না।'

'আশ্চর্য ছন্দপতন! তোমার নীচে যাওয়ার উদ্দেশ্যের পুরো আমেজটাই নষ্ট করে দিলে। যাক তবু তুমি এগিয়ে গিয়েছিলে শুনে খুশি হলাম,' বলে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। ওর ভঙ্গিতে এমন একটা আভিজাত্য ছিল যে আমি সামনে ঝুঁকে কেবল ছোট্ট একটা চুমু খেলাম হাতে।

গ্ল্যাডিস বলল, 'হয়তো একটা বোকা মেয়ের মতই যৌবনের রঙীন স্বপ্ন দেখছি আমি। কিন্তু তবু আমার কাছে এটা এত বাস্তব, আমার জীবনেরই অংশ

যেন। যদি কোনদিন বিয়ে করি আমি বিখ্যাত লোককেই বিয়ে করব।'

'নিশ্চয়ই। তোমার মত নারীই তো পুরুষকে প্রেরণা যোগায়। সুযোগ দাও, দেখি আমি কিছু করতে পারি কিনা। তা ছাড়া, তুমি ঠিকই বলেছ, মানুষকে নিজের সুযোগ নিজেকেই করে নিতে হয়। ক্লাইভের কথাই ভেবে দেখো, সামান্য কেরানী ছিল, ভারতবর্ষ জয় করল। তুমি দেখে নিও–আমি কিছু একটা করবই।'

আমার আইরিশ রক্ত ফুটে উঠেছে দেখে হেসে ফেলল গ্ল্যাডিস।

'কেন পারবে না? মানুষের যা যা উপকরণ সবই আছে তোমার। যৌবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উদ্যম–কোন কিছুরই অভাব নেই। এসব কথা উঠল বলে প্রথমে খারাপ লাগছিল, কিন্তু এখন ভাল লাগছে। সত্যিকার পুরুষ হওয়ার ইচ্ছা তোমার মধ্যে জেগে থাকলেই আমি সুখী হব।'

'আর যদি সত্যিই···।'

কুসুম উষ্ণ ভেলভেটের মত নরম একটা হাত আমার ঠোঁট চেপে ধরল।

'আর কথা নয় এখন। সন্ধ্যায় তোমার অফিসে যাবার সময় আধঘণ্টা আগেই পেরিয়ে গেছে। আগে মনে করিয়ে দিতে বাধছিল। যেদিন সত্যিই পৃথিবীতে তুমি সম্মানের স্থান অধিকার করতে পারবে সেদিন আবার আমরা এই সম্পর্কে কথা বলব।'

কুয়াশাচ্ছন্ন নভেম্বরের সন্ধ্যায় ক্যামবারওয়েল ট্রামে চেপে উষ্ণ হৃদয়ে ভাবতে ভাবতে চললাম। আর একদিনও নষ্ট হতে দেয়া চলবে না। আমার প্রেমিকার উপযুক্ত বীরত্বের একটা কাজ আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

দুই

'বুডো ম্যাকারডলকে আমার বেশ ভাল লাগে। আমাদের 'গেজেট' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক। মাথায় লাল চুল, সামনের দিকে চুল নেই বললেই চলে; ফলে কপালটা বিরাট দেখায়।

ঘরে ঢুকতেই চশমাটা ঠেলে টাকের উপরে তুলে দিলেন তিনি।

'এই যে, মিস্টার ম্যালোন, শুনছি ভাল রিপোর্ট করছেন আপনি?' কথায় স্কচ টানের সাথে দরাজ গলায় বললেন তিনি।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

'খনি বিস্ফোরণের খবরটা খুব ভাল হয়েছে। সাদার্কের আগুনের রিপোর্টও চমৎকার। লেখার হাত আছে আপনার। তা আমার কাছে কি মনে করে?'

'একটা অনুগ্রহ চাইতে এসেছি।'

একটু সচকিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন মিস্টার ম্যাকারডল।

'কি করতে পারি বলুন, পারলে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।'

'আমাকে কাগজের তরফ থেকে কোন একটা মিশনে পাঠাবেন? প্রাণ দিয়ে কাজ করব আমি, ভাল রিপোর্ট দেব।'

'কি ধরনের মিশনের কথা বলছেন, মিস্টার ম্যালোন?'

'যে কোন ধরনের, সার–তবে কাজে অ্যাডভেঞ্চার আর বিপদ আপদ থাকতেই হবে। যত বেশি বিপদের ঝুঁকি হবে ততই ভাল।'

'নিজের জানটা খোয়াবার জন্যে বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে?'

'বক্তিগত ব্যাপার, সার, আমাকে যোগ্যতা প্রমাণ করতেই হবে।'

'হুম্!' কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করলেন ম্যাকারডল। তারপর বললেন, 'একটা কাজ দেয়া যেতে পারে। আধুনিক মাঞ্চুসেন আছেন একজন, তাঁকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করতে হবে।'

'যে কোন কাজ, যে কোন জায়গায় যেতে বলুন, আমার আপত্তি নেই।'

আরও কিছুক্ষণ ভেবে তিনি বললেন, 'কিন্তু বন্ধুত্ব তো দূরের কথা তাঁর সাথে কথা বলাই কঠিন। তবে বলা যায় না, মানুষকে সহজেই আপন করে নেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে আপনার।'

'কে সেই লোক?'

'এনমোর পার্কের প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।'

নাম শুনে একটু চমকে উঠলাম আমি।

'চ্যালেঞ্জার! বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ! এই প্রফেসর চ্যালেঞ্জারই তো ডেইলী টেলিগ্রাফের ব্লানডেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন?'

বার্তা সম্পাদক একটু বাঁকা হাসি হাসলেন।

'কি আপত্তি আছে? আপনিই না বললেন যে, যে কাজে বিপদ আপদ থাকে তেমন কাজই আপনার প্রয়োজন?'

'হ্যাঁ কাজ কাজই, সার,' জবাব দিলাম আমি।

'ঠিক বলেছেন। সবার সাথেই যে একই ব্যবহার করবেন প্রফেসর তা বলা যায় না।' প্রফেসর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, কেবল নামটা মনে আছে। ব্লানডেলকে মারার পর কাগজে ফলাও করে লিখেছিল, তাই।'

'আগে থেকেই চ্যালেঞ্জারের প্রতি নজর আমার।' ড্রয়ার হাতড়ে একটা কাগজ বের করলেন ম্যাকারডল। 'এতে বেশ কিছু তথ্য আছে,' বলে কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি আমার দিকে।

কাগজটাতে লেখা:

'জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। জন্ম: লারগস–১৮৬৩–শিক্ষা লাভ: লারগস একাডেমী। এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সহকারী: ১৮৯২–সহকারী রক্ষী, অ্যানথ্রোপলজি বিভাগ: ১৮৯৩–ওই বছরই তিক্ত পত্রালাপের পর কাজ ছেড়ে দেন। প্রাণিতত্ত্বের উপর গবেষণার জন্যে ক্রেস্টন

মেডাল লাভ। আন্তর্জাতিক সদস্য…' (বিশ্বের কোন নামই বাদ নেই।)

'প্রকাশনা: মঙ্গোলীয় মাথার খুলির উপর মন্তব্য প্রদান; মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্রমবিকাশের খসড়া; ইত্যাদি আরও অনেক কিছুর সাথে, "ওয়াইসম্যানিজমের ভ্রমাত্মক ধারণার উপর তাঁর লেখা প্রবন্ধ ভিয়েনায় জীবতত্ত্ব কংগ্রেসে তুমুল বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি করেছিল। শখ: হাঁটা, পাহাড়ে চড়া। ঠিকানা: এনমোর পার্ক, কেনসিংটন, পশ্চিম।" '

'কাগজটা নিয়ে যান, আজ আপনার জন্যে বিশেষ কোন কাজ নেই।'

পকেটে রেখে দিলাম কাগজটা। 'কিন্তু, সার, কি জন্যে তাঁর সাক্ষাৎকার নেব তা তো বললেন না? কি করেছেন প্রফেসর?'

'দুই বছর আগে একক অভিযানে তিনি গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকায়। গত বছর ফিরে ওখানকার কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। কেউ একজন তাঁর কথাকে মিথ্যা বানোয়াট বলে অভিহিত করে। এখন একেবারে চুপ মেরে গেছেন। কিছু নষ্ট, ঝাপসা ছবিও ছিল তাঁর কাছে। দক্ষিণ আমেরিকাতে গিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিছু একটা আশ্চর্য ঘটনা, হয় সত্যি সত্যি দেখে এসেছেন, নয়তো তিনি একজন সেরা মিথ্যুক–পরেরটা ঠিক হবার সম্ভাবনাই বেশি। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলেই খেপে যান।' কথা শেষ করলেন ম্যাকারডল।

স্যাভেজ ক্লাবের দিকে এগুলাম আমি। ক্লাবে না ঢুকে অ্যাডেলফি টিরেসের রেলিঙে ভর দিয়ে নদীর বাদামী তেলতেলে পানির দিকে চেয়ে রইলাম। মুক্ত বাতাসে আমার মাথাটা খোলে ভাল। পকেট থেকে কাগজটা বের করে লাইট পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে পুরোটা আবার পড়লাম। স্পষ্টই বোঝা যায় বিজ্ঞানের বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ভদ্রলোক। 'প্রেসের লোক' এই পরিচয়ে যে কোনমতেই প্রফেসরের সাথে দেখা করা সম্ভব নয় তা পরিষ্কার।

ক্লাবে ঢুকলাম। এগারোটা মাত্র বাজে। বড় ঘরটা এরই মধ্যে বেশ ভরে উঠেছে। আগুনের ধারে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসা লম্বা, শুকনো, তীক্ষ্ণ চেহারার লোকটার দিকে নজর পড়ল আমার। চেয়ার টেনে পাশে বসতেই ঘুরে তাকাল সে। এই মুহূর্তে ওকেই প্রয়োজন ছিল আমার–টারপ্ হেনরি, 'নেচার' পত্রিকার লোক। বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই জানে টারপ্ ভাল মানুষ। আমি টারপের কাছে সরাসরি আমার কথা পাড়লাম।

'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সম্বন্ধে কি জানো তুমি?'

'চ্যালেঞ্জার!' অশ্রদ্ধায় ভুরু কুঁচকে গেল তার। 'এই চ্যালেঞ্জার লোকটাই দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে আজগুবী গল্প ফেঁদেছিলেন।'

'কি রকম?'

'উঁচু শ্রেণীর অর্থহীন গল্প–অদ্ভুত কি সব জন্তু জানোয়ার নাকি আবিষ্কার করেছেন তিনি ওখানে। একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন রয়টারকে। এমন

বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল সেখানে, যে বোঝা গেল কিছুই কাজ হবে না। দুই একজন গুরুত্ব দিতে চাইলেও চ্যালেঞ্জার অচিরেই তাদেরও বিশ্বাসের ভিত্তি নেড়ে দেন।'

'কীভাবে?'

'অসহ্য রূঢ় ব্যবহার তাঁর। জীববিজ্ঞানের বদ্ধ পণ্ডিত ওয়াড্‌লে ছিলেন ওখানে। তিনি একটা নোট পাঠিয়েছিলেন চ্যালেঞ্জারের কাছে–"জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে অকৃত্রিম শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছেন। দয়া করে ইনস্টিটিউটের আগামী সভায় উপস্থিত থাকলে প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগতভাবে অনুগৃহীত বোধ করবেন।"

'এর যা উত্তর দিয়েছিলেন চ্যালেঞ্জার তা উচ্চারণযোগ্য নয়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, কেটেছেঁটে ভদ্র রূপ দিলে জবাবটা এরকম দাঁড়ায়, "প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তার পাল্টা শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট শয়তানের শরণাপন্ন হলেই চ্যালেঞ্জার সেটাকে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বলে মনে করবেন।"–বোঝো ঠেলা।'

'স্পর্দ্ধা!'

'হ্যাঁ, সম্ভবত ওয়াড্‌লেও একই মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সে কি বিলাপ– "আমার পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায়–" এইভাবে শুরু।'

'আর কিছু?'

'ঝগড়াটে স্বভাব লোকটার।' ভিয়েনায় গিয়ে "ওয়াইসম্যান এবং জীবনের বিকাশ" বিষয় নিয়ে ভয়ানক ঝগড়া করেছেন চ্যালেঞ্জার।'

'বিষয়টা জানা আছে তোমার?'

'না, নেই, তবে ভিয়েনা আলোচনার একটা ইংরেজি অনুবাদ ফাইল করা আছে আমাদের অফিসে। দেখবে? এখনই দেখাতে পারি।'

'এমনই কিছু একটা খুঁজছিলাম আমি। তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে হবে আমার। তোমার সময় থাকলে চলো এখনই যাই।'

বিরাট মোটা বাঁধানো নথিপত্র নিয়ে বসলাম আমি পত্রিকা অফিসে। 'ওয়াইসম্যান বনাম ডারউইন' শীর্ষক প্রবন্ধটায় চোখ বুলাচ্ছি। বহু চেষ্টা করলাম কিন্তু হাতামাথা কিছুই বুঝলাম না। তবু যেটুকু বুঝলাম তার ভিত্তিতেই একটা চিঠি লিখে ফেললাম, চিঠিটা জোরে জোরে পড়ে শোনালাম টারপ্‌কে।

'জনাব প্রফেসর চ্যালেঞ্জার,

গাছ-গাছড়া এবং প্রাণী সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে গিয়ে আমি সব সময়েই আপনার মতামত অতি আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকি। ডারউইন আর ওয়াইসম্যানের মতবিরোধ সম্বন্ধে আপনার ভিয়েনার বক্তব্য আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে।

আপনার বক্তৃতাটা সম্প্রতি আবার পড়লাম। কিন্তু কয়েকটা জায়গা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হয়নি।

আগামী পরশু আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি পেলে বক্তব্যগুলো আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝে নিতে পারব এবং নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

বিনীত ইতি
আপনার গুণগ্রাহী
এডওয়ার্ড ডি ম্যালোন।

'কেমন হয়েছে?' গর্বের সাথে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ভালই–কিন্তু তোমার মতলবটা কি?'

'কোনক্রমে দেখা করা। একবার তাঁর ঘরে ঢুকতে পারলে একটা উপায় বেরিয়ে যাবেই। এমনকী নিজের ভণ্ডামি সরাসরি স্বীকারও করে ফেলতে পারি।'

'আমার মতে চ্যালেঞ্জার যদি সাক্ষাৎ দিতে রাজি হয়ে চিঠির জবাব দেন, তা হলে তোমার উচিত হবে আমেরিকান ফুটবলের পোশাক পরে তৈরি হয়ে যাওয়া।'

বুধবার সকালেই চিঠি এল। চিঠির বক্তব্য:

জনাব,

আপনার চিঠিতে জানলাম যে আপনি আমার মত সমর্থন করেন। আপনার জেনে রাখা ভাল যে আপনার বা অন্য কারও সমর্থনে কি অসমর্থনে আমার কিচ্ছু এসে যায় না।

যাই হোক, আপনি লিখেছেন আমার লেকচারের কিছু কিছু অংশ আপনার কাছে পরিষ্কার নয়। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? আমার ধারণা একজন সাধারণ মানুষও আমার অকাট্য যুক্তি স্পষ্ট বুঝতে পারবে।

চিঠিটা পড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে বুদ্ধি একটু কম হলেও আপনি সত্যিই শিখতে আগ্রহী। তাই বুধবার সকাল এগারোটার সময় আপনাকে আমার সাথে দেখা করার অনুমতি দিলাম। আমার চিঠিটা সাথে এনে গেটে অস্টিনকে দেখাবেন। বাধ্য হয়েই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। সাংবাদিক বলে পরিচয়দানকারী কিছু সংখ্যক অসৎ লোকের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই এই সতর্কতা।

জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার।

টারপ্ হেনরিকে চিঠিটা পড়ে শোনালাম। শুনে সে বলল, 'বাজারে একটা নতুন ওষুধ বেরিয়েছে, কিউটিকুরা না কি যেন নাম–শুনেছি আর্নিকার চেয়ে ভাল কাজ করে।' কি বিচিত্র রসবোধ!

সাড়ে দশটায় ট্যাক্সি নিয়ে সময় মতই পৌঁছে গেলাম। বাড়িটার সামনে বারান্দায় বড় বড় থাম। বিরাট বাড়ি–জানালার ভারি পর্দা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় বিত্তবান লোক এই প্রফেসর। বেল বাজাতেই দরজা খুলে অতিশয়

শুকনো একটা লোক বেরিয়ে এল। বয়স বোঝা কঠিন। পরে জেনেছি সে প্রফেসরেরই ড্রাইভার। বাটলার ঘন ঘন পালিয়ে যায় বলে তাকে বাটলারের কাজও চালিয়ে নিতে হয়। হালকা নীল চোখে আমাকে জরিপ করে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'প্রফেসর কি আপনার সাথে দেখা করবেন বলেছেন?'

'হ্যাঁ, এগারোটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'চিঠি আছে?'

খামটা বের করে দিলাম। ওটা একটু দেখে নিয়ে ফিরিয়ে দিল সে।

'ঠিক আছে।' মনে হলো লোকটা কম কথা বলে। ওর পিছন-পিছন এগুলাম। হঠাৎ একজন ছোটখাট আকারের মহিলার কাছ থেকে বাধা পেলাম। কালো চোখ, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত মহিলা–ইংরেজ মেয়ের থেকে ফরাসী মেয়ের সাথেই যেন মিল বেশি।

'এক মিনিট, একটু এদিকে আসুন, সার,' বললেন মহিলা, অস্টিনকে অপেক্ষা করতে বলে, আবার আমার দিকে তাকালেন।

'আমার স্বামীর সাথে আগে কখনও দেখা হয়েছে আপনার?'

'না, ম্যাডাম, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি।'

'তা হলে স্বামীর পক্ষ থেকে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। খুবই বদরাগী মানুষ, সাবধান!'

'অনেক ধন্যবাদ, ম্যাডাম।'

'খেপে উঠতে দেখলেই চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন। খবরদার তর্ক করতে যাবেন না। কয়েকজনই তর্ক করতে গিয়ে আহত হয়েছেন। শেষে লোক জানাজানি হয়–অসম্মান। তা কি বিষয়ে আলাপ করবেন, দক্ষিণ আমেরিকা নয় তো?'

ভদ্র মহিলার কাছে মিথ্যা বলতে পারলাম না।

'সর্বনাশ–সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় ওটা। একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না–আমিও বিশ্বাস করি না। কিন্তু সেটা আবার তাঁকে বলতে যাবেন না যেন–তা হলেই খেপে যাবেন। তেমন কিছু যদি ঘটেই যায় বেলটা বাজিয়ে আমি না যাওয়া পর্যন্ত কোনমতে ঠেকিয়ে রাখবেন। খুব খেপে গেলেও সাধারণত আমি শান্ত করতে পারি।' এই উৎসাহব্যঞ্জক কথাগুলো শুনিয়ে অস্টিনের হাতে আমাকে সঁপে দিলেন তিনি। করিডরের শেষ মাথা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিল অস্টিন। ভিতর থেকে ষাঁড়ের ডাকের মত একটা আওয়াজ এল। প্রথম বারের মত প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মুখোমুখি হলাম আমি।

চওড়া টেবিলের পেছনে একটা ঘূর্ণি চেয়ারে বসে আছেন তিনি। টেবিলের উপর বই, ম্যাপ আর নকশা ছড়ানো। আমি ঢুকতেই চেয়ার ঘুরিয়ে আমার দিকে ফিরলেন। তাঁর হাবভাব আর আড়ম্বরে মুখ শুকিয়ে গেল আমার। আশ্চর্য কিছু দেখব বলেই আশা করেছিলাম–কিন্তু তিনি যে এমন পরাক্রান্ত ব্যক্তিত্ব তা মোটেও

ধারণা করিনি। তাঁর বিশাল আকৃতিই যে কোন মানুষকে অবাক করার জন্যে যথেষ্ট। মানুষের কাঁধে এত বড় মাথা আর কোনদিন দেখিনি আমি। তাঁর হ্যাটটা যদি আমি পরতে চেষ্টা করি তবে মাথা গলে কাঁধে এসে ঠেকবে। মুখটা বর্ণোজ্জ্বল–কুচকুচে কালো দাড়ি ঢেউ খেলে খেলে বুক পর্যন্ত নেমেছে। বিশাল চওড়া কাঁধ আর বুক দেখা যাচ্ছে টেবিলের উপরে। আর যা দেখা যাচ্ছে তা হলো কালো লোমে ভর্তি তাঁর প্রশস্ত দুটো হাত।

তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'বলুন, কি দরকার আপনার?'

বুঝলাম, আরও কিছুক্ষণ আমাকে ছদ্ম পরিচয় বজায় রাখতে হবে–নইলে সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ।

'আপনি আমার সাথে দেখা করতে রাজি হওয়ায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি, সার।' বলে পকেট থেকে খামটা বের করে দেখালাম আমি।

'ওহ্, তুমিই তা হলে সেই ছোকরা যে সহজ সরল ইংরেজি বুঝতে পারে না?'

সরাসরি 'তুমি'তে নেমে এলেন প্রফেসর। 'তবে এটা ঠিক যে, বোঝোনি জিনিসটা স্বীকার করার মত সৎসাহস তোমার আছে। অন্তত ভিয়েনার ওই শুয়োরের দলের ঘোঁতঘোঁতানির চেয়ে ইংলিশ মেষ শাবক কম অপ্রীতিকর।' বলে এমন ভাবে তাকালেন তিনি যেন আমিই সেই ইংলিশ জন্তুটির প্রতিনিধি।

'ওরা সত্যিই অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যবহার করেছে আপনার সাথে।' বললাম আমি।

'আমার যুদ্ধ আমি নিজেই লড়তে জানি, কারও সহানুভূতির প্রয়োজন নেই। এবার কাজের কথায় আসা যাক, কেননা বৃথা নষ্ট করার মত অঢেল সময় আমার নেই। কোন্ কোন্ জায়গা স্পষ্ট বোঝোনি তুমি?'

এমন পরিষ্কার তাঁর আচার ব্যবহার, যে এড়িয়ে যাওয়া সত্যি মুশকিল। কিন্তু আসল কথা পাড়ার কোন একটা রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না আমি। আরও কিছুটা সময় দরকার।

'বলো বলো–সময় নষ্ট কোরো না,' অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন চ্যালেঞ্জার।

'আমি একজন ছাত্র মাত্র–শিখতে চাই। ওয়াইসম্যান সম্বন্ধে আপনার বিচারটা কি একটু বেশি কঠিন হয়নি? আজ পর্যন্ত যা সাক্ষ্য আর প্রমাণ পাওয়া গেছে তা কি তাঁর স্বপক্ষেই যায় না?'

'কিসের সাক্ষ্য প্রমাণ?' একটু উষ্মা প্রকাশ পেল তাঁর কণ্ঠে।

'অবশ্য এটা ঠিক যে তেমন সঠিক প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি–আমি আধুনিক চিন্তাধারার সূত্র ধরেই বলেছি কথাটা।'

আগ্রহের সাথে সামনে ঝুঁকে এলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

'আশা করি তুমি জানো যে ক্রেনিয়াল ইনডেক্স বা মাথার খুলির দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থের শতকরা মাপ একটা ধ্রুব গুণণীয়ক?'

'অবশ্যই,' বললাম আমি।

'এটাও নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে বস্তুর মূল কারণের সূত্র এখনও সাব-জুডিস?'

'নিঃসন্দেহে।'

'আর জীবাণু প্ল্যাসমা যে পার্থেনোজেনেটিক ডিম থেকে ভিন্ন সেটা স্বীকার করবে তো?'

'নিশ্চয়ই!' সোৎসাহে বললাম আমি।

'কিন্তু এসব থেকে কি প্রমাণিত হয়?' দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন চ্যালেঞ্জার।

'সত্যিই তো,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলাম, 'কি প্রমাণিত হয় এসব থেকে?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমি বলব?'

'বলুন, আমার জ্ঞান বাড়বে।'

'এতে প্রমাণিত হয়,' হঠাৎ খ্যাপার মত গর্জন করে উঠলেন চ্যালেঞ্জার, 'যে লণ্ডনের একজন সেরা জোচ্চোর তুমি, একজন ঘৃণ্য সাংবাদিক; বিজ্ঞানের কচুও বোঝো না।'

বলেই লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। রাগে তাঁর চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছে। সেই সন্ত্রস্ত মুহূর্তেও অবাক হয়ে লক্ষ করলাম যে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আকারে বেশ ছোট। মাত্র আমার কাঁধ সমান হবেন।

'অর্থহীন বৈজ্ঞানিক বুলি,' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'হ্যাঁ, এতক্ষণ তাই আউড়েছি আমি। তুমি কি মনে করেছিলে ওইটুকু মাথা নিয়ে বুদ্ধিতে টেক্কা দেবে আমাকে? আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম আমি, তবু তুমি এসেছ। এবার তৈরি হও!' বলেই হুঙ্কার ছাড়লেন।

আস্তে আস্তে পিছিয়ে দরজা খুলতে খুলতে বললাম, 'দেখুন, সার, আপনি আমাকে ভর্ৎসনা করতে পারেন–করেছেনও। কিন্তু সবকিছুরই একটা সীমা আছে–মারলে ভাল হবে না।'

'তাই নাকি?' এগিয়ে আসতে আসতে ব্যঙ্গ ভরে বললেন প্রফেসর। 'তোমার মত ঘৃণ্য লোক কয়েকজনকেই আমি পিটিয়ে বের করেছি এই বাড়ি থেকে। মাথা পিছু গড়ে তিন পাউণ্ড পনেরো শিলিং খরচ হয়েছে আমার।'

জোর আমার গায়েও কিছু কম নেই। আমিই প্রথম অন্যায় করেছি তা ঠিক, কিন্তু এত কটু কথা আর গালাগালি শুনে আমার রক্তও গরম হতে শুরু করল। বললাম, 'ভাল হবে না কিন্তু, প্রফেসর–গায়ে হাত তুললে আমি সহ্য করব না।'

'ওহ্?' তাঁর কালো গোঁফটা উপরে উঠল, দাঁতের একটু সাদা অংশ দেখা গেল, 'সহ্য করবে না তুমি–না?'

'বোকামি করবেন না, প্রফেসর,' চিৎকার করে বললাম আমি। 'একশো পাঁচ সের ওজন আমার। প্রত্যেক শনিবারে লণ্ডন আইরিশ দলে রাগবি খেলি। সুতরাং

বুঝতেই পারছেন…'

ঠিক এই সময়ে আমার উপর বিদ্যুৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। কপাল ভাল, দরজাটা আগেই খুলে রেখেছিলাম–বন্ধ থাকলে দরজা ভেঙে নিয়ে পড়তাম আমরা। প্রফেসরের দাড়ি আমার মুখ চোখ প্রায় সবই ঢেকে ফেলেছে। দু'জনেরই হাত-পা শক্ত হয়ে পেঁচিয়ে গেছে। ডিগবাজি খেতে খেতে চললাম দু'জন। হলঘর দিয়ে বাইরে বেরুবার পথে হলঘরের একটা চেয়ারও চলল আমাদের সাথে। মনিবকে আগেও অনুরূপ অবস্থায় দেখেছে অস্টিন। আমরা সদর দরজার কাছাকাছি পৌঁছতেই নীরবে দরজাটা খুলে দিল। আর সিঁড়ি দিয়ে চেয়ার সহ উল্টে নীচে পড়লাম আমরা। চেয়ারটা ভেঙে খান খান হয়ে গেল; ছাড়াছাড়ি হয়ে দু'জনেই গড়িয়ে গিয়ে পড়লাম ড্রেনে। এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর–হাঁপানি রোগীর মত হাঁপাতে হাঁপাতে মুঠো করা হাত নাড়তে লাগলেন। বললেন, 'শিক্ষা হয়েছে নাকি আরও দেব দু'চার ঘা?'

'বেটা গুণ্ডা কোথাকার!' বলে আবার মোকাবেলার জন্যে তৈরি হলাম।

মারপিট করার জন্যে প্রফেসর তড়পাচ্ছেন। আর এক দফা লাগার আগেই অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রেহাই পেলাম। একজন পুলিশ এসে দাঁড়ালো আমাদের পাশে–হাতে নোটবই আর পেনসিল।

'কি হচ্ছে এখানে? লজ্জা থাকা উচিত আপনাদের,' বলল পুলিশ অফিসার। তারপর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, ঘটনা কি?' নোট করার জন্যে খাতা পেনসিল তৈরি তার।

'আমাকে আক্রমণ করেছিল এই লোকটি,' বললাম আমি।

'আপনি আক্রমণ করেছিলেন ওঁকে?' পুলিশ অফিসার জানতে চাইল।

জবাব না দিয়ে কেবল জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগলেন প্রফেসর।

'এই নিয়ে ক'বার হলো?' সজোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললো পুলিস অফিসার। 'গত মাসে একই কারণে কোর্টে যেতে হয়েছিল আপনাকে। দেখুন তো এই ভদ্রলোকের চোখ কালো করে দিয়েছেন আপনি। অভিযোগ আনছেন তো আপনি?' আমাকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'না, কোন অভিযোগ নেই আমার,' আমি নরম হলাম।

'তার মানে?' চোখ কপালে তুলল পুলিশ অফিসার।

'দোষ আমারই–আমিই অনাহূত ভাবে অনধিকার প্রবেশ করেছি। আমাকে উনি আগেই সাবধান করেছিলেন,' সত্যি কথাই বললাম আমি।

শব্দ করে নোট বইটা বন্ধ করলো পুলিশ অফিসার। 'এসব ঘটনা যত কম ঘটে ততই মঙ্গল। যাও, যাও ভিড় কোরো না,' যারা জটলা করেছিল তাদের খেদিয়ে নিয়ে গেল পুলিশ অফিসার। প্রফেসর চাইলেন আমার দিকে, তাঁর চোখে দুষ্টুমির ভাব।

'ভিতরে এসো,' ধমকে বললেন তিনি। 'তোমার সাথে বোঝাপড়া এখনও

শেষ হয়নি আমার।'

প্রফেসরের পিছু পিছু আবার ভিতরে গেলাম। আমরা ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ করে দিল অস্টিন।

তিন

দরজা ভাল করে বন্ধ করতে না করতেই খাবার ঘরের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। অগ্নিমূর্তি মহিলার। স্বামীর পথ আগলে দাঁড়ালেন উনি–যেন ক্রুদ্ধ মুরগী পথ আগলে দাঁড়িয়েছে বিশাল এক বুলডগের! বোঝা গেল যে আমাকে বেরুতে দেখেছেন প্রফেসর-গিন্নী, কিন্তু আবার ফিরে আসাটা খেয়াল করেননি।

'একটা অসভ্য জানোয়ার তুমি, জর্জ,' চিৎকার করে বললেন মিসেস চ্যালেঞ্জার, 'এমন সুন্দর ভদ্র যুবকটিকে মেরেছ।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনের দিকে দেখালেন প্রফেসর। 'এই যে আমার পিছনে–বহাল তবিয়তেই আছে সে।'

প্রফেসর-গিন্নীর যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সব–সঙ্গত কারণেই। অপ্রস্তুত ভাবে বললেন মহিলা, 'আপনাকে খেয়াল করিনি আমি।'

'আমি ঠিকই আছি, ম্যাডাম,' তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম আমি।

'ওহ্! মেরে আপনার মুখে দাগ করে দিয়েছে। জর্জ, তুমি একটা আস্ত জানোয়ার। প্রত্যেক সপ্তাহে একই অবস্থা আর সবাই মুখরোচক গল্প করে তোমাকে নিয়ে। আমার ধৈর্যের বাঁধ তুমি ভেঙে দিয়েছ।'

'বাজে বোকো না।'

'আমি বাজে বকছি না। আর এটা গোপনীয় কিছু নয়, পাড়ার সবাই জানে। তোমাকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা মশকরা করে। মান মর্যাদা নেই তোমার? তোমার মত লোক কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানীয় প্রফেসর হবে, হাজার হাজার ভক্ত ছাত্র-ছাত্রী থাকবে, আর তা না করে গুণ্ডামি করে বেড়াচ্ছ–কোথায় তোমার মান সম্মান?'

'আমার মান আমার কাছে,' জবাব দিলেন প্রফেসর।

'আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করলে তুমি। তুমি একটা সাধারণ গুণ্ডাতে পরিণত হয়েছ।'

'চুপ করো, জেসি।'

'কেন চুপ করব, তুমি একটা নিতান্ত নিকৃষ্ট মানুষ।'

'পরে কিন্তু আমার দোষ দিও না।' বলে আমাকে অবাক করে দিয়ে জেসিকে

তুলে নিলেন প্রফেসর। একটা উঁচু কালো মার্বেল পাথরের স্তম্ভের উপর বসিয়ে দিলেন। প্রায় সাত ফুট উঁচু হবে, ভাল করে ভারসাম্য রাখতে পারছেন না জেসি, ভয়ে সিঁটিয়ে গেছেন।

'নামিয়ে দাও বলছি!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

'প্লীজ বলো, তবে নামাব।'

'অমানুষ, এই মুহূর্তে নামিয়ে দাও আমাকে।'

জেসির কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আমাকে বললেন চ্যালেঞ্জার, 'পড়ার ঘরে এসো, ম্যালোন।'

'সার,' মহিলার অবস্থা দেখে বললাম আমি।

'এই দেখো ম্যালোনও তোমার জন্যে সুপারিশ করছে। "প্লীজ" বলো, নামিয়ে দেব।'

'ওহ্, একটা বর্বর তুমি। প্লীজ, প্লীজ।'

তাঁকে নামিয়ে দিলেন প্রফেসর।

'ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে হবে তোমাকে, জেসি। ম্যালোন একজন সাংবাদিক, কি না কি লিখে দেবে, আমাদের পাড়ায় ডজন খানেক বেশি বিক্রি হবে ওই কাগজ।'

'আপনি সত্যিই একজন বেয়াড়া স্বভাবের মানুষ, সার।' রাগের সাথে বললাম আমি।

হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়লেন প্রফেসর। 'এখনই আবার মিল হয়ে যাবে আমাদের।' বলে বিরাট হাত দুটো জেসির দুই কাঁধে রেখে বললেন, 'তুমি যা বলো সবই ঠিক। তোমার কথা মেনে চললে আমি অনেক ভাল হতে পারতাম। কিন্তু তাতে আমি ঠিক জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার হতে পারতাম না। পৃথিবীতে ভাল ভাল মানুষ অনেক আছেন–কিন্তু জি. ই. সি. আছে একজনই।'

মিনিট দশেক আগে যে ঘর থেকে নাটকীয় ভাবে বেরিয়েছিলাম আমরা আবার সেই ঘরেই ফিরলাম।

হাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে এক বাক্স চুরুট ঠেলে দিলেন প্রফেসর, 'আসল স্যান জুয়ান–কলোরাডো।'

একটা চুরুট তুলে নিয়ে দাঁতে কামড়ে কাটতে যেতেই হা হা করে উঠলেন প্রফেসর। 'করো কি! করো কি! ক্লিপ করে কাটতে হবে, তাও খুব সম্ভ্রমের সাথে। এখন আরাম করে হেলান দিয়ে আমার কথা শোনো, তোমার কোন প্রশ্ন থাকলে কথা শেষ হলে পরে জিজ্ঞেস করবে, আমার কথার মাঝখানে কথা বলবে না।

'প্রথম কথা হচ্ছে, সঙ্গত কারণে বের করে দেয়ার পরেও আবার কেন তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিলাম। কারণটা হচ্ছে ওই পুলিশ অফিসারের কাছে তোমার মন্তব্য। তোমার পেশার লোকদের কাউকেই এক টেবিলে বসে কথা বলার যোগ্য মনে করি না আমি। তোমার আজকের আচরণে বুঝলাম যে,

সাংবাদিক হলেও তুমি আর সবার চেয়ে উন্নত ধরনের, তুমি ভিন্ন রকম চিন্তাধারা পোষণ করো। ছাইটা তোমার বাম দিকে বাঁশের টেবিলে রাখা ছোট্ট জাপানী অ্যাশট্রেতে ফেলো।'

যেন ক্লাশ নিচ্ছেন এমনভাবে একটানা কথাগুলো বলে গেলেন প্রফেসর। টেবিলের উপর ছড়ানো কাগজের স্তূপের মাঝ থেকে একটা জীর্ণপ্রায় স্কেচ খাতা হাতে নিয়ে রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি হলেন।

'এখন তোমাকে আমি দক্ষিণ আমেরিকার কথা বলব। কোন রকম মন্তব্য শুনতে চাই না। আর একটা কথা একবার যা বলব তা আমার অনুমতি ছাড়া পুনরাবৃত্তি করা চলবে না। অনুমতি হয়তো কোনদিনও না-ও দিতে পারি আমি–পরিষ্কার?'

'কঠিন শর্ত আরোপ করলেন আপনি–একটা ছোট্ট রিপোর্ট...'

সঙ্গে সঙ্গে নোট বইটা আবার টেবিলে রেখে দিলেন চ্যালেঞ্জার। 'কথা এখানেই শেষ–আসতে পারো তুমি।'

'না, না, যে কোন শর্তই আমি মানতে রাজি আছি। বুঝতে পারছি, রাজি না হয়ে উপায় নেই আমার।'

'না, কোন পথই খোলা নেই তোমার।'

'ঠিক আছে আমি কথা দিচ্ছি।'

'ভদ্রলোকের কথা তো?'

'একেবারে মরদ কা বাত হাতী কা দাঁত।'

'বেশ। তুমি হয়তো শুনেছ, দু'বছর আগে আমি দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিলাম অনুসন্ধানের কাজে। আমার আবিষ্কার পৃথিবীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল ওয়ারলেস আর বেট্‌স্‌এর কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিজে পরখ করে দেখা। কিন্তু একটা আশ্চর্য ঘটনা আমার অনুসন্ধান আর চিন্তাধারার মোড় ঘুরিয়ে আমাকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পথে নিয়ে যায়।

'তুমি নিশ্চয়ই জানো–কিংবা হয়তো এই আধা-শিক্ষিত বয়সে নাও জানতে পারো–আমাজন নদীর আশেপাশে বিস্তর এলাকা আছে যেখানে এখনও মানুষের পা পড়েনি। অনেক উপনদীই আমাজনে এসে মিশেছে যাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না আধুনিক মানচিত্র বা চার্টে। এরকম একটা উপনদীর সঙ্গমস্থলে কিউকামা ইণ্ডিয়ানদের বাস। ওদের কিছু লোকের রোগ আমি ভাল করে দিয়েছিলাম। তা ছাড়া আমার ব্যক্তিত্বও ওদের মনে গভীর দাগ কাটে। তাই আবার আমি যখন ওদের মধ্যে ফিরলাম তখন সবাইকে আমার জন্যে অধীর ভাবে অপেক্ষা করতে দেখে অবাক হইনি। ওদের ইশারা ভাষায় বুঝলাম যে কেউ একজন খুব অসুস্থ. আমার চিকিৎসা অতি জরুরী। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখলাম রোগী একটু আগেই মারা গেছেন। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম রোগী রেড ইণ্ডিয়ান নন–তাঁর গায়ের রঙ

সাদা। পরনে শতছিন্ন জামা, চেহারায় দীর্ঘ দিন ধরে কঠিন অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করার ছাপ। স্থানীয় লোকেরা কেউ চেনে না ওঁকে–একাকী মরণাপন্ন অবস্থায় বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন লোকটি।

পিঠে ঝুলানো ক্যানভাস ব্যাগটা ওঁর পাশেই পড়ে ছিল, সেটা পরীক্ষা করে জানতে পারলাম, তাঁর নাম মেপ্‌ল্ হোয়াইট, আর ঠিকানা লেক এভিনিউ, ডেট্রয়েট, মিশিগান। ব্যাগের ভিতরে আর যা পাওয়া গেল তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে লোকটি একজন চিত্র শিল্পী এবং কবি, মনের খোরাক জোগাতে বেরিয়েছিলেন। ব্যাগে আরও পাওয়া গেল কয়েকটা হাতে আঁকা ছবি, একটা রঙ-এর বাক্স, একবাক্স রঙীন চক, কয়েকটা ব্রাশ আর তোমার সামনে ওই কালিদানীর ওপর রাখা হাড়টা। ব্যাক্সটারের লেখা এক কপি মথ এবং প্রজাপতি বইও ছিল ব্যাগে।

'চলে আসব এমন সময়ে নজরে পড়ল মেপলের ছিন্ন জ্যাকেটটা থেকে কি যেন বেরিয়ে আছে। এই স্কেচ খাতাটা। তোমাকে দিচ্ছি খাতাটা, এক এক করে পাতা উল্টে দেখো।'

একটা সিগার ধরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের ভাব লক্ষ করতে লাগলেন প্রফেসর।

আশ্চর্য কিছু বেরিয়ে পড়বে আশা নিয়ে খাতাটা খুললাম আমি, তবে সেটা কি ধরনের চমক হতে পারে তার কোন ধারণাই ছিল না আমার। প্রথম পাতা দেখে নিরাশ হলাম, একটা খুব মোটা মানুষের ছবি আঁকা রয়েছে। নীচে লেখা, 'সেইল বোটের জিমি কোলভার।' পরের কয়েক পাতায় ছোট ছোট স্কেচে দেখানো হয়েছে ইণ্ডিয়ানদের কিছু আচার অনুষ্ঠান। আরও কয়েকটা বিভিন্ন বিষয়ের ছবি আর সেগুলোর নামের পর দুই পাতা ভরা বিদঘুটে চেহারার লম্বা নাকওয়ালা টিকটিকি জাতীয় এক জন্তুর স্কেচ। বুঝতে না পেরে আমি প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো নিশ্চয়ই কুমীর?'

'অ্যালিগেটর–দক্ষিণ আমেরিকায় কুমীর নেই। কুমীর আর অ্যালিগেটরের মধ্যে তফাত হচ্ছে…'

'না, আমি বলছিলাম যে আমি তো এগুলোর মধ্যে আশ্চর্য কিছুই দেখছি না–আপনার কথা থেকে অন্য রকম ধারণা হয়েছিল আমার।'

চ্যালেঞ্জার হেসে বললেন, 'পরের পৃষ্ঠা দেখো।'

দেখলাম, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। পুরো পাতা জুড়ে একটা ভূদৃশ্য আঁকা রয়েছে–কিছু কিছু রঙও ব্যবহার করা হয়েছে। মুক্ত আকাশের নীচে যারা ছবি আঁকেন তাঁরাই এ ধরনের খসড়া করেন–পরে খুঁটিনাটি বসিয়ে দেন। দূরে হালকা সবুজ গাছ, প্রান্তরটা ক্রমে উপরের দিকে উঠে গিয়ে একটা খাড়া পাহাড়ের নীচে শেষ হয়েছে। গাঢ় লাল রঙ পাহাড়ের, অনেকটা বেসল্ট পাথরের সারির মত। পাঁজরের হাড়ের মত যেন দেখাচ্ছে। উঁচু দেয়ালের মত একটানা

দু'দিকে প্রসারিত হয়েছে পাহাড়টা। এক জায়গায় পিরামিডের মত উঁচু হয়ে রয়েছে একটা পাথর। বিরাট একটা গাছ মুকুটের মত শোভা পাচ্ছে পিরামিডের মাথায়। মনে হয় আশে পাশের খাড়া এবড়োখেবড়ো মূল পাহাড়শ্রেণী থেকে একটা ফাটল ওটাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। পরের পাতায় একই জায়গার আর একটা স্কেচ–তবে অনেক কাছে থেকে আঁকা। এখানে অনেক খুঁটিনাটিই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'কি বুঝছ?' আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করলেন চ্যালেঞ্জার।

'গড়নটা অসামান্য সন্দেহ নেই,' বললাম আমি, 'তবে ভূতত্ত্ববিদ্যায় আমার জ্ঞান সীমিত। মনে সাড়া জাগাবার মত কিছু তো দেখছি না।'

কিন্তু উনি বললেন, 'অপূর্ব, অসামান্য, অবিশ্বাস্য। পৃথিবীর কেউ কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে এমনটি সম্ভব। পরেরটা দেখো।'

পাতা উল্টাতে নিজের অজান্তেই বিস্ময়ে একটা শ অস্ফুটে বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। সমস্ত পাতা জুড়ে আঁকা একটা ছবি, এমন অদ্ভুত জীব আমি জীবনে দেখিনি। মাথাটা মুরগীর মত, দেহ বিরাটকায় গিরগিটির, লেজের উপর সারি সারি গজালের মত কাঁটা। বাঁকা পিঠের উপর ফালি ফালি ঝালর–মনে হয় ডজন খানেক মুরগীর ঝুঁটি যেন সারি বেঁধে পরপর বসানো রয়েছে। জন্তুটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষের মত আকৃতির ছোট্ট এক বামন; বিস্ময়ের সাথে চেয়ে দেখছে লোকটা।

'কি বুঝছ?' বিজয়ের গর্বে হাত দুটো ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'বিরাট, বিশাল একটা দানব।'

'এমন একটা ছবি কেন আঁকলেন তিনি?'

'সম্ভবত মদের মাত্রা বেশি হয়ে গিয়েছিল!' জবাব দিলাম আমি।

'ওহ্! এর চেয়ে ভাল কোন কারণ খুঁজে পেলে না তুমি?' ক্ষুব্ধ হলেন প্রফেসর।

'আপনার ব্যাখ্যা কি, সার?'

'সুস্পষ্ট ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে ওই জন্তুটা জীবন্ত এবং জীবন্ত অবস্থাতেই ওই ছবিটি এঁকেছেন শিল্পী।'

হেসেই ফেলতাম আমি–কিন্তু প্রফেসরের সঙ্গে প্রথম দর্শনের তুমুল কাণ্ডের কথা মনে করে হাসতে সাহস হলো না।

আমি ব্যঙ্গের সুরে বললাম, 'সন্দেহ নেই, কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই ছোট্ট মানুষটা আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিচ্ছে। লোকটা যদি ইণ্ডিয়ান হত তা হলে বলা যেত যে সে পিগমী–কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে সানহ্যাট পরা একজন ইউরোপীয়।'

নাক দিয়ে খ্যাপা মহিষের মত আওয়াজ করলেন প্রফেসর। বললেন, 'সত্যি

সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি, ঘুণে ধরা মগজ, আর সেই মগজের নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে আমার মতামত এবার আরও প্রশস্তির সুযোগ পেল–চমৎকার!'

প্রফেসরের কথা এমনই অযৌক্তিক আর হাস্যকর যে রাগতেও পারলাম না আমি। আর চ্যালেঞ্জারের মত লোকের উপর রাগ করতে হলে সব সময়ে কেবল রেগেই থাকতে হবে। ক্লান্ত হাসি হাসলাম আমি, 'আমার মনে হয় লোকটাকে বেশি ছোট দেখাচ্ছে।'

'এই যে দেখো,' সজোরে বললেন চ্যালেঞ্জার। সামনে ঝুঁকে পড়ে তাঁর মোটা রোমশ আঙুল রাখলেন ছবির ওপর। 'ওই জন্তুটার পিছনে এই গাছটা দেখেছ? হয়তো ভেবেছিলে ওটা ড্যানডিলাইয়ন বা ব্রাসেল্‌স্‌ প্রাউট, তাই না? জেনে রাখো ওটা একটা আইভরি পাম গাছ। প্রায় পঞ্চাশ ষাট ফুট পর্যন্ত হয় লম্বায়। বুঝছ না কেন যে মানুষের ছবিটা এখানে আঁকার একটা উদ্দেশ্য আছে। তিনি কিছুতেই দানবটার সামনে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পেতেন না–প্রাণভয় সকলেরই আছে। নিজেই নিজের স্কেচ করেছেন মাপের মাত্রা বা স্কেল বোঝাবার জন্যে। পাঁচ ফুট মত ছিলেন তিনি লম্বায়, পিছনের গাছগুলো দশগুণ অর্থাৎ পঞ্চাশ ফুট উঁচু।

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'তার মানে, আপনার মতে জন্তুটা–মানে চারিংক্রশ স্টেশনেও ওটার খাঁচার জায়গা হবে না।'

'একটু অতিরঞ্জন হয়ে থাকবে–কিন্তু জন্তুটা অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক।'

'কিন্তু, একটা স্কেচ দেখে নিশ্চয়ই মানুষের এতদিনের অভিজ্ঞতা সব মিথ্যা বলে বাতিল করে দেয়া যায় না।' তাড়াতাড়ি বাকি পাতাগুলো উল্টে দেখলাম, আর কোন ছবি নেই খাতায়। 'একজন আমেরিকান শিল্পীর একটা ছবি দেখেই আপনার মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীর এমন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা কি ঠিক হচ্ছে? কে জানে সে শিল্পী হয়তো হ্যাশিশের প্রভাবে, জ্বরের ঘোরে, কিংবা মনের নিছক উদ্ভট কল্পনার বশে এঁকেছে ছবিটা?'

জবাব দেয়ার জন্যে একটা বই হাতে তুলে নিলেন চ্যালেঞ্জার। 'এই বইটা আমারই এক গুণী বন্ধু রে' ল্যাংকেস্টরের লেখা। এখানে একটা ছবি আছে–হ্যাঁ এই যে, ছবির নীচে লেখা–ডাইনোসর স্টিগেসরাসের সম্ভাব্য আকৃতি, পিছনের পা এক একটা দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের সমান, দেখো এই যে ছবি।'

খোলা বইটা বাড়িয়ে দিলেন প্রফেসর। ছবিটা দেখে চমকে উঠলাম আমি। অদ্ভুত মিল রয়েছে এই ছবিটার সাথে স্কেচটার।

'আশ্চর্য মিল ছবি দুটোর মধ্যে–সত্যিই লক্ষ্যণীয় বিষয়।'

'কিন্তু তবু তুমি স্বীকার করবে না এটা সত্য?'

'এটা ঘটনাচক্রে হতে পারে, বা শিল্পী হয়তো এই ছবিটাই কোনদিন দেখেছিলেন। ছবিটা তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল–পরে ঘোরের বশে আবার এঁকে ফেলেছেন?'

'ভাল কথা,' শান্ত গলাতেই বললেন প্রফেসর, 'এই প্রসঙ্গ এখানেই থাকুক। এবার আমি এই হাড়টা একটু পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করব তোমাকে।' বলে আমার হাতে হাড়টা তুলে দিলেন প্রফেসর। ইঞ্চি ছয়েক লম্বা, আমার বুড়ো আঙুলের সমান মোটা। হাড়ে মাংসের কোমল অংশ একদিকে শুকিয়ে আছে, অর্থাৎ বেশি দিনের পুরানো নয়।

'এটা কিসের হাড়?' প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন।

সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করলাম আমি হাড়টা। প্রায় ভুলে যাওয়া স্মৃতি মনে আনার চেষ্টা করলাম।

'মানুষের–স্বাস্থ্যবান কোন মানুষের কণ্ঠার হাড় হতে পারে এটা।' আমি আন্দাজে বললাম।

'মানুষের কণ্ঠার হাড় বাঁকা হয়,' একটু বিরক্তির সাথেই হাত নেড়ে আমার কথা উড়িয়ে দিলেন প্রফেসর, 'এটা সিধে। আর এই খাঁজটা দেখে বোঝা যায়, একটা মজবুত পেশী ছিল এখানে। কণ্ঠার হাড়ে এরকম খাঁজ থাকে না।'

'তা হলে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে এটা কি আমি জানি না।'

'লজ্জার কিছু নেই তোমার–দক্ষিণ কেনসিংটনের সমস্ত লোক ডাকলেও হয়তো তাদের কেউ বলতে পারবে না।' ওষুধের বাক্সের ভিতর থেকে একটা ছোট্ট হাড় বের করলেন চ্যালেঞ্জার। মটর দানার চেয়ে সামান্য বড় হবে। আমার হাতে দিয়ে বললেন প্রফেসর, 'এখন যেটা তোমার হাতে দিলাম সেটাও একই ধরনের হাড়–মানুষের। আর ওই বড় হাড়টা যে ফসিল নয় তা ওই শুকিয়ে যাওয়া অংশ দেখেই বোঝা যায়।'

'হাতির হাড় এমন···'

যাতনায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল প্রফেসরের। 'না, দক্ষিণ আমেরিকায় হাতি আছে এমন কথাও বোলো না···লোকে হাসবে।'

'হাতি না হোক, দক্ষিণ আমেরিকার কোন বড় জন্তু হতে পারে–টাপির বা অন্য কিছু?'

'দেখো, আমার যে কাজ তা আমি ভাল বুঝি–ওটা টাপির বা অন্য কোন জন্তুর হাড় নয়। ওটা বিরাট শক্তিশালী আর ভয়ঙ্কর কোন জন্তুর হাড়। জীববিজ্ঞানের রেকর্ডভুক্ত না হলেও এই জন্তু আজও পৃথিবীর বুকেই বেঁচে আছে। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'পুরোপুরি বিশ্বাস না হলেও ব্যাপারটা অবশ্যই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করছে।'

'তা হলে হতাশ হবার কারণ নেই–তোমার মধ্যে যুক্তি আছে, কাজেই কোন না কোন সময়ে তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। এবার বাকিটা বলছি। এই ঘটনার পরে আমার পক্ষে আরও বিস্তারিত না জেনে ফেরত আসা অসম্ভব হয়ে পড়ল। শিল্পী কোন্‌দিক থেকে এসেছিলেন বনে তার অনেক নিদর্শনই পাই আমি। তবে তার

খুব একটা দরকার ছিল না, ভূতুড়ে এক জায়গার কথা প্রচলিত আছে ওখানকার উপজাতীয়দের মধ্যে–কারুপুরির কথা নিশ্চয়ই শুনেছ!'

'না তো?'

'কারুপুরি হচ্ছে জঙ্গলের ভূত। ওরা বিশ্বাস করে ওই ভূত খুবই সাঙ্ঘাতিক, ওর কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। কারুপুরির আকৃতি বা প্রকৃতি সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারে না, কিন্তু আমাজন এলাকার সব লোকই ওকে ডরায়। কারুপুরি কোন্ দিকে থাকে সেটা তারা সবাই জানে। আমেরিকান শিল্পী এসেছিলেন সেই দিক থেকেই। ভয়াবহ কিছু একটা আছে ওদিকে বুঝলাম–কিন্তু সেটা কি তা খুঁজে বের করাই আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল।'

'কি করলেন আপনি?' ততক্ষণে আমার অবিশ্বাস দূর হয়ে গেছে,–এই লোকটির সত্যিই আকর্ষণ ক্ষমতা আছে, আপনাআপনিই শ্রদ্ধা এসে যায় তাঁর উপর।

'অনেক চেষ্টার পর কিছু স্থানীয় লোককে রাজি করালাম। ওরা তো প্রথমে ওই বিষয়ে কথা বলতেই নারাজ। তোয়াজ, উপহার–শেষ পর্যন্ত এমনকী মারধরের ভয় দেখিয়ে রাজি করাতে হলো। দু'জনকে গাইড রেখে অনেক বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে–সব কিছু বলার দরকার নেই, কোন্‌দিক্‌ক গেলাম তা-ও বলব না–আমরা গিয়ে পৌঁছলাম এমন এক জায়গায় যেখানে হতভাগ্য মেপল হোয়াইট ছাড়া কেউ কোনদিন যায়নি। এইটা দেখো।'

একটা হাফ প্লেট ছবি আমাকে এগিয়ে দিলেন প্রফেসর।

'ছবিটা অপরিষ্কার হওয়ার কারণ ফেরার পথে নৌকা উল্টে ফিল্ম প্লেটের কেসটা ভেঙে গিয়েছিল। প্রায় সব ছবিই নষ্ট হয়ে গেছে। এই একটাই কিছুটা এসেছে। কেউ কেউ বলেছে এটা নাকি জাল ছবি–সে নিয়ে তর্ক করার মত মনের অবস্থা এখন আমার নেই।'

ছবিটা সত্যিই ঝাপসা। কোন নির্দয় সমালোচক যদি এই ছবিকে জাল বলে থাকেন তবে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না তাঁকে। অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখে বুঝলাম, স্কেচে যে ছবি দেখেছি এটাও সেই একই জায়গার।

'মনে হচ্ছে শিল্পীর আঁকা জায়গারই ছবি এটা,' বিস্ময়ে অবাক হয়ে বললাম আমি।

'ঠিকই ধরেছ তুমি,' বললেন প্রফেসর। 'মেপলের তাঁবুর বেশ কিছু চিহ্ন আমি দেখেছি পথে। এই ছবিটা দেখো এবার।'

আর একটা ছবি দিলেন তিনি আমার হাতে। একই ছবি–আরও কাছে থেকে তোলা। পিরামিডের মত পাথরটা আর তার উপরের গাছটা স্পষ্ট চিনতে পারলাম আমি।

উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'আর কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'যাক, তবু কিছু অগ্রগতি হয়েছে। ছবির উপরের দিকটা দেখো। কিছু

দেখতে পাচ্ছ?'

'একটা বিরাট গাছ।'

'আর গাছের উপর?'

'একটা বিশাল পাখি।'

একটা লেন্স আমার দিকে এগিয়ে দিলেন প্রফেসর।

'হ্যাঁ, একটা বিরাট পাখি বসে আছে ওই ডালে। মস্তবড় ঠোঁট। মনে হয় একটা বড় পেলিকান।'

'তোমার চোখ খারাপ, ওটা পেলিকানও নয়, কোন পাখিও নয়। গুলি করে মেরেছিলাম আমি ওকে। আর ওই একটি মাত্র প্রমাণই সঙ্গে করে আনতে পেরেছিলাম।'

'ওটা আছে আপনার কাছে?' উৎসাহিত হয়ে জানতে চাইলাম আমি। যাক শেষ পর্যন্ত অন্তত একটা প্রমাণ পাওয়া যাবে।

'ছিল, এখন নেই।' দুঃখের সাথে বললেন প্রফেসর। 'ওই যে নৌকাডুবির কথা বলেছি, তাতে ওটাও হারিয়েছি আমি। কেবল পাখার কিছু অংশ রয়ে গেছিল আমার হাতে। এই যে, এটুকুই শুধু প্রমাণ।' বলে প্রফেসর ড্রয়ার থেকে পাখার টুকরা অংশটা বের করে আমার সামনে বিছিয়ে দিলেন। প্রায় দুই ফুট লম্বা, বাদুড়ের পাখার মত।

'এত্তো বড় বাদুড়!' বলে উঠলাম আমি।

'বাদুড়ও নয়–কোন পাখিও নয়; কি ওটা?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

আমার বিদ্যার দৌড় শেষ। তাই সহজ ভাবে স্বীকার করলাম, 'জানি না।'

বইটা আবার হাতে তুলে নিলেন তিনি, পাতা উল্টে একটা ছবির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'এই যে,' বলে বিশাল বড় এক বিদঘুটে উড়ন্ত সরীসৃপ দানবের ছবি দেখালেন প্রফেসর। 'এটা জুরাসিক যুগের ডাইমরফোডন বা টেরাড্যাকটিলের একটা চমৎকার ছবি। পরের পাতায় ডানার গড়নের ছবি আছে। নমুনাটা তার সাথে মিলিয়ে দেখো।'

মিলিয়ে দেখতে গিয়ে আমার সারা দেহ উত্তেজনায় শির শির করে উঠল। হুবহু মিলে যাচ্ছে সব। না, আর কোন সন্দেহই নেই আমার। আন্তরিকতার সাথেই তা জানালাম আমি প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে। চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে স্মিত হাস্যে উপভোগ করলেন তিনি নিজের সাফল্য।

'এত বিশাল কোন প্রাণীর কথা আমি কোনদিন শুনিনি। আপনি বিজ্ঞান জগতের কলম্বাস। এক হারানো পৃথিবী খুঁজে বের করেছেন। প্রথমে অবিশ্বাস করেছিলাম বলে ক্ষমা চাইছি। আমি সাংবাদিক মানুষ, সঠিক প্রমাণ দেখলে চিনতে আমার ভুল হয় না, যে কেউ এই প্রমাণে সন্তুষ্ট হতে বাধ্য।'

তৃপ্তির সাথে আর একটা চুরুট ধরালেন প্রফেসর।

'কি করলেন আপনি তারপর?'

'তখন বর্ষাকাল, আমার রসদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। পাহাড়ের কিছু অংশ ঘুরে দেখলাম–কিন্তু উপরে ওঠার কোন পথ খুঁজে পেলাম না।'

'আর কোন প্রাণী দেখেছিলেন?'

'না, দেখিনি–তবে মালভূমির উপর থেকে বিভিন্ন রকমের বিকট আওয়াজ শুনেছি।'

'কিন্তু মেপলের আঁকা ছবিটা? ওটা তিনি কীভাবে আঁকলেন?'

'মনে হয় উপরে ওঠার কোন পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। সেখানে হয়তো ওই বিকট জন্তুর দেখা পান তিনি। ওঠানামা যদি খুব শক্ত কাজ না হত তা হলে ওই জন্তুগুলো নেমে এসে আশে পাশের জায়গা চষে বেড়াত।'

'ওরা উপরে গেল কীভাবে?'

'এই প্রশ্নের কেবল একটাই সমাধান হতে পারে। আর সেটা কঠিন কিছু নয়। জানো নিশ্চয়ই, দক্ষিণ আমেরিকাকে গ্র্যানিট মহাদেশ বলা হয়। অনেক আগে কোন এক সময়ে আগ্নেয়গিরির ঊর্ধ্ব চাপে এর জন্ম। লক্ষ করেছ নিশ্চয়ই পাহাড়ের পাথরগুলো বেসল্ট···অর্থাৎ আগ্নেয় শিলা। পুরো জায়গাটা প্রায় ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স-এর সমান একটা চাকা, চাপের মুখে প্রাণী সহ উপরের দিকে উঠে গেছে।'

'অকাট্য প্রমাণ আছে আপনার হাতে, কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিন, ওরা লুফে নেবে।'

'সরল মনে আমিও তাই ভেবেছিলাম,' তিক্ত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। 'কিন্তু প্রতি পদে অবিশ্বাস, ঈর্ষা আর নিরেট বুদ্ধির লোকগুলোর কাছ থেকে কেবলই বাধা পেয়েছি আমি; সহযোগিতা পাইনি।'

'কিন্তু তাই বলে এত বড় একটা আবিষ্কার আপনি গোপনে রাখতে পারেন না!'

'আমার কথা যারা অবিশ্বাস করে তাদের কাছে নাকিকান্না কাঁদতে যাওয়া আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। ওদের ব্যবহারে আমার ঘেন্না ধরে গেছে, তাই এমন অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমি চুপ করে রয়েছি। এই কারণেই সাংবাদিকরা জ্বালাতন করতে এলে আমি নিজেকে ঠিক সামলে রাখতে পারি না।'

নীরবে চোখের ওপর হাত বুলালাম আমি। রীতিমত টনটন করছে।

'আমার স্ত্রী আমার ব্যবহারে বারবার আপত্তি জানিয়েছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি যা করেছি, যেকোন আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন মানুষই তাই করতেন।'

'আপনার মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছি।'

একটা কার্ড বের করে আমার হাতে দিলেন প্রফেসর।

'আজ রাতে আমি তোমাকে প্রদর্শনীতে আসার দাওয়াত করছি। মিস্টার পারসিভ্যাল ওয়াল্ড্রন, একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিত, রাত সাড়ে আটটায় "যুগ এবং কালের ইতিহাস" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। সেখানে এই বিষয়ে যাতে আলোচনা

হয় তার আপ্রাণ চেষ্টা করব আমি।'

'আমি অবশ্যই আসব।'

'তুমি এলে খুশি হব আমি; অন্তত এটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে, দর্শকমণ্ডলীতে আমার একজন মিত্র আছে। তবে মনে থাকে যেন এই বিষয়ে এক অক্ষরও ছাপানো চলবে না।'

'কিন্তু আমাদের বার্তা সম্পাদক মিস্টার ম্যাকারডল তো জানতে চাইবেন, কি জানলাম আমি,' আমতা আমতা করে বললাম আমি।

'তাকে যা খুশি বলতে পারো তুমি। কিন্তু আর কাউকে যদি আমাকে বিরক্ত করতে পাঠায় তবে ঘোড়ার চাবুক নিয়ে হাজির হব তার অফিসে।...তোমাকে যতটুকু সময় বরাদ্দ করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে ফেলেছি। আমার সময় পৃথিবীর সবার জন্যে—কারও একার জন্যে নয়। সাড়ে আটটায় দেখা হবে।'

হাত মিলিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

চার

চ্যালেঞ্জারের সাথে দেখা করতে এসে প্রথমে শারিরীক ও পরে মানসিক নির্যাতন আমার সাংবাদিকসুলভ মনের জোর ভেঙে দিয়েছে। মাথা ব্যথা করছে—সেই সাথে একটা চিন্তা ক্রমাগত মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে: প্রফেসরের কাহিনীটা সত্যিই বাস্তব!

একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা অফিসে গেলাম। দেখি ম্যাকারডল রোজকার মতই তাঁর জায়গায় বসে আছেন।

'কি খবর,' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধ করে ফিরলেন; ব্যাটা প্রফেসর মারধোর করেনি তো?'

'একটু মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল প্রথমে।'

'লোক বটে একটা! তা আপনি কি করলেন?'

'পরে ভাল ব্যবহার করেছেন, গল্প করেছি আমরা। কিন্তু ছাপাবার মত কিছুই বের করতে পারিনি আমি।'

'একেবারে কিছুই পাননি তা বলব না আমি, মেরে তো দেখি চোখে কালশিরা ফেলে দিয়েছে; এটা অবশ্যই ছাপার মত খবর। মিস্টার ম্যালোন, এই ভাবে স্বেচ্ছাচারিতা চলতে দেয়া যায় না। ঘটনার বর্ণনা দিন, আমি এমন হেডিং দেব যে পড়ে প্রফেসরের গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে। "প্রফেসর মাঞ্চুসেন!"—কেমন হয় এই শিরোনাম? সার জন ম্যানডেভিল—ক্যাগলিওস্ট্রো—সব ঠগ আর রংবাজের ইতিহাস। কলমের বিষে জ্বলবে সে।

'দয়া করে লিখবেন না, সার।'

'কেন?'

'কারণ আমার বিশ্বাস উনি জোচ্চোর নন।'

'কি!' চিৎকার করে উঠলেন ম্যাকারডল, 'তার মানে আপনি তাঁর সেই বিকট জীবজন্তুর গল্প সব বিশ্বাস করেন?'

'খুব বেশি কিছু পেয়েছেন বলে দাবি করেননি উনি, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস নতুন একটা কিছু আবিষ্কার করেছেন প্রফেসর।'

'তা হলে আর দেরি করছেন কেন, লিখে ফেলুন।'

'লিখতে পারলে খুশি হতাম কিন্তু আমার কাছে যা বলেছেন প্রফেসর তা আমাকে বিশ্বাস করেই বলেছেন। শর্ত আছে, তাঁর অনুমতি ছাড়া এক লাইনও লেখা চলবে না। আর আজ রাতে একটা অনুষ্ঠানে দাওয়াত করেছেন, ওখানে তিনি বিষয়টি উত্থাপন করবেন।'

গভীর অবিশ্বাস ফুটে উঠল ম্যাকারডলের চেহারায়।

'ঠিক আছে, মিস্টার ম্যালোন, আজ রাতের অনুষ্ঠান তো গোপনীয় নয়। অন্য কাগজ হয়তো কোন রিপোর্টার পাঠাবে না, কারণ ইতিমধ্যেই ওয়াল্ড্রনের ওপর বেশ কয়েকটা রিপোর্ট হয়েছে। কেউ জানবে না যে চ্যালেঞ্জারও বক্তৃতা দেবেন। কপাল ভাল থাকলে ভাল একটা একচেটিয়া খবর পাওয়া যেতে পারে। রাত বারোটা পর্যন্ত প্রথম পৃষ্ঠায় জায়গা রাখব আমি আপনার জন্যে।'

বেশ ব্যস্তভাবেই দিনটা কাটল আমার। একটু সকাল সকালই টারপ্ হেনরির সাথে রাতের খাবার সেরে নিলাম। সকাল বেলার ঘটনার কিছুটা বর্ণনা দিলাম আমি ওকে। অবিশ্বাসের হাসি হাসতে হাসতে পুরোটা শুনল সে। তারপর হাসির দমকে ফেটে পড়ল, আমি প্রফেসরের কাহিনী বিশ্বাস করেছি বলে এই হাসি।

'বন্ধু মেলোন, বাস্তবে এমন ঘটে না। বিরাট কিছু আবিষ্কার করার পর কেউ ওভাবে প্রমাণ হারিয়ে ফেলেন না। ওটা কেবল ঔপন্যাসিকদের পক্ষেই সম্ভব। লোকটা চিড়িয়াখানার বানরের মতই ছল চাতুরীতে ভরা; কাহিনীর পুরোটাই বানোয়াট।'

'আমেরিকান শিল্পী—সেটাও কি গল্প?'

'সেটাও গল্প, মেপল হোয়াইট বলে কেউ নেই, কোনদিন ছিল না।'

'আমি তাঁর স্কেচ বই দেখেছি।'

'বলো, চ্যালেঞ্জারের স্কেচ বই।'

'তুমি বলতে চাও চ্যালেঞ্জারই এঁকেছেন ওই ছবি?'

'অবশ্যই—আর কে আঁকবেন?'

'আর ফটোগুলো?'

'তুমি তো নিজেই বলেছ, একটা পাখি ছাড়া ছবিতে আর কিছুই ছিল না।'

'পাখি নয়, টেরাড্যাকটিল।'

'ওটা প্রফেসরের কথা–তোমার মাথায় টেরাড্যাকটিল ঢুকিয়ে দিয়েছেন তিনি।'

'হাড়গুলো সম্বন্ধে কি বলবে তুমি?'

'প্রথম হাড়টা আইরিশ ঝোল-মাংস থেকে নেয়া; আর দ্বিতীয়টা–যে কোন চালাক লোকের পক্ষেই ছবি আর হাড় দুটো নকল করা সহজ।'

'মীটিং-এ যাবে তুমি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'চিন্তিত দেখাল টারপ্‌কে।'

'মোটেই জনপ্রিয় লোক নন এই চ্যালেঞ্জার। অনেকেরই রাগ আছে তাঁর উপর। ডাক্তারির ছাত্ররা ওখানে উপস্থিত থাকলে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হবে। এর মধ্যে যেতে চাই না আমি।'

'অন্তত তাঁর বক্তব্যটুকু বলার সুযোগ প্রফেসরকে দেয়া উচিত।'

'এমন করে বলছ যখন–ঠিক আছে, সন্ধ্যায় আমিও যাব তোমার সঙ্গে।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো টারপ্‌।

পৌঁছে দেখলাম যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বড় একটি হল। ইলেকট্রিক গাড়ি থেকে সাদা দাড়িওয়ালা প্রফেসররা একে একে নামলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের দেখেই বোঝা যায়, তাঁরা সবাই বিজ্ঞানের লোক এবং সবাই ভাল শ্রোতা। বসেই বুঝতে পারলাম গ্যালারি আর হলের পিছন দিকে একদল মেডিক্যাল ছাত্র বসেছে। সম্ভবত বড় বড় সব হাসপাতাল থেকে রীতি অনুযায়ী প্রতিনিধি এসেছে। বেশ হালকা একটা পরিবেশ ছাত্রদের মাঝে। কয়েকজন আবার জনপ্রিয় গান ধরেছে কোরাসে।

বৃদ্ধ ডক্টর মেলড্রাম তাঁর সুপরিচিত ঢেউ খেলানো অপেরা হ্যাট পরে স্টেজে এলেন। অমনি ছেলেদের মধ্যে রব উঠল, 'চটকদার টুপিখানা পেলেন কোথায়?' তক্ষুণি চট করে টুপিটা খুলে চেয়ারের তলায় লুকিয়ে রাখলেন তিনি।

বেতো রোগী প্রফেসর ওয়াডলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে নিজের আসন গ্রহণ করতে যাবেন–তক্ষুণি সবাই দরদী স্বরে তাঁর পায়ের অবস্থায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে শুরু করল। অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়লেন ওয়াডলে।

সাড়ম্বরে প্রবেশ করলেন আমার সদ্য পরিচিত প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। তাঁর কালো দাড়ি দেখার সাথে সাথেই হলের পিছন দিক থেকে ছেলেরা এমন চিৎকার করে সংবর্ধনা জানাল যে টারপ্‌ যে তাঁকে লণ্ডনের সবচেয়ে অপ্রিয় ব্যক্তি মনে করে ভুল করেনি, সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল।

সামনের দিকে নিখুঁত পোশাক পরা কয়েকজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে সমবেদনার হাসি শোনা গেল। ছাত্রদের সংবর্ধনা তাঁদের অপছন্দ হয়নি। হিংস্র পশুর খাঁচায় বালতি করে খাবার দিতে গেলে যেমন হুঙ্কার ওঠে ছাত্রদের ওই চিৎকারকে একমাত্র তার সাথেই তুলনা করা যেতে পারে, অর্থাৎ–রীতিমত বিকট।

চ্যালেঞ্জার বিরক্তির হাসি হেসে দর্শকদের দেখতে দেখতে দাড়িতে হাত বুলাতে লাগলেন। ভাবটা এমন যেন কতগুলো জন্তু জানোয়ার দেখছেন তিনি। হৈ চৈ কমে আসতেই চেয়ারম্যান প্রফেসর রোনাল্ড মারে আর মিস্টার ওয়াল্ড্রন এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে; অনুষ্ঠান শুরু হলো।

চেয়ারম্যানের পরে আরম্ভ করলেন ওয়াল্ড্রন, 'প্রফেসর মারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলছি, বেশিরভাগ ইংরেজের যা দোষ তা তাঁর মধ্যেও রয়েছে, অর্থাৎ এত আস্তে কথা বলেন যে শোনাই যায় না। যে সব মানুষের কোন বক্তব্য আছে তাঁরা যে কেন একটু কষ্ট না করে নিজেদের কথা শ্রুতিগোচর হওয়ার প্রতি উদাসীন তা বর্তমান দুনিয়ার এক আশ্চর্য রহস্য।'

শক্ত বেতো মানুষ ওয়াল্ড্রন। কণ্ঠ আর স্বভাব দুটোই একটু উগ্র ধরনের। কিন্তু একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তাঁর। অন্যের কথা থেকে বাছা বাছা অংশগুলো নিয়ে নিজের ভাষায় সুন্দর করে সাজিয়ে বলতে পারেন তিনি। নীরস বিষয়ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে কেবল তাঁর বলার ভঙ্গিতে।

তিনি সংক্ষেপে, এমন ভাষায় তাঁর বক্তব্য আমাদের সামনে তুলে ধরলেন যে, চোখের সামনে যেন জীবন্ত ছবি ভেসে উঠল। পৃথিবী কেমন ছিল, ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে কুঁচকে গিয়ে কেমন করে পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি হলো, কেমন করে বাষ্প পানি হলো। কিন্তু প্রাণীর জন্ম ঠিক কীভাবে হলো তা এড়িয়ে গেলেন কৌশলে। বললেন, 'যেহেতু সৃষ্টির শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ের প্রচণ্ড গরমে কোন প্রাণীরই জীবন্ত থাকা সম্ভব ছিল না, অতএব ধরে নেয়া যায় যে তারা পরে এসেছে। তবে কি প্রাণের জন্ম হয়েছে পৃথিবী ঠাণ্ডা হবার সময়েই–অজৈব পদার্থ থেকে? খুবই সম্ভব। বাইরে থেকে উল্কায় চড়ে প্রাণী পৃথিবীতে এসেছে–এটা অচিন্তনীয়। এটাও আবার ঠিক যে ল্যাবরেটরিতে আজ পর্যন্ত আমরা অজৈব পদার্থ থেকে প্রাণ সঞ্চার করতে পারিনি। তবে তখনকার রসায়ন আর পরিবেশ ভিন্ন ছিল–সেই পরিবেশ আর নেই বলেই হয়তো আমরা এখনও জীবন তৈরি করতে পারিনি।'

বলে চললেন বক্তা। কীভাবে জীবনের ক্রম বিকাশ হয়েছে, প্রথমে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ছিল, তারপর আরও এগিয়ে সরীসৃপ, মাছ থেকে ক্যাঙ্গারু, ইঁদুর। এই প্রাণীই প্রথম জীবন্ত সন্তান প্রসব করে, অর্থাৎ সব জীবন্ত প্রসবকারী প্রাণীর আদি। এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদেরও আদি পিতামাতা সে-ই।

হলের পিছন থেকে একজন ছাত্র চিৎকার করে উঠল, 'মানি না! মানি না!'

সেদিকে ভাল করে খেয়াল করে বললেন, 'লাল টাই পরা যে ভদ্রলোক ডিম ফুটে বেরিয়েছেন বলে দাবি করেছেন, তাঁকে বলছি–দয়া করে বক্তৃতা শেষ হবার পর আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করলে আমি খুবই বাধিত হব। এমন একটি আশ্চর্য প্রাণী দেখার সুযোগ জীবনে হয়তো আর হবে না আমার। (হেসে উঠল সবাই)। ভাবতে অবাক লাগে যে প্রকৃতির আশ্চর্য ব্যতিক্রমে জন্ম হয়েছে ওই লাল টাই পরা ভদ্রলোকের।'

এই ভাবে সবার মুখ টিপে হাসাহাসির মধ্যে দিয়ে সুকৌশলে লাল টাই পরা ছেলেটিকে জব্দ করে নিজের বক্তব্যে ফিরে গেলেন বক্তা। সমুদ্র শুকিয়ে যাওয়া, চর জেগে উঠা, কাদার মধ্যে বাস করা প্রাণী-লেগুনে প্রাণীর প্রাচুর্য, সামুদ্রিক প্রাণীর প্রচুর খাদ্যের লোভে কাদায় উঠে আসা-ফলে সামুদ্রিক প্রাণীগুলোর বৃহদাকার হয়ে ওঠা। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে, সেই সব বিরাটকায় প্রাণী-যাদের ফসিল উইলডন বা সোলেনহফেন প্লেটের মধ্যে দেখে এখনও আমাদের কলজে শুকিয়ে যায়-তারা মানুষ জন্ম নেয়ার আগেই পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে গেছে।'

'মানি না!' মঞ্চ থেকে একটা স্বর হুঙ্কার ছাড়ল।

লাল টাই পরা ছেলেটার বেলাতেই দেখা গেছে যে বাধা পেলে কেমন রূঢ় ভাষায় পর্যুদস্ত করতে পারেন মিস্টার ওয়াল্ড্রন। কিন্তু এবার এমন অস্বাভাবিক জায়গায় বাধা পেয়েছেন যে হঠাৎ করে বলার কিছুই খুঁজে পেলেন না তিনি। তারপর গলা চড়িয়ে ধীরে ধীরে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, 'মানুষ পৃথিবীতে আসার আগেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে।'

'জবাব চাই!' আবার সেই কণ্ঠ শোনা গেল মঞ্চ থেকে।

ওয়াল্ড্রন মঞ্চে বসা প্রফেসরগণের উপর চোখ বুলালেন। চ্যালেঞ্জারের উপর দৃষ্টি পড়তেই চোখ আটকে গেল তাঁর। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আধবোজা চোখে মিটিমিটি হাসছেন প্রফেসর। 'আচ্ছা,' বললেন ওয়াল্ড্রন, 'তা হলে আমার বন্ধু প্রফেসর চ্যালেঞ্জার!' বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার নিজের বক্তব্যে ফিরে গেলেন তিনি। যেন চ্যালেঞ্জারের বাধা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এর বেশি কিছু বলার বা গুরুত্ব দেয়ার দরকার নেই।

কিন্তু যতবারই নতুন করে আরম্ভ করেন তিনি প্রতিবারেই হুঙ্কার আসে, 'জবাব চাই!' সেই একই গলা। কয়েকবার চেষ্টা করেও এগুতে পারলেন না বক্তা। এবার ছাত্ররাও যোগ দিল চ্যালেঞ্জারের সাথে। প্রফেসরের দাড়ি একটু নড়ে উঠলেই তাঁর মুখ থেকে কোন শব্দ বের হবার আগেই ছেলেরা গর্জন করে ওঠে, 'জবাব চাই!' এমন কঠিন পরিস্থিতিতে এর আগে আর কোনদিন পড়েননি তিনি।

'অর্ডার!' 'শেম!' ইত্যাদি চিৎকারের মধ্যে ওয়াল্ড্রন প্রফেসরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'এটা সত্যিই অসহ্য।' তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে। 'আপনি এমন অজ্ঞ আর অভদ্রের মত বারবার বাধা না দিলে ভাল করবেন।'

হলের সব শ্রোতা উত্তেজনা নিয়ে নীরবে বসে আছে। ছাত্রেরা কৌতুকের সাথে স্টেজের ওপর প্রফেসরদের ঝগড়া উপভোগ করছে। প্রফেসর হাতলের উপর ভর দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'মিস্টার ওয়াল্ড্রন, আপনার কথার উত্তরে আমি আপনাকে বলব যে আপনিও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণিত নয় এমন সব কথা না বললেই ভাল করবেন।'

ভীষণ হৈ চৈ উঠল চ্যালেঞ্জারের এই মন্তব্যে। 'শেম! শেম!' 'ওঁকেও বলতে

দিন,' 'বের করে দিন ওকে,' 'মঞ্চ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিন,' 'আমরা শুনব ওঁর বক্তব্য,' ইত্যাদি নানারকম চিৎকার উঠল শ্রোতাদের মধ্য থেকে।

সভাপতি উত্তেজিতভাবে দু'হাত নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে বললেন, 'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, এটা তাঁর নিজস্ব মতামত, পরে আলোচনা হবে।'

কুর্নিশ করে চ্যালেঞ্জার নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন; বক্তা বক্তৃতার মাঝে মাঝে বারবার রক্ত দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন চ্যালেঞ্জারের দিকে। কিন্তু প্রফেসরের চেহারার কোন পরিবর্তন নেই–একই রকম হাসি মাখা মুখ নিয়ে বসে আছেন নিজের আসনে।

বক্তৃতা শেষ হলো; একটু যেন তাড়াহুড়ো করেই বক্তা হঠাৎ তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন বলে মনে হলো।

সভাপতির অনুরোধে আবার উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর, 'ভদ্রমহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ,' আরম্ভ করলেন তিনি। পিছন থেকে একটা গুঞ্জন উঠল। 'মাফ করবেন, ভদ্র মহিলা, ভদ্রমহোদয় এবং তরুণমণ্ডলী, আবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি–অনিচ্ছাকৃতভাবে দর্শক মণ্ডলীর একটা বিরাট অংশের কথা আমি উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম।' শোরগোল আরম্ভ হলো, বিরাট মাথাটা উপরে নীচে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এক হাত তুলে সমঝদারের মত দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, যেন সবাইকে তাঁর ধৈর্যশীল আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।

হট্টগোল থামতেই প্রফেসর আবার আরম্ভ করলেন, 'সবার তরফ থেকে মিস্টার ওয়াল্ড্রনকে তাঁর সুন্দর বর্ণনামূলক ও কল্পনাপ্রবণ বক্তৃতার জন্যে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে আমাকে মনোনীত করা হয়েছে। কোন কোন বিষয়ে আমি তাঁর সাথে একমত নই–সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরা আমি পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করি। জনপ্রিয় বক্তৃতা শুনতে ভাল লাগে বটে, কিন্তু মিস্টার ওয়াল্ড্রন,' প্রাক্তন বক্তার দিকে মিট মিট করে চেয়ে বললেন, 'আমি জানি আমার সত্য এবং স্পষ্ট উক্তির জন্যে নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি। এসব বক্তৃতা স্বভাবতই ভাসাভাসা হয়ে থাকে, এবং শ্রোতাদেরকে বিপথে চালিত করে। বিশেষত বক্তৃতাটা যখন একেবারে অজ্ঞ লোকেদের সামনে দেয়া হচ্ছে।'

শ্লেষপূর্ণ হর্ষধ্বনি উঠল শ্রোতাদের মাঝ থেকে।

'জনপ্রিয় বক্তৃতা প্রকৃতিগত ভাবেই পরনির্ভরশীল হয়।' ওয়াল্ড্রনের চোখে মুখে যেন রাগ ফেটে পড়তে লাগল।

'জনপ্রিয়তার জন্যে তাঁরা অপরিচিত সহকর্মীদের কৃত কর্মের সুফল ভোগ করে থাকেন। কিন্তু যাক সে কথা, এবার আসল কথায় আসি।'

লম্বা ভূমিকা শেষ হয়েছে দেখে অনেকক্ষণ হাততালি পড়ল।

'একজন মৌলিক অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক হিসাবেই আমি প্রতিবাদ করেছি। মিস্টার ওয়াল্ড্রন নিজে কোনদিন প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু দেখেননি বলেই যে

সেসবের অস্তিত্ব থাকবে না এটা ধরে নেয়া তাঁর খুবই ভুল হবে। সন্ধানের মত সন্ধান করলে আজও তাদের দেখা পাওয়া যাবে।'

নানারকম চিৎকার উঠল দর্শকদের মাঝে। 'গাঁজা,' 'প্রমাণ চাই!' 'আপনি কি করে জানলেন!' ইত্যাদি।

'আমি কেমন করে জানি? আমি জানি কারণ আমি তাদের গোপন বিচরণ ভূমিতে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছি।'

হাত তালি আর কোলাহলের মাঝে একটা চড়া গলা শোনা গেল, 'মিথ্যাবাদী!'

'মিথ্যাবাদী? কেউ কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন? একবার উঠে দাঁড়াবেন কি তিনি?'

ছাত্রদের মাঝে একজন চশমা পরা নিরীহ গোছের ছোটখাট মানুষকে ধস্তাধস্তি করতে দেখা গেল। ছাত্রেরা জোর করেই তাকে দাঁড় করিয়ে দিল, 'এই লোকই আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, সার।'

'ঠিক আছে, মীটিং এর পরে নিষ্পত্তি হবে।'

আবার শোনা গেল চিৎকার, 'মিথ্যাবাদী!'

'কে? কে বলছে ও কথা?' জানতে চাইলেন চ্যালেঞ্জার।

আবারও ছাত্রেরা সেই নিরীহ লোকটাকে তুলে ধরল।

'ফাজলামি হচ্ছে? আমি যদি নেমে আসি···'

'আসুন না, ভাই, আসুন।' চিৎকার উঠল ওদের মাঝে, বেশ কিছুক্ষণ হট্টগোল চলল। সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গীত পরিচালকের মত দু'হাত নেড়ে কোন মতে শান্ত করলেন সবাইকে।

'সব বড় আবিষ্কারই প্রথমে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছে।' খ্যাপার মত বললেন প্রফেসর। 'অসাধারণ সত্য আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলেও—সত্য মিথ্যা বিচার করার মত সত্তা আপনাদের নেই। যে মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার করলেন, 'আপনারা কেবল তাঁর দিকে কাদা ছুঁড়তেই জানেন। গ্যালিলিও, ডারউইন, আমি···'

এবারে প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি হেতু থামতে বাধ্য হলেন প্রফেসর। এমনই বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলো যে কয়েকজন মহিলা বাধ্য হয়ে উঠে চলে গেলেন। বড়রাও যোগ দিল ছাত্রদের সাথে। সাদা দাড়িওয়ালা একজন উঠে দাঁড়িয়ে মুঠি ঝাঁকালেন প্রফেসরের দিকে, শ্রোতাগণ উত্তেজনায় একেবারে ফুটন্ত পানির মত টগবগ করতে লাগল।

এক পা সামনে এগিয়ে দু'হাত তুলে দাঁড়ালেন প্রফেসর। তাঁর ভঙ্গিতে এমন একটা ব্যক্তিত্ব রয়েছে যে গোলমাল কমে এল। প্রফেসরের কোন একটা বিশেষ বক্তব্য আছে বলেই মনে হলো। সেটা কি শোনার জন্যে চুপ করল সবাই।

'আপনাদের বেশিক্ষণ আটকে রাখব না আমি। একদল বোকা ছেলে আর

বুড়ো যত চিৎকারই করুক না কেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি বিজ্ঞানের একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছি। অথচ আপনারা মানতে রাজি নন–বেশ ঠিক আছে, আপনাদের মধ্য থেকেই একজন বা দু'জন লোক দিন, তারা আপনাদের পক্ষ থেকে আমার বিবৃতির সততা নির্ধারণ করে আসবেন?'

তুলনামূলক শরীর তত্ত্বের প্রবীণ অধ্যাপক মিস্টার সামারলী দর্শকমণ্ডলীর মাঝ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। লম্বা, ছিপছিপে, আর কঠিন প্রকৃতির মানুষ।

'আপনি কি দু'বছর আগে আমাজনের ধারে আপনার আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতেই বলছেন একথা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন সামারলী।

'হ্যাঁ।' জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার।

'তা কেমন করে হয়? তা হলে আপনি বলতে চান যে ওয়ালেস আর বেট্‌স্ এর মত সুবিখ্যাত আর অভিজ্ঞ আবিষ্কারকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এত বিশাল একটা জিনিস?'

'আপনি ভুল করে আমাজনকে টেম্‌স্ নদী মনে করছেন। আসলে কিন্তু ওই বিশাল এলাকায় যে কোন অভিজ্ঞ আবিষ্কারকেরই বহু কিছু অজানা থেকে যেতে পারে।'

ধারালো তিক্ত হাসি হেসে সামারলী বললেন, 'টেম্‌স্ আর আমাজনের তফাত আমার ভাল করেই জানা আছে। কিন্তু ঠিক কোথায় গেলে এসব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর দেখা পাওয়া যাবে, সেই অবস্থানটা আমাদের বলবেন কি?'

'অবস্থান গোপন রাখার যথেষ্ট কারণ আছে আমার। তবে এ বিষয়ে একটা কমিটি গঠন করা হলে সময় মত সেটা জানাতে আমার আপত্তি নেই। আপনি কি সেই কমিটির পক্ষ থেকে আমার বক্তব্যের সততা পরীক্ষা করে দেখতে রাজি আছেন?'

সামারলী বললেন, 'হ্যাঁ, আমি রাজি আছি।' সবাই চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করল।

'আমি কথা দিচ্ছি কেমন করে ওখানে পৌঁছতে হবে তা আপনাকে নিশ্চয়ই জানাব। তবে মিস্টার সামারলী যখন আমার কথার সততা পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন তখন আমি তাঁর সাথে আরও একজন সাক্ষী থাকা উচিত বলে মনে করি। দর্শকমণ্ডলীর মাঝে এমন কোন স্বেচ্ছাসেবক আছেন কি?'

এভাবেই মানুষের জীবনের মহাসঙ্কট ঘনিয়ে আসে। গ্লাডিস না এই রকম একটা কিছুর কথাই বলছিল? সে নিশ্চয়ই চাইতো যে আমি যাই। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। কথা তৈরি নেই তবু বলতে শুরু করলাম। টারপ্ হেনরি আমার কোটের ঝুল ধরে টানতে লাগল। ফিসফিস করে বলল, 'বসে পড়ো, ম্যালোন–বোকামি কোরো না।'

আমার কয়েক সারি সামনের আরও একজন উঠে দাঁড়ালেন। ছিপছিপে লম্বা গড়ন–লালচে চুল। ওঁকে পাত্তা দিলাম না বলে আমার দিকে রক্ত চোখে চেয়ে

রইলেন। আমি চিৎকার করে বললাম, 'আমি যাব, মাননীয় সভাপতি সাহেব।'

দর্শকের মধ্য থেকে রব উঠল, 'নাম কি?'

'এডওয়ার্ড ডুন ম্যালোন। আমি দৈনিক গেজেটের লোক, সুতরাং নিঃসন্দেহে আমি নিরপেক্ষ সাক্ষী হব।'

'আপনার নাম, জনাব?' সভাপতি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি লর্ড জন রক্সটন। আমাজনে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। আর এই ধরনের অভিযানে আমার দক্ষতাও আছে।'

'শিকারী, খ্যাতনামা পর্যটক আর খেলোয়াড় বলে আপনার নাম জগৎ বিখ্যাত,' বললেন সভাপতি। 'অন্যদিকে আবার প্রেসের কেউ এই অভিযানে থাকলেও ভালই হয়।'

'আমি প্রস্তাব দিচ্ছি এঁদের দু'জনকেই এই সভার পক্ষ থেকে প্রফেসর সামারলীর সাথে যেতে দেয়া হোক। তাঁরা আমার বক্তব্যের সততা সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করবেন।' সভা শেষ হলো ; চ্যালেঞ্জারের প্রস্তাব মেনে নেয়া হলো।

এভাবেই আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। জনতার স্রোতে দরজার দিকে ভেসে চললাম আমি। রিজেট স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চললাম–পায়ে হেঁটে। হঠাৎ কনুই-এ কার হাত লাগতে ফিরে তাকালাম। কৌতুকপূর্ণ, সুচতুর দুটো চোখের সাথে চোখাচোখি হলো আমার; একহারা দীর্ঘ ব্যক্তিটি লর্ড জন রক্সটন।

'আমরা পরস্পরের সঙ্গী হতে যাচ্ছি, তাই না, মিস্টার ম্যালোন? কাছেই আমার বাসা, আপনার সাথে একটু আলাপ করতে চাই–দয়া করে যদি আধঘণ্টার জন্যে আসেন, বড় খুশি হব।'

পাঁচ

লর্ড জন রক্সটন আমাকে ভিগো স্ট্রীট দিয়ে নিয়ে গেলেন। একটা অপরিষ্কার প্রবেশ পথ দিয়ে এগিয়ে বিখ্যাত অভিজাত পাড়ায় ঢুকলাম আমরা। মেটে রঙের লম্বা গলির মাথায় একটা দরজা খুলে তিনি বাতি জ্বেলে দিলেন। রঙিন শেডের ভিতর থেকে কয়েকটা বাতি একসাথে জ্বলে উঠল। বিরাট ঘরটা ভরে উঠল গোলাপীচ্ছটায়। অসাধারণ আয়েশ আর মার্জিত রুচির পাশাপাশি ঘরটাতে পৌরুষের ছাপ রয়েছে। রুচিবান ধনী আর অবিবাহিত যুবকের অগোছালো একটা ভাব সহজেই ধরা পড়ে। দামী নরম পশমী কার্পেট ছাড়াও রামধনু রঙের টুকরো টুকরো কার্পেট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মেঝেতে–সম্ভবত পুবদেশীয় কোন বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। দেয়ালের ছবিগুলো দেখে আমার আনাড়ি চোখেও ধরা

পড়ল যে ওগুলো মূল্যবান, দুর্লভ সংগ্রহ। সারি সারি কাপ, মেডেল আর শীল্ড দেখে বোঝা যায়, খেলাধুলা দৌড় ঝাঁপ সবদিকেই দক্ষতা আছে রক্সটনের।

ফায়ার প্লেসের কাছে কারুকাজ করা তাকটার উপরে দেয়ালে ঝুলানো রয়েছে দুটো বৈঠা–গাঢ় নীল একটা বৈঠার উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা আরেকটা গোলাপী রঙের বৈঠা; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌকা বাইচ বিজয়ীর পরিচয় বহন করছে।

দেয়ালে আরও রয়েছে নানা ধরনের বিচিত্র প্রাণীর মাথা, পৃথিবীর কোন দেশের জীবজন্তুই বাদ নেই; সেগুলোর মধ্যে সাদা গণ্ডারের মাথাটাই সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দুর্লভ পুরনো টেবিলটার সামনে একটা আর্মচেয়ারে আমাকে বসিয়ে দুটো বড় গ্লাসে হুইস্কি আর সোডা ঢেলে একটা গ্লাস আমার সামনে নামিয়ে রেখে নীরবে উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসলেন রক্সটন। একটা সিগার তুলে নিয়ে রূপার চুরুটদানীটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে চকচকে চোখে একদৃষ্টে আমাকে দেখতে লাগলেন। নীল চোখ, অনেকটা বরফগলা সরোবর রঙের।

চুরুটের নীলচে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে ভাল করে দেখলাম তাঁর চেহারা। অবশ্য খবরের কাগজের ছবি থেকে এই মুখ আমার কাছে আগে থেকেই সুপরিচিত। টিয়াপাখির ঠোঁটের মত নাক, বসা গাল, লালচে চুল, পুরুষালী গোঁফ, আর চিবুকের উপর উদ্ধত একগোছা দাড়ি। রোদ আর খোলা বাতাসে গায়ের চামড়া মাটির টবের মত সুন্দর লালচে হয়েছে। শক্ত করে চুরুটটা কামড়ে ধরে অস্বস্তিকর নীরবতার মাঝে তিনি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। অসহ্য নীরবতা।

শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভাঙলেন তিনি। বললেন, 'আমরা দু'জনেই আজ একটা অস্বাভাবিক কাজ হাতে নিলাম, কি বলেন?'

'অবশ্যই,' একটু চিন্তা করে জবাব দিলাম আমি।

'আগে থেকে নিশ্চয়ই এমন কোন চিন্তা ছিল না আপনার?'

'না। হলে যাবার সময়েও ভাবিনি এভাবে জড়িয়ে পড়ব।'

'আমিও না। কিন্তু কথা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমরা দু'জনেই ফেঁসে গেলাম। মাত্র তিন সপ্তাহ আগে ফিরেছি ইউগাণ্ডা থেকে, তারপর আবার গিয়েছিলাম স্কটল্যাণ্ডে একটা চুক্তি সই করতে। বেশ কর্মব্যস্ততা, কি বলেন?'

'কিন্তু সেটা করেছেন আপনার ব্যবসার খাতিরেই। আমি দৈনিক গেজেটে কাজ করি, এই সবই আমার লাইনের।'

'অবশ্যই, সেটা আপনি আগেই খুলে বলেছেন। একটা ছোট্ট কাজ আছে আমার, আপনি যদি সাহায্য করেন বাধিত হব।'

'সাহায্য করতে পারলে অবশ্য আনন্দিতই হব আমি।'

'ঝুঁকি নিতে রাজি আছেন তো?'

'কেমন ঝুঁকি?'

'মানে, আমি ব্যালিঞ্জারের কথা বলছি, ঝুঁকিটা ওঁকে নিয়ে। ব্যালিঞ্জারের কথা নিশ্চয়ই জানেন আপনি?'

'না তো?'

'কোথায় ছিলেন এতদিন? সার জন ব্যালিঞ্জারের নাম শোনেননি? উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে ভাল জকি। সমতল মাঠ হলে অবশ্য সব সময়েই তাঁকে হারাতে পারি আমি, কিন্তু ঘোড়ার হার্ডল রেসে তিনি আমার ওস্তাদ। লুকানো ছাপানোর কিছু নেই, প্রতিযোগিতার সময় ছাড়া রাতদিন তিনি কেবল মদ খান। আর এমনই খাওয়া খান! বলেন, "গড়পড়তা পুষিয়ে নিচ্ছি!" আবোল তাবোল বকতে আরম্ভ করেছেন গত মঙ্গলবার থেকে। ডাক্তার বলেছেন, এই সময়ে কিছু খাবার পেটে না পড়লে বাদবাকি খোদার ইচ্ছা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে বিছানায় রিভলভার আছে একটা, সবাইকে সাবধান করে দিয়েছেন, কেউ কাছে যাবার চেষ্টা করা মাত্র গুলি করবেন। খুবই গোঁয়ার লোক, গুলি চালাতে ওস্তাদ। কিন্তু তাই বলে একজন গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল বিজয়ী জকিকে এভাবে মরতে দেয়া যায় না, কি বলেন?'

'কি করতে চান আপনি?'

'ভাবছি আমরা দু'জনে যদি একসাথে ছুটে যাই ওঁর দিকে তা হলে আমাদের একজনকে হয়তো গুলি করার সুযোগ পাবেন তিনি, কিন্তু অন্যজন কাবু করতে পারব ওঁকে। তারপর টেলিফোনে পাকস্থলী পাম্পের জন্যে খবর পাঠালে ওরাই বাদবাকি ব্যবস্থা করবে। এই ঘরের ঠিক ওপরের ঘরেই আছেন তিনি।'

আমি যে খুব একটা সাহসী লোক তা নয়। আমার আইরিশ চিন্তাধারায় অজানা অচেনাকে কতকটা অহেতুক ভাবেই আমি ভয় পাই। কিন্তু পাছে লোকে ভীতু মনে করে সেই ভয়ে, আত্মসম্মান রক্ষার খাতিরে আগুনে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা করব না আমি। রক্সটনকে বললাম, 'আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

লর্ড রক্সটন বিপদের কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরও উস্কে দিলেন আমাকে, 'কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, চলুন।'

উঠে দাঁড়ালাম আমি। রক্সটনও দাঁড়ালেন।

ঠেলে আমাকে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে মুচকি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন রক্সটন। 'এখন থেকে আমরা বন্ধু—তুমি আমাকে জন বলে ডাকতে পারো।'

'জ্যাক ব্যালিঞ্জারের কি হবে?'

'আজ সকালে আমি নিজেই তাঁর ব্যবস্থা করেছি। আমার কিমোনোর নীচের দিকে কেবল একটা ফুটো হয়েছে—মাতাল অবস্থায় হাত কেঁপে তাঁর তাক ঠিক হয়নি। সপ্তাহখানেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবেন। যাক, তুমি আমার তরুণ বন্ধু, কিছু মনে করোনি তো? প্রফেসর সামারলী হলেন বুড়ো মানুষ, যত ঝামেলা আমাদের দু'জনকেই পোহাতে হবে। অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল জায়গা আমাজন।

ওখানে নির্ভরযোগ্য বন্ধু দরকার। আচ্ছা বলো তো, তুমিই কি সেই ম্যালোন আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় দলের পক্ষে যার খেলার সম্ভাবনা আছে?'

'রিজার্ভে হয়তো আমার নাম থেকে থাকবে।'

'তাই বলো, চেহারাটা চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। রিচমণ্ডের বিরুদ্ধে যে ট্রাই করেছিলে তুমি, সত্যিই অপূর্ব! এত সুন্দর কাটিয়ে নিয়েছিলে–এই মৌসুমে ওরকম সুন্দর আর কোন টাচ্ ডাউন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। রাগবি ম্যাচ আমি পারতপক্ষে মিস করি না।'

'ধন্যবাদ।'

'যাক, আসল কথায় আসা যাক। জাহাজ কবে কবে ছাড়বে তা টাইমস-এর প্রথম পাতায় দিয়েছে। তোমার আর প্রফেসরের যদি কোন অসুবিধা না থাকে তবে আমার মনে হয় সামনের বুধবারে পারা যাচ্ছে যে জাহাজটা ওটা নেয়াই ভাল হবে। তোমার সাজ সরঞ্জামের কতদূর কি?'

'আমার কাগজ থেকে ওরাই সব ব্যবস্থা করবে।'

'গুলি ছোঁড়ায় হাত কেমন তোমার?'

'টার্গেট বড় হলে প্রায়ই লাগাতে পারি।'

'হায় আল্লাহ! এই অবস্থা। দক্ষিণ আমেরিকায় গুলি সোজা চালাতে না জানলে বিপদ আছে। কারণ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যদি পাগল বা মিথ্যাবাদী না হয়ে থাকেন তবে আমরা বহু অদ্ভুত জিনিস দেখব ওখানে। অস্ত্র আছে তোমার?'

ওক কাঠের তৈরি আলমারিটার সামনে এসে দাঁড়ালেন রক্সটন। সেটা খুলতেই আমার চোখে পড়ল সারি সারি ঝকঝকে বন্দুক আর রাইফেলের নল। পাইপ অরগ্যানের মতই দেখাচ্ছে।

'দেখি আমার এখান থেকে তোমার জন্যে কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।' বলে একটা একটা করে বিভিন্ন ধরনের রাইফেল বের করে সশব্দে খুলে আবার বন্ধ করে যথাস্থানে রাখতে লাগলেন। কোনো মা-ও বোধহয় ছেলেমেয়েকে এতটা যত্ন করেন না।

'এটা হচ্ছে ব্রাণ্ডের ·৫৭৭ অ্যাক্সাইট এক্সপ্রেস। সাদা গণ্ডারটা এটা দিয়েই শিকার করেছিলাম আমি। আর দশগজ এগুতে পারলেই ওর শিকারের খাতায় আমার নামটা লেখাতে হত!'

আরেকটা রাইফেল বের করলেন জন। 'এই যে–আরেকটা প্রয়োজনীয় অস্ত্র। ·৪৭০, টেলিসকোপিক সাইট, ডবল নিক্ষেপকারী–সাড়ে তিনশো গজ পর্যন্ত খুব মারাত্মক। তিন বছর আগে এটা ব্যবহার করেছিলাম পেরুর ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের উপর।'

'মানে? আপনি মানুষ খুন করেছেন ওই রাইফেল দিয়ে!'

'হ্যাঁ, কেবল একটা নয়–একদল লোক মেরেছি। মানুষের জীবনে এমনও সময় আসে যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারলে সারা জীবন গ্লানি

বহন করতে হয়। আমিও তেমনি রুখে দাঁড়িয়েছিলাম অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে। পেদ্রো লোপেজকে খতম করেছিলাম পুটোমায়ো নদীর ফিরাস্রোতে। সে ছিল ওদের সর্দার।'

সুন্দর একটা তামাটে আর রূপালী রঙের রাইফেল বের করলেন রক্সটন। 'এতে পাঁচটা গুলি পর পর বেরিয়ে আসে। এটার হাতে জানটা সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারো তুমি।' আলমারি বন্ধ করে রাইফেলটা আমার হাতে তুলে দিলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সম্বন্ধে তুমি কি জানো?'

'গতকাল পর্যন্তও তাঁকে আমি চিনতাম না।'

'আমিও না। আশ্চর্য, আমরা কেউ তাঁকে চিনি না অথচ তাঁর নির্দেশমত দক্ষিণ আমেরিকাতে যাচ্ছি। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা কিন্তু তাঁকে খুব একটা পছন্দ করেন বলে মন হলো না। তা তুমি এটার মধ্যে জড়ালে কি করে?'

সকালবেলার ঘটনার সংক্ষেপে বর্ণনা দিলাম আমি। খুব মনোযোগ দিয়ে সব ঘটনা শুনে দক্ষিণ আমেরিকার একটা ম্যাপ বিছালেন তিনি টেবিলে।

'আমার বিশ্বাস তোমাকে যা বলেছেন তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি,' সরলভাবে বললেন তিনি। 'দক্ষিণ আমেরিকা যে কেমন জায়গা সে সম্বন্ধে আমার কিছুটা ধারণা আছে। ড্যারিয়েন থেকে ফুয়েগো পর্যন্ত এলাকা সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আর চমকপ্রদ। মানুষ এখনও ভাল করে চেনে না এই সব এলাকা। আয়তনে প্রায় ইউরোপের সমান। এই দুর্গম জঙ্গলে কোন কিছু আবিষ্কারেই আমি অবাক হব না।'

রক্সটনকে তাঁর ঘরের গোলাপী আভার মধ্যে রেখে বিদায় নিলাম। তিনি তখনও প্রিয় রাইফেলটায় তেল দিতে দিতে মুচকি হাসছিলেন। বুঝলাম, নতুন অভিযানের অজানা ঝুঁকি তাঁর মনে রোমাঞ্চ জাগিয়েছে।

ঘটনাবহুল দিনের শেষে ক্লান্ত দেহে বার্তা-সম্পাদক মিস্টার ম্যাকারডলকে পুরো ব্যাপারটা জানালাম আমি। শুনে পরদিন সকালেই পত্রিকা প্রধানের সাথে কথা বলে সব ঠিকঠাক করে দেবেন বলে জানালেন তিনি। আমার প্রতি নির্দেশ হলো অভিযানের পুরো রিপোর্ট আমি মিস্টার ম্যাকারডলকে পাঠাব। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যদি অনুমতি দেন তা হলে সেগুলো সম্পাদনা করে সাথে সাথেই ছাপা হবে, নইলে প্রফেসরের ইচ্ছানুযায়ী পরে ছাপা হবে।

ফোন করে সাংবাদিক পেশার গোষ্ঠী উদ্ধার করা বেশ কিছু মন্তব্য শোনার পর প্রফেসরের কাছ থেকে শুনলাম, আমরা কোন্ জাহাজে যাচ্ছি জানালে প্রাথমিক নির্দেশ তিনি জাহাজেই পৌঁছে দেবেন।

ফ্রান্সিসকা জাহাজ। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, কুয়াশাও রয়েছে। তিনজন লোক চকচকে বর্ষাকোট পরে এগিয়ে আসছেন ঘাটের দিক থেকে। তাঁদের আগে আগে

আসছে একজন কুলি; ট্রলিতে উঁচু করে বোঝাই করা হয়েছে ট্রাঙ্ক, মোড়ক আর রাইফেলের বাক্স। প্রফেসর সামারলী পা টেনে টেনে মাথা নিচু করে হাঁটছেন। মনে হচ্ছে, এই অভিযানের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে এরই মধ্যে নিজের উপরেই রাগ হচ্ছে তাঁর।

এমন সময় পিছন থেকে একটা গলার আওয়াজ এল–প্রফেসর চ্যালেঞ্জার; কথামত বিদায় জানাতে এসেছেন।

'না, আমি আর জাহাজে উঠব না,' বললেন প্রফেসর। 'অল্প কথাই বলার আছে আমার, আর তা সব এই খামের ভিতরেই লেখা আছে। কিন্তু আমাজনের পাড়ে মানাওস শহরে পৌঁছানোর আগে খোলা যাবে না চিঠি। কবে কখন খুলতে হবে তাও লেখা আছে খামের উপর।'

আমি কিছু বলতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন, 'না, ম্যালোন, তোমার সংবাদ প্রেরণে কোন বিধি নিষেধ প্রয়োগ করব না আমি–কিন্তু ঠিক কোথায় যাচ্ছ তা ফাঁস করা চলবে না। আর কোন খবরই তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত ছাপানো চলবে না।'

বিদায় নিয়ে গোড়ালির উপর সাঁই করে ঘুরে ফিরে গেলেন চ্যালেঞ্জার তাঁর ট্রেনের দিকে।

আমাদের যাত্রা শুরু হলো।

ছয়

জাহাজে আমরা যে কি রাজার হালে ছিলাম তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আপনাদের ভারাক্রান্ত করব না। এক সপ্তাহ আমরা পারাতে ছিলাম। (পেরেইরা ডা পিন্টা কোম্পানী আমাদের যন্ত্রপাতি, রসদ সব একসাথে করতে খুবই সাহায্য করে।) ছোট আরেকটা স্টীমারে করে চওড়া, শান্ত স্রোতের একটা নদী ধরে আমরা ওবিডস হয়ে উজানে গিয়ে মানাওস পৌঁছলাম।

ব্রিটিশ-ব্রাজিলিয়ান ট্রেডিং কোম্পানীর প্রতিনিধি মিস্টার শর্টম্যানের সৌজন্যে আমাদের আর স্থানীয় সরাইখানায় থাকতে হলো না। বেশ ভালই কাটল তাঁর আতিথেয়তায়। যা-ই হোক, অবশেষে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের দেয়া চিঠি খোলার নির্ধারিত দিন এল।

আমার সঙ্গী দু'জন সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। বিজ্ঞানী হিসাবে প্রফেসর সামারলী পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। তবে তাঁকে দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে বোঝাই যায় না এই ধরনের কষ্টসাধ্য অভিযানের জন্যে তিনি যে কতখানি উপযুক্ত। লম্বা দড়ির মত শরীরে ক্লান্তি বলে কিছু নেই। ছেষট্টি বছর বয়স কিন্তু

আমাদের অভিযানের নানা কষ্ট ক্লেশের মধ্যেও কেউ কখনও তাঁকে নালিশ করতে শোনেনি। কষ্টসহিষ্ণুতায় আমার চেয়ে কোন অংশেই কম যান না তিনি।

প্রথম থেকেই প্রফেসর সামারলীর বদ্ধমূল ধারণা যে চ্যালেঞ্জার একটা ঠগ। বৃথাই আমাদের কাকের পিছনে দৌড়ানো। দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে নানান বিপদ আপদে পড়তে হবে আর শেষ পর্যন্ত কিছু না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসাই সার হবে। জাহাজে চড়ার পর থেকেই এই একই কথা বলছেন সামারলী।

কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অদ্ভুত নিষ্ঠা। প্রজাপতি ধরার জাল আর বন্দুক নিয়ে সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো আর নানান জাতের বিচিত্র সব পোকা-মাকড় সংগ্রহ করে তাঁর সময় কাটে। সন্ধ্যায় তিনি সারা দিনের শিকার সযত্নে পিন দিয়ে আটকে রাখেন। খুবই অন্যমনস্ক ভাব তাঁর। মুখে সব সময়ে ব্রায়ার কাঠের পাইপ ঝুলছে। ক্যাম্পের জীবন নতুন কিছু নয় তাঁর কাছে।

লর্ড জন রক্সটনের সঙ্গে সামারলীর কিছু কিছু মিল আছে; আবার অনেক গরমিলও আছে তাঁদের। রক্সটন বয়সে বিশ বছরের ছোট হলেও দু'জনের দেহের গড়ন একই ধরনের। সব সময় খুব পরিপাটি আর ছিমছাম থাকতে ভালবাসেন জন। সাদা ড্রিলের সুটের সাথে তামাটে রঙের উঁচু বুট পরেন পায়ে। রোজ অন্তত একবার দাড়ি কামাবেনই তিনি।

সারা পৃথিবী সম্বন্ধে বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান রাখেন জন। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস সামারলী যতই নাক সিটকান না কেন কিছু একটা পাবই আমরা। গলার স্বর মোলায়েম হলেও তাঁর নীল চোখের পিছনে আত্মপ্রত্যয়শীল আর কঠিন একটা মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়।

এখানকার লোকেদের মাঝে সাড়া পড়ে গেছে জনের আগমনে। এদের হিরো হচ্ছেন জন-রেড চীফ। পীরের মত মানে তাঁকে সবাই। ওঁর সম্বন্ধে আশ্চর্য আশ্চর্য অনেক গাঁথা প্রচলিত আছে এখানে, সেগুলোর কিছু কিছু সত্যিই বিস্ময়কর।

কয়েকজন লোক নিলাম আমরা। প্রথম জন এক বিশাল নিগ্রো হারকিউলিস, নাম জাম্বো। ঘোড়ার মত খাটতে পারে লোকটা, বুদ্ধিও অনুরূপ। ওকে নিয়েছিলাম পারা থেকে, এক জাহাজ কোম্পানীর সুপারিশে। সেই জাহাজেই ভাঙা ভাঙা ইংরেজি শিখেছে সে।

মিশ্র রক্তের গোমেস আর ম্যানুয়েলকেও নেয়া হয়েছে পারা থেকেই। দু'জনই দাড়িওয়ালা ভয়ঙ্কর দর্শন লোক। চিতাবাঘের মত কর্মঠ। নদী পথে লাল কাঠের একটা সাপ্লাই নিয়ে এসেছিল ওরা জঙ্গল থেকে। আমরা যেদিকটায় অভিযানে যাব সারাটা জীবন ওরা সেদিককার জঙ্গলেই কাটিয়েছে। ওদের একজন, গোমেস, চমৎকার ইংরেজি বলতে পারে। রান্নাবাড়া, নৌকা চালানো, মোট বওয়া বা যে কোন কাজেই দু'জনের কেউ পিছপা নয়।

এরা ছাড়াও আরও তিনজন বলিভিয়ার মোজো ইণ্ডিয়ানকে নেয়া হয়েছে আমাদের সাথে-সবার বেতনই মাসে পনেরো ডলার করে। তিন জনের মধ্যে যে

সর্দার তাকে গোত্রের নাম অনুযায়ী মোজো বলে ডাকে সবাই। অন্য দু'জনের একজন জোসি আর অন্যজন ফারনান্দো।

দীর্ঘ এক সপ্তাহ পরে চরম সময় উপস্থিত। ফাজেন্দা সান্তা ইগনাসিয়ার ছায়া ঘেরা একটা বৈঠকখানা। মানাওস থেকে দু'মাইল ভিতরে। বাইরে সূর্যের ঝলমলে আলো। পামগাছের ছায়াও গাছগুলোর মতই নিকষ কালো। বাতাস স্থির, নানা জাতের পোকা, মৌমাছি আর মশা যেন সারগমের সুর তুলেছে।

বেতের টেবিলের চারপাশে বসেছি আমরা। খামটা টেবিলের উপর রাখা। খামের উপর প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের অসমান অক্ষরে লেখা:

'দুপুর ১২টা জুলাই ১৫'

লর্ড জন তাঁর ঘড়িটা খুলে টেবিলের উপর রাখলেন। 'আর মাত্র সাত মিনিট বাকি আছে,' বললেন রক্সটন, 'আমাদের প্রফেসর নিখুঁত কাজে বিশ্বাসী।'

একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে শুকনো পাতলা হাত দিয়ে খামটা তুলে নিলেন সামারলী। 'সাত মিনিট পরে আর আগে কি আসে যায়? আমি ভাল করেই জানি এই লোক হাতুড়ে, ভণ্ড।'

'কিন্ত আমাদের তাঁর নিয়ম মেনেই চলতে হবে,' বললেন জন, 'হঠাৎ যদি প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এসে হাজির হন এখানে, আর দেখেন আমরা তাঁর নির্দেশ এবং বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি, সেটা কি আমাদের ছোট মনেরই পরিচয় দেবে না?'

'খুব ভাল কথা,' তিক্তভাবে মন্তব্য করলেন সামারলী। 'লণ্ডনে থাকতেই এটা আমার কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল, এখন নিজের চোখে এলাকাটা দেখার পর গোটা ব্যাপারটা নেহাতই অসম্ভব মনে হচ্ছে। জানি না খামের মধ্যে কি আছে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু না থাকলে ফিরতি "বলিভিয়া" জাহাজেই ফিরে যাব আমি। একটা পাগলকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী কাজ পড়ে আছে আমার। সেসব কাজে গোটা পৃথিবী উপকৃত হবে। সাত মিনিট কি এখনও শেষ হয়নি?'

'হয়তো এখন আপনি খুলতে পারেন ওটা।'

পকেট থেকে ছোট একটা ছুরি বের করে খামটা কাটলেন মিস্টার সামারলী। একটা ভাঁজ করা কাগজ বেরুল খাম থেকে। সাবধানে ভাঁজ খুলে টেবিলের উপর বিছালেন সেটা। একটা সাদা কাগজ! আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি, হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়লেন সামারলী।

'আর কি প্রমাণ চাও তোমরা? এইটাই তো তার স্বীকারোক্তি। নিজের অযোগ্যতা নিজেই স্বীকার করল। এখন দেশে ফিরে তার মুখোশটা খুলে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।'

'অদৃশ্য কালি!' আমি তথ্য যোগান দিলাম।

'মনে হচ্ছে না,' আলোতে ধরে মন্তব্য করলেন জন। 'এই কাগজে কোন দিনই কিছু লেখা হয়নি এটা আমি হলপ করে বলতে পারি।'

'ভিতরে আসতে পারি?' বারান্দা থেকে অতি অস্বাভাবিক জোরে কেউ জিজ্ঞেস করলেন।

বেঁটে আকৃতির একজন মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে আলোর পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে। সেই স্বর, আর সেই বিরাট কাঁধ! আমরা সবাই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম–প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন! মাথায় একটা বাচ্চাদের রঙীন হ্যাট–তার সাথে আবার লাল ফিতে বাঁধা। এগিয়ে এসে বললেন তিনি, 'আমি দুঃখিত যে কয়েক মিনিট দেরি করে ফেলেছি পৌঁছতে। খামটা দেবার সময়ে আমি ভেবেছিলাম যে ওটা খোলার সুযোগ দেব না আপনাদের; ইচ্ছে ছিল আরও ঘণ্টাখানেক আগেই পৌঁছাব আমি। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি আমার পাইলটের একটা ভুলে। প্রফেসর সামারলী আমাকে নিশ্চয়ই শাপশাপান্ত করেছেন?'

'আমি প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি, কেন আপনি এই পথ বেছে নিলেন? আমাদের অভিযান এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত।' প্রতিবাদ করলেন জন।

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে জন আর আমার সঙ্গে হাত মিলালেন চ্যালেঞ্জার। কিন্তু সামারলীর সাথে হাত না মিলিয়ে একটু ব্যঙ্গভরে কুর্নিশ করলেন। তারপর একটা বেতের চেয়ার টেনে বসলেন।

'যাত্রার জন্যে সব তৈরি তো?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'আগামীকালই আমরা রওনা হতে পারি,' বললাম আমি।

'তবে আপনারা কালই রওনা হবেন। এখন আর ম্যাপ দেখার দরকার হবে না। আমিও যাব আপনাদের সাথে, আমার সুযোগ্য নির্দেশে আপনারা ঠিক ঠিক জায়গা মত পৌঁছে যাবেন।'

'জন রক্সটন "এসমেরালডা" নামে একটি স্টীম লঞ্চ ভাড়া নিয়েছেন আমাদের জন্যে।' আমি প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে জানিয়ে দিলাম আমরা পুরোপুরি তৈরি।

'খুব ভাল, আজ রাতের মধ্যেই সবাই গোছগাছ যা করার করে রাখবেন। কাল খুব ভোরেই আমরা রওনা হব।'

সকালেই রওনা হলাম। অবশ্য এখানকার আবহাওয়া অনুযায়ী যে কোন সময়ে রওনা হলেই চলত। দিনের তাপমাত্রা শীতে বা গ্রীষ্মে পঁচাত্তর থেকে নব্বই ডিগ্রীর মধ্যেই ওঠানামা করে। ডিসেম্বর থেকে মে পর্যন্ত এখানে বর্ষাকাল, এই সময়ে নদীতে প্রায় চল্লিশ ফুট পানি বাড়ে। নদীর দুই পাড়ই বন্যায় ভেসে যায়। বিরাট এলাকা জুড়ে শুধু পানি থৈ থৈ করে। এখানকার স্থানীয় লোকেরা একে বলে গ্যাপো; পায়ে চলার জন্যে কষ্টসাধ্য, আবার জাহাজ চলার জন্যে অগভীর। জুন মাসে পানি নামতে শুরু করে, অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে নদীতে পানি সবচেয়ে কম থাকে। এখন এখানকার বিশাল নদী আর উপনদীর পানি অনেকটা স্বাভাবিক।

নদীর ঢাল মাইলে আট ইঞ্চির বেশি না হওয়ায় স্রোত এখানে খুবই কম, জাহাজ নিয়ে উজানে এগুনো আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হলো। দ্রুত এগিয়ে চললাম। একটানা তিনদিন চললাম উত্তর-পশ্চিমে। মোহনা থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরেও নদী এখানে যথেষ্ট চওড়া।

চার দিনের দিন আমরা আমাজনের একটা উপনদীতে ঢুকলাম। মুখের কাছে প্রায় আমাজনের মত চওড়া হলেও কিছুদূর এগুতেই দ্রুত সরু হয়ে এল নদী। আরও দুইদিন চলার পর একটা ইণ্ডিয়ান গ্রামে পৌঁছলাম। এখান থেকেই প্রফেসরের নির্দেশে ফেরত পাঠানো হলো জাহাজ। ২ আগস্ট তারিখে ফেরত চলে গেল এসমেরালডা। আর সেই সাথে বাইরের পৃথিবীর সাথে আমাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

বাঁশের ফালির কাঠামোর উপর চামড়া মুড়ে দুটো বড় আকারের সরু নৌকা তৈরি করতে আমাদের চারদিন কেটে গেল। খুবই হালকা করে বানানো হলো নৌকা যেন জলপ্রপাত বা অন্য কোন বাধা এলে দরকার মত সহজেই বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

আরও দু'জনকে কাজে নেয়া হলো নাবিক হিসাবে–আটাকা আর ইপেটু। প্রফেসরের গত অভিযানে এরাই ছিল তাঁর সাথে। প্রথমে ওরা ভয়ে যেতে রাজি হয়নি, কিন্তু সর্দারের কথা অমান্য করার উপায় নেই এই সমাজে। উপহার আর টাকা দিয়ে প্রফেসর সর্দারকে রাজি করিয়ে ফেলেছেন, সুতরাং বাধ্য হয়েই রাজি হতে হয়েছে ওদের।

নৌকায় আমাদের সব মালপত্র বোঝাই করা হলো, আগামীকাল রওনা হব অজানার উদ্দেশে।

সাত

পরদিন খুব সকালেই রওনা হলাম। এক এক নৌকায় ছয়জন করে। দুই প্রফেসরের ঝগড়া এড়াবার জন্যে সামারলীর নৌকায় পাঁচজন হতেই রক্সটন সেটাতে চট করে উঠে পড়লেন। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ওদিকেই এগুচ্ছিলেন, কিন্তু আর জায়গা নেই দেখে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রক্সটনের দিকে তাকিয়ে ফিরে এসে উঠলেন আমাদের নৌকায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজাজ ভাল হয়ে গেল প্রফেসরের। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে একেবারে ডুবে গেলেন। স্মিত হাস্যে কচি ছেলের মত অবাক বিস্ময়ে প্রতিটি দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন। তবে কখন যে বিনা মেঘে বজ্রপাত হবে সেটা কারও বলার উপায় নেই। তাঁর মেজাজ মর্জির কিছুটা অভিজ্ঞতা আমার

ইতিমধ্যেই হয়েছে। চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে থাকলে যেমন কারও পক্ষে স্বস্তিতে থাকা অসম্ভব ঠিক তেমনি আবার তাঁর সান্নিধ্যে কারও পক্ষে বিষণ্ন থাকাও অসম্ভব।

দু'দিন ধরে আমরা প্রায় দু'শো গজ চওড়া নদী বেয়ে এগিয়ে চললাম। নদীর পানি একটু কালচে হলেও স্বচ্ছ–তলা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। আমাজনের উপনদীগুলো অর্ধেকই এই রঙের, বাকি অর্ধেক সাদাটে, অস্বচ্ছ। যে যে এলাকা পেরিয়ে এসেছে তার ওপর নির্ভর করে পানির রঙ। গাছ-গাছড়া পচলে হয় কালো আর কাদামাটি থাকলে হয় অন্য রঙ।

দু'বার বাধা পেলাম আমরা, একবার জলপ্রপাতে, আরেকবার একটা খাড়াইয়ে। দু'বারই আধ মাইল করে ঘুরে সবকিছু বয়ে নিয়ে যেতে হলো। জঙ্গল বেশি ঘন না হওয়ায় বিশেষ অসুবিধে হলো না আমাদের।

কোনদিন ভুলব না আমি এই জঙ্গলের দৃশ্য। গাছগুলোর যেমন মোটা গুঁড়ি, লম্বায় তেমনি উঁচু। আমার শহুরে জীবনে আমি চিন্তাও করতে পারিনি যে এও সম্ভব। গাছ সোজা উঠে গেছে উপরের দিকে, অনেক উঁচুতে। আমাদের মাথার বহু উপরে ডালপালা মেলেছে চারদিকে। যেখান থেকে ডাল মেলেছে সে জায়গাটা আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে। ডাল বাঁকা হয়ে উপরের দিকে উঠে গিয়ে যেন একটা পাতার মাদুর তৈরি করেছে। পাতার ফাঁক গলে মাঝে মধ্যে দু'এক ফালি সোনালী রোদ সরু লম্বা রেখায় নীচে পড়ছে।

বনের ভিতর দিয়ে শুকনো পাতার কার্পেট মাড়িয়ে চললাম আমরা। কেমন একটা ছমছমে নীরবতা সবার মাঝে। এমনকী যে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আস্তে কথা বলতে জানেন না তাঁর গলা থেকেও এখন ফিসফিস করে শব্দ বেরুচ্ছে।

যদি একা থাকতাম তা হলে সবই অজানা থেকে যেত আমার। কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রফেসর দু'জন নিচু গলায় চিনিয়ে দিতে লাগলেন বিভিন্ন শ্রেণীর গাছ, শিমুল, লালকাঠ, দেবদারু আরও অন্যান্য সব গাছ। এই সব অসংখ্য গাছের প্রাচুর্যের জন্যেই এই মহাদেশ পৃথিবীর সবথেকে বড় কাঠ সরবরাহকারী। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের দিক থেকে এখানে রয়েছে ঘাটতি।

উজ্জ্বল অর্কিড, বিচিত্র সুন্দর রঙীন লিচেন, বড় বড় গাছের কালো গা বেয়ে ধোঁয়ার মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে। কোথাও বা এক এক ফালি রোদ এসে পড়েছে সোনালী অ্যালামাণ্ডা, ট্যাকসোনিয়ার উজ্জ্বল লাল তারা-গুচ্ছে কিংবা কোন গভীর নীল রঙের ইপোমিয়ার উপর। একটা স্বপ্নের দেশের মত দেখাচ্ছে। সূর্যের আলো পাওয়ার জন্যে সব গাছের মধ্যেই যেন একটা নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। লতা গাছগুলো তো বড় গাছের গা বেয়ে উপরে উঠেছেই, অন্য গাছও, যেমন জেসমিন আর জেসিটারা পাম, ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে লতানোর কৌশল শিখে ফেলেছে।

নীচে কোন প্রাণী চোখে না পড়লেও উপরের নড়াচড়ায় বুঝলাম সাপ, বানর আর বড় বাদুড় জাতীয় পথের একটা রাজ্য আছে আমাদের মাথার উপর। অনেক

উপর থেকে অবাক বিস্ময়ে ওরা লক্ষ করছে আমাদের।

দেখা না গেলেও আশেপাশেই কোথাও কোনো ফাঁকে যে মানুষ আছে তার নিদর্শন দেখা যাচ্ছিল। তৃতীয় দিনে বাতাসে ভেসে এল গুরু গম্ভীর দ্রুম দ্রুম শব্দ। আমাদের ক্যানো নৌকা দুটো একটা আরেকটাকে খুব কাছাকাছি অনুসরণ করছে। সঙ্গের ইণ্ডিয়ান অনুচরেরা সবাই যেন একেবারে পাথর হয়ে গেল, তাদের চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ড্রাম,' অবহেলাভরে জবাব দিলেন জন, 'আগেও শুনেছি আমি, এগুলো ওদের যুদ্ধ দামামা।'

'ঠিক বলেছেন, সার,' বর্ণশংকর গোমেস বলল, 'মানসো নয়তো ব্রাভো জংলী ইণ্ডিয়ান। ওরা আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। সুযোগ পেলে সবাইকে মেরে ফেলবে।'

'কীভাবে নজর রাখছে আমাদের উপর?' নিশ্চুপ স্থির বনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। কোন রকম নড়াচড়া চোখে পড়েনি আমার।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গোমেস বলল, 'তা ওরাই জানে–ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব পদ্ধতি আছে। ড্রাম পিটিয়ে পরস্পর কথা বলছে আর আমাদের উপর নজর রাখছে। একটু সুযোগ পেলেই মেরে ফেলবে আমাদের।'

আঠারোই আগস্ট–মঙ্গলবার। আজ কম করে হলেও ছয়টা ড্রাম বাজতে লাগল বিভিন্ন জায়গা থেকে। বিকেল হয়ে আসলে কখনও দ্রুত আবার কখনও ধীরে ধীরে বাজছে। স্পষ্টই বোঝা গেল যে সওয়াল জবাব চলছে ওদের মধ্যে। পুব দিকের একটা ড্রাম অত্যন্ত দ্রুততালে বেজে উঠল ডুগডুগির মত। একটু পরেই উত্তরের ড্রাম বাজল গভীর খাদে। অতি ভয়াবহ আর হিংস্র একটা ভাব রয়েছে ওই একটানা ড্রামের শব্দে। মনে হলো যেন এক কথাই বারবার আউড়ে চলেছে, 'সুযোগ পেলেই মারব তোদের, এইবারেতে মারব তোদের।'

নীরব বনের মধ্যে কেউ নড়ছে না। ছায়া ঘেরা বনে সুন্দর স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে কিন্তু তারই পিছন থেকে একটানা হুমকি আসছে ভেসে, 'সুযোগ পেলেই মারব তোদের, সুযোগ পেলেই মারব।'

সারাদিন ধরে ড্রামগুলো গুড়গুড় ফিসফিস করল। সেই ভীতিকর শব্দ প্রত্যেকটা স্থানীয় লোকের মুখে সুস্পষ্ট ভয়ের ছাপ এঁকে দিয়েছে। এমনকী ক্ষিপ্র চিতার মত গোমেস, সেও চুপসে গেছে।

বিজ্ঞানী প্রফেসর দু'জনকে দেখে অবাক হতে হয়। মানুষখেকোদের ড্রাম আদৌ বিচলিত করতে পারেনি তাঁদের। সারাদিন তাঁরা লতাপাতা আর পাখি দেখে, আর ঝগড়া করে কাটাচ্ছেন। ড্রামের শব্দ যেন তাঁদের মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটছে না। এমন একটা ভাব যেন সেন্ট জেমস স্ট্রীটের রয়াল সোসাইটি ক্লাবের বিশ্রাম কক্ষে তাঁরা বসে আছেন!

মাত্র একবারই চ্যালেঞ্জার ওদের বিষয়ে কথা তুললেন। 'বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনের বনে শব্দের দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'মানুষখেকো মিরানহা বা আমাজুয়াকা।'

'কোন সন্দেহ নেই,' উত্তর দিলেন সামারলী। 'অন্যান্য উপজাতীয়দের মত মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর নানা ভাষার সংমিশ্রণ এখানেও আছে বলে আমার বিশ্বাস।'

'বহু সংমিশ্রণ অবশ্যই আছে,' বললেন চ্যালেঞ্জার, 'প্রায় একশো গোত্র সম্বন্ধে আমার বিশেষ নোট নেয়া আছে। কিন্তু মঙ্গোলীয় কিনা সে সম্বন্ধে আমার গভীর সন্দেহ আছে।'

আবার লেগে গেলেন দুই প্রফেসর।

'তুলনামূলক শরীর বিদ্যাতে যার সামান্য জ্ঞান আছে সে-ও আমার কথার মর্ম বুঝতে পারত,' তিক্ত ভাবে বললেন সামারলী।

গর্ব ভরে আকাশের দিকে মুখ তুলতে তুলতে চ্যালেঞ্জারের এমন অবস্থা হলো যে দাড়ি আর টুপির কিনারা ছাড়া মুখের আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। 'কোনই সন্দেহ নেই, জনাব, কেবল মাত্র অল্প বিদ্যান ব্যক্তিই ওকথা বলবে। কিন্তু জ্ঞান যাঁর গভীর তিনি ভিন্ন রকম সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন।'

রক্তচোখে দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইলেন। ওদিকে ড্রাম ফিসফিসিয়ে একটানা বলে চলেছে, 'অল্প পরেই মারব তোদের, সুযোগ পেলেই মারব।'

সেই রাতে আমরা মাঝ নদীতে ভারী পাথরের সাথে নৌকা বাঁধলাম। সেই সাথে যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করার সব রকম ব্যবস্থাই নেয়া হলো। কিন্তু কোন আক্রমণ এল না। সকালে আবার রওনা হলাম আমরা, ধীরে ধীরে ড্রামের শব্দ পিছিয়ে পড়তে লাগল। বিকেল তিনটার দিকে–প্রায় এক মাইল লম্বা একটা খাড়াই আর প্রবল স্রোতের সম্মুখীন হলাম।

মনটা খুশিতে ভরে উঠল আমার। চ্যালেঞ্জারের গল্পের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে, এখানেই নৌকা উল্টে টেরাড্যাকটিলটা হারিয়েছিলেন তিনি।

ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আমাদের নিযুক্ত স্থানীয় ইণ্ডিয়ানরা প্রথমে আমাদের নৌকা ও পরে রসদ পার করল।

সন্ধ্যার মধ্যে আরও মাইল দশেক এগিয়ে নৌকা বাঁধলাম। আমি আন্দাজ করলাম উপনদী ধরে অন্তত একশো মাইল ভিতরে ঢুকেছি আমরা।

পরদিন সকালে রওনা হতে হতে দশটা বেজে গেল। রওনা হওয়ার পর থেকেই প্রফেসর চ্যালেঞ্জার অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বার বার দুই পাড়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ 'ঘোঁৎ!' করে একটা শব্দে সন্তোষ প্রকাশ করলেন তিনি।

একটা বিরাট পাম গাছ বাঁকা হয়ে নদীর দিকে হেলে রয়েছে। ওদিকে সামারলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ওটা?'

'ওটা অতি অবশ্যই একটা আসাই পাম।'

'ঠিক! এই আসাই পাম গাছটাই আমি পথ নির্দেশের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম। গোপন পথটা ঠিক আধ মাইল সামনে নদীর উল্টো পাড়ে। গাছ গাছড়ার মধ্যে কোন ফাঁক নেই, সেটাই আশ্চর্য রহস্য। সামনে যেখানে হালকা সবুজ নলখাগড়া দেখা যাচ্ছে–ওই যে শিমূল আর গাঢ় সবুজ ঝোপঝাড়ের ঠিক মাঝখানে–ওটাই আমার অজানা দেশে পৌছবার গোপন প্রবেশ পথ। কাছে গেলেই বুঝতে পারবেন।'

জায়গাটা সত্যিই সুন্দর! নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে লগি ঠেলে কয়েকশো গজ এগিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম একটা ছোট অগভীর স্রোতস্বিনীতে। খুবই খেয়াল করে ঝোপের বদলে যে নলখাগড়া জন্মেছে তা লক্ষ না করলে কেউ কোনদিনও এখানে পৌছতে পারবে না। এমন স্বচ্ছ একটা স্রোতস্বিনী আর পরীর দেশের মত জায়গা কল্পনাও করা যায় না।

পরীর দেশই এটা। মানুষ এমন সুন্দর জায়গা কেবল স্বপ্নেই দেখতে পায়। স্রোতস্বিনীর দু'ধারের গাছগুলো মাথার উপর প্রাকৃতিক ছাতা তৈরি করেছে। ফাঁক দিয়ে সোনালী আলো আর দু'এক ফালি রোদ এসে পড়েছে স্বচ্ছ পানির উপর। হিমবাহের ধারের মত সবজে, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ আর কাঁচের সরু পাতের মত পরিষ্কার দেখাচ্ছে। পাতার তোরণের নীচে বৈঠার প্রত্যেক টানে শত শত ছোট্ট ঢেউ কাঁপছে পানির উজ্জ্বল উপরিভাগে। অজানা অচেনা অদ্ভুত দেশে পৌছার উপযুক্ত পথ বটে।

জংলী ইণ্ডিয়ানদের চিহ্নও নেই এখানে। তবে এখন অনেক জীবজন্তু দেখা যাচ্ছে। ওদের নির্ভয় চলা ফেরা দেখেই বোঝা যায় যে শিকারী সম্পর্কে ওরা মোটেও সতর্ক নয়।

ছোট ছোট ব্ল্যাক-ভেলভেট বানরগুলো তাদের তুষার সাদা দাঁতে দাঁতে বাড়ি দিয়ে শব্দ তুলে কৌতূহলী চোখে আমাদের যাওয়া লক্ষ করছে। একটা টাপির ঝোপের ভিতর থেকে একবার উঁকি দিয়েই অদৃশ্য হলো। বিরাট একটা চিতা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে আক্রোশ ভরা চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিজের পথ ধরল।

পাখির প্রাচুর্য বিশেষ করে নজরে পড়ছে। বেশির ভাগই জলচর পাখি। বক, সারস আর আইবিস–নীল, গাঢ় লাল আর সাদা রঙের। নদীর উপরে ঝুঁকে পড়া প্রত্যেকটি ডালেই দেখা গেল অসংখ্য পাখি। আর পানিতে বিভিন্ন আকার ও বিচিত্র রঙের মাছের সমারোহ।

তিনদিন আমরা প্রায় ঝাপসা সবুজ সূর্যের আলোয় স্রোতস্বিনীর সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে গেলাম। লম্বা পানির ধারাটি যে কোথা থেকে শুরু হয়েছে বোঝা মুশকিল; সামনে বহুদূর পর্যন্ত দেখা গেল শুধু পানি আর পানি। এদিকে মানুষের কোনো অস্তিত্ব মোটেও চোখে পড়ল না।

'এদিকে কোন ইণ্ডিয়ান নেই। কুরুপুরির ভয়ে এই এলাকায় কেউ আসে না,'

বলল গোমেস।

'কুরুপুরি হচ্ছে জঙ্গলের ভূত বা দৈত্য,' ব্যাখ্যা দিলেন জন। যে কোন ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, জিন, পরী সবার বেলাতেই এই নাম প্রযোজ্য। ওদের ধারণা এদিকে ভীতিজনক কিছু আছে, তাই ভুলেও কেউ এদিকে আসে না।'

তৃতীয় দিনে পরিষ্কার বোঝা গেল আমাদের নৌকা যাত্রার পথ এবার ফুরিয়ে এসেছে। স্রোতের ধারাটা দ্রুত অগভীর হয়ে এল, দু'ঘণ্টায় আমাদের নৌকা দু'বার তলায় ঠেকে গেল। শেষ পর্যন্ত দুটো নৌকাই ঝোপের মধ্যে টেনে তুলে রাতের মত ক্যাম্প করলাম।

সন্ধ্যায় তাঁবুর ভিতর আমরা চারজন আলাপ করছি ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে। দুই প্রফেসর যথারীতি পরস্পরের পিছনে লেগেছেন এবং কথা কাটাকাটি করছেন। বাইরে একটা ধস্তাধস্তির শব্দে আমরা বেরিয়ে আসার আগেই হারকিউলিস জাম্বো গোমেসকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল। জাম্বোর ভাঙা ভাঙা ইংরেজী থেকে বোঝা গেল যে আমাদের তাঁবুর পিছনে সন্দেহজনকভাবে উবু হয়ে বসে ছিল গোমেস।

খাঁটি ইণ্ডিয়ান অধিবাসীরা মিশ্র রক্তের মানুষকে একেবারেই দেখতে পারে না, রীতিমত ঘৃণা করে। সুযোগ পেয়ে প্রভুভক্ত কুকুরের মত গোমেসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জাম্বো।

হঠাৎ ছুরি বের করেই কোপ মারল গোমেস। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে হাতটা কব্জির কাছে ধরে ফেলল জাম্বো, তার হাতের পেশীগুলো ফুলে উঠল। এক হাতেই মোচড় দিল সে, ছুরিটা মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু তার পরেও ছাড়ল না জাম্বো। জন বাধা না দিলে হাতটা হয়তো মুচড়ে ভেঙেই ফেলত সে।

গোমেস খুবই কাজের লোক। কোন কাজেই না নেই তার। কৌতূহল চাপতে না পেরে হয়তো শুনতে চেষ্টা করছিল আমরা কোথায় যাচ্ছি বা আমাদের উদ্দেশ্য কি।

গোমেসকে ভর্ৎসনা করে দু'জনের হাত মিলিয়ে দেয়া হলো। আশা করা যায় যে ওদের নিয়ে ভবিষ্যতে আর কোন জটিলতা দেখা দেবে না।

সকালে আমি আর রক্সটন প্রায় দুই মাইল অগ্রসর হলাম, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, স্রোতের ধারার কিনার ঘেঁষে। দেখলাম উপরের দিকে পানি আরও সরু আর অগভীর হয়ে এসেছে। ক্যাম্পে ফিরে জানালাম সবাইকে।

চ্যালেঞ্জার বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তো গতকালই বলেছি এর পরে আর নৌকা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এখন থেকে আমাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে বাকি পথ।'

নৌকা দুটো ভাল করে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে কুড়াল দিয়ে গাছে দাগ কেটে চিহ্ন রাখা হলো যেন ফেরার পথে চিহ্ন খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা না হয়। সব মালপত্র আর বোঝা ভাগ করে নিয়ে আমরা যাত্রার সবথেকে কঠিন অংশ পার

হতে রওনা হলাম।

কিন্তু শুরুতেই আবার দুই প্রফেসরে বেধে গেল। প্রথম থেকেই প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের নির্দেশে সবাই চলে আসছে, কিন্তু সামারলী সেটা ঠিক মেনে নিতে পারেননি। এতদিনের জমা সেই অসন্তোষ অবশেষে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

তেমন ভারী কিছু নয়, একটা ব্যারোমিটার বহন করতে দেয়া হয়েছিল তাঁকে। হিসহিসিয়ে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলেন সামারলী। 'জানতে পারি কি, জনাব, কোন্ অধিকারে আপনি সবাইকে আদেশ নির্দেশ দিয়ে চলেছেন?'

কটমট করে তাকালেন চ্যালেঞ্জার সামারলীর দিকে। সোজা হয়ে গেল তাঁর দেহ। 'প্রফেসর সামারলী, আমি নির্দেশ দিচ্ছি এই অভিযানের নেতা হিসাবে।'

'কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনাকে আমি নেতা হিসাবে মানি না।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ ভরে সামারলীকে কুর্নিশ করলেন চ্যালেঞ্জার। 'তা হলে আপনিই বলে দিন আমার পদ-মর্যাদা কি।'

'বলছি। আপনার সত্যবাদিতার বিচার চলছে। বিচারকমণ্ডলীর সাথে চলেছেন আপনি!'

'আচ্ছা!' বলেই একটা গাছের নীচে বসে পড়লেন চ্যালেঞ্জার। 'ঠিক আছে, আপনারা তা হলে এগিয়ে যান, আমি আমার সময় মত আপনাদের পিছু পিছু আসব। আপনি নিজে, বা যাকে আপনি নেতা মানেন তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন—আমি দায়িত্ব থেকে রেহাই পেলাম।'

এত জ্ঞানী মানুষ, এমন মেধা তাঁদের, যে লোকে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। নিজ নিজ বিষয়ে তাঁরা পৃথিবীর সেরা বৈজ্ঞানিক। অথচ ব্যবহারে দু'জন একেবারেই শিশু। কি বিচিত্র এই পৃথিবী।

ভাগ্য ভাল যে দলে দু'জন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষও ছিল। নইলে অভিযান অসমাপ্ত রেখে এখান থেকেই ফিরে যেতে হত আমাদের। বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে, অনেক সাধ্যসাধনা করে রাজি করানো গেল তাঁদের। তবু চ্যালেঞ্জারকে আগে নেয়া গেল না। সামারলীই আগে থাকলেন, আর পিছন থেকেই নির্দেশ দিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চললেন চ্যালেঞ্জার।

আমরা পরে টের পেয়েছিলাম যে এডিনবারার ডক্টর ইলিংওয়ার্থ সম্পর্কে উভয় প্রফেসরেরই ধারণা খুব খারাপ। কোনো ভাবে ওই বিষয়টিকে ওঠাতে পারলেই উভয়ে একমত হন এবং একটা আপাত মৈত্রী হয়ে যায় তাঁদের মধ্যে। কখনও বেগতিক দেখলেই আমরা ডক্টর ইলিংওয়ার্থের নাম উচ্চারণ করে তাঁর প্রসঙ্গ তুলতাম।

সার বেঁধে নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। স্রোতের ধারা ছোট হতে হতে শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় মিলিয়ে গেল শ্যাওলার তলায়। সেখানেই স্রোত পার হলাম আমরা। আমাদের পা শ্যাওলায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। মেঘের মত মশা উড়ছে চারপাশে। মশার সঙ্গে হাজারো রকমের ছোট ছোট পোকা। পাড়ে

উঠে আশ্বস্ত হলাম। তখনও কানে আসছে পোকা আর মশার গুনগুন শব্দ।

নৌকা ছেড়ে আসার দ্বিতীয় দিনে দেখলাম আশেপাশের পরিবেশে পরিবর্তন আসছে। আমরা কেবল উপরের দিকেই উঠছি। যতই উপরে যাচ্ছি গাছপালাও ততই পাতলা হয়ে আসছে। নদীর ধারের বিশাল বিশাল গাছের জায়গায় এদিকে দেখা যাচ্ছে ফিনিক্স আর কোকো পাম, সব বিচ্ছিন্নভাবে গজিয়ে উঠেছে। মাঝে মধ্যে ঝোপঝাড়। কম্পাসের সাহায্যে দিক নির্ণয় করে চললাম আমরা। দুই একবার চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে পথ প্রদর্শক ইণ্ডিয়ান দু'জনের মতবিরোধ দেখা দিল। দলের সবাই ইণ্ডিয়ানদের নির্দেশই মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাগে, দুঃখে চ্যালেঞ্জার মন্তব্য করলেন, 'বিজ্ঞানসম্মত কম্পাসের চেয়ে দু'জন অসভ্য ইণ্ডিয়ানের ধারণাকেই বেশি বিশ্বাস করলেন আপনারা? ছোঃ!'

আমরা যে ভুল করিনি তা প্রমাণিত হলো তৃতীয় দিনে যখন চ্যালেঞ্জার নিজেই স্বীকার করলেন যে কিছু কিছু জায়গা তিনি চিনতে পারছেন। আরও নিশ্চিত হওয়া গেল যখন আগুনে জ্বলে কালো হওয়া চারটে পাথর দেখতে পেলাম।

আমাদের পথ এখনও উঁচুতেই উঠছে। পাথরে ভরা জায়গাটা পার হতে আমাদের দু'দিন সময় লাগল। গাছপালার চেহারা আবারও বদল হয়েছে। আইভরি পাম ছাড়া আর কোন বড় গাছ নেই এই এলাকায়। আর আছে নানা জাতীয় অর্কিড্। এখানেই আমি দুর্লভ নাট্রোনিয়া ভেক্সিল্লারিয়া, গোলাপী ও গাঢ় লাল রঙের ক্যাটলিয়া আর অডন্টোগ্লসাস চিনতে শিখলাম। একটি দু'টি ছোট ঝর্না, ছোট্ট ছোট্ট পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে নেমে গেছে। দু'ধারে শ্যাওলা।

প্রতি সন্ধ্যায়ই আমরা কোন একটি ঝর্নার ধারে ক্যাম্প করি। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ঘুরছে ঝর্নাগুলোতে–পিঠের রঙ নীল। প্রায় ইংলিশ ট্রাউটের সমানই বড়। আকৃতিও একই রকমের। (আমাদের দেশের শোল মাছের মত–অনুবাদক) রাতের বেলা এই মাছ দিয়ে চমৎকার সুস্বাদু খাবার রান্না হয়।

নৌকা ছেড়ে আসার নয় দিনের দিন থেকে গাছপালা ক্রমে ছোট হতে হতে শেষে গুল্মলতায় পরিণত হলো। এখন গাছ আর নেই, শুধু বেত ঝাড়। এতই ঘন যে কুড়াল আর বড় ছুরি দিয়ে না কেটে ভিতরে ঢোকাই যায় না। সকাল সাতটা থেকে আরম্ভ করে সারাদিন গিয়ে রাত আটটা বেজে গেল আমাদের বেতবন পার হতে। মাঝে দু'বার এক ঘণ্টা করে মাত্র বিশ্রাম নিয়েছি। এমন একঘেয়ে ক্লান্তিকর পথ যে চিন্তাই করা যায় না। সবচেয়ে খোলা জায়গাতেও দশ বারো গজের বেশি নজর যায় না। বেশির ভাগ সময়েই আমি কেবল লর্ড জনের জ্যাকেট পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি, তাঁর দু'পাশে ঝোপঝাড় হলদে দেয়ালের মত দাঁড়ানো। এমন জঙ্গলে কিসের বাস জানি না তবে কয়েকবারই আমাদের খুব কাছ থেকে কোন ভারি জন্তু ছুটে পালিয়ে গেল। জন ধারণা করলেন যে ওগুলো বুনো ষাঁড়।

রাত হতে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে আমরা তাঁবু ফেললাম। সবাই ক্লান্ত।

পরদিন সকালেই আবার রওনা হলাম। আমাদের সামনের দৃশ্য আবার পাল্টাচ্ছে এখন। খোলা প্রান্তর ক্রমে উপরের দিকে উঠে গেছে, অসংখ্য ফার্ণ গাছে ভরা। প্রান্তরটা তিমি মাছের পিঠের মত বাঁকা হয়ে ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দুপুর নাগাদ আমরা বাঁকের মাথায় পৌঁছলাম। ওপাশে ছোট অগভীর উপত্যকা; তার পরে আবার উপরে উঠেছে মাঠ।

দু'জন ইণ্ডিয়ানের সাথে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সবার আগে আগে চলছিলেন। হঠাৎ থেমে উত্তেজিত ভাবে ডান দিকে দেখালেন তিনি। তাকিয়ে দেখলাম প্রায় মাইল খানেক দূরে বিরাট বড় একটা সাদা রঙের পাখি ডানা ঝাপটে ধীরে ধীরে মাটি থেকে উপরে উঠল। খুব নিচু দিয়ে সোজা উড়ে আড়ালে চলে গেল পাখিটা।

'দেখেছেন!' উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন চ্যালেঞ্জার, 'সামারলী, দেখেছেন তো?'

পাখিটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে নীরবে তাকিয়ে আছেন সামারলী।

'ওটা কি বলে দাবি করছেন আপনি?' তিনি ব্যঙ্গ ভরে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার যতদূর বিশ্বাস ওটা একটা টেরাড্যাকটিল,' গম্ভীরভাবে বললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

হো হো করে হেসে উঠলেন সামারলী। 'একটা বড় সারস ছাড়া আর কিছুই নয় ওটা।'

রাগের চোটে কথা ফুটল না চ্যালেঞ্জারের মুখে, ঝট করে ঘুরেই হাঁটা আরম্ভ করলেন তিনি।

জন এগিয়ে এলেন আমার পাশে। ওঁর মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। হাতে জাইস বাইনোকুলার। 'পাখিটা অদৃশ্য হবার আগে ফোকাস করেছিলাম আমি। কি যে ওটা বলতে পারব না আমি, তবে জোর দিয়ে বলতে পারি যে জীবনে বহু পাখি দেখেছি, শিকারও করেছি, কিন্তু এরকম পাখি কোনদিন চোখে পড়েনি।'

সামনে এগিয়ে চললাম আমরা। দ্বিতীয় টিলাটা পার হতেই সামনে খোলা জায়গা পড়ল। এখানে পাম গাছ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে। শেষ মাথায় লাল পাথরের খাড়া উঁচু একটা পাহাড়–স্কেচে দেখা এই পাহাড়টা চিনতে দেরি হলো না আমার। কোন সন্দেহই রইল না যে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছেছি। আমাদের ক্যাম্প থেকে এই পাহাড়টা এখন প্রায় সাত মাইল দূরে। গর্বিত ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে হাঁটাচলা করছেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। সামারলী চুপ করে থাকলেও সন্দিগ্ধ। আর মাত্র একদিন পরেই সব সন্দেহের অবসান হবে।

আট

পাহাড়ের কাছে পৌঁছে দেখলাম কোন কোন জায়গা হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। এডিনবারার সেল্‌স্‌বারি ক্রাগের মতই গড়ন। চূড়ার দিকে নানা রকম গাছ দেখা যাচ্ছে, তবে অন্য কোন প্রাণীর লক্ষণ এখনও আমাদের চোখে পড়েনি।

পাহাড়ের ধার কেবল যে খাড়া উঠে গেছে তাই নয়, উপরের দিকে আবার হেলে বেরিয়ে এসেছে কিছুটা। সুতরাং বেয়ে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। পিরামিডের মত পাথরটার ঠিক উপরেই দেখা যাচ্ছে ছবির সেই বিশাল গাছটা। কিন্তু মাঝখানে বিরাট ফাঁক। প্রায় ছ'শো ফুট উঁচু হবে পাথরটা, পাহাড়ও এখানে বেশ নিচু; উচ্চতায় দুটো প্রায় সমানই হবে।

'এই গাছের ওপরেই বসেছিল টেরাড্যাকটিলটা,' গাছটা দেখিয়ে বললেন চ্যালেঞ্জার। 'আমি অর্ধেক বেয়ে উঠে গুলি করেছিলাম। আমার মত দক্ষ পাহাড়ে-চড়া লোকের পক্ষেও ওপর পর্যন্ত ওঠা সম্ভব হয়নি।'

টেরোড্যাকটিলের কথা উঠতে আড় চোখে সামারলীর দিকে তাকালাম আমি। তাঁর ঠোঁটের কোণ থেকে বিদ্রূপের হাসি উবে গেছে। কিছুটা যেন অনুতপ্তই মনে হচ্ছিল তাঁকে; দুই চোখে উত্তেজনা আর বিস্ময়। চ্যালেঞ্জারও সেটা লক্ষ করে তৃপ্তি বোধ করলেন।

সামারলীর পিছনে লাগলেন প্রফেসর, 'মিস্টার সামারলী অবশ্যই বুঝবেন যে, আমি টেরোড্যাকটিল বললে সেটা সারসকেই বোঝায়। এমন সারস, যেটার পালক নেই, আছে ছাল চামড়ার মত ঝিল্লীর পাখা আর চোয়ালে দাঁত,' চোখ মিটমিট করতে করতে দাঁত বের করে হেসে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে রইলেন চ্যালেঞ্জার। কোন কথা না বলে ঘুরে অন্যদিকে চলে গেলেন সামারলী।

সকালে সামান্য কিছু নাস্তা খেলাম। সঞ্চিত খাবারের দিকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে আমাদের। কি করে উপরে ওঠা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করতে মীটিঙে বসলাম আমরা।

চ্যালেঞ্জার এমন ভঙ্গিতে বসে সভাপতিত্ব করছেন, মনে হচ্ছে তিনি স্বয়ং লর্ড চীফ জাস্টিস। একটা পাথরের উপর বসে, ছেলেমানুষী হ্যাটটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়েছেন। তাঁর গর্বিত চোখ আধ বোজা পাতার নিচ থেকে আমাদের উপর আধিপত্য করছে, আর তাঁর বিখ্যাত কালো দাড়ি কথার তালে তালে নড়ছে উপরে আর নীচে। আমাদের বর্তমান অবস্থা আর পরবর্তী করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে ধীরে ধীরে জ্ঞান দান করলেন চ্যালেঞ্জার।

শ্রোতা আমরা সবাই। আমি, মুক্ত আলো বাতাসে এতদূর আসার পর রোদে

পোড়া এক তরুণ যুবক। সামারলী চুপচাপ, কিন্তু এখনও নিঃসন্দেহ নন, পাইপটা লেগেই আছে তাঁর মুখে; আর ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ ধার লর্ড জন তাঁর নমনীয় সতর্ক দেহটা রাইফেলে ভর দিয়ে রয়েছেন কিন্তু ঈগল চক্ষু একাগ্রতার সাথে বক্তার উপর নিবদ্ধ। আমাদের পিছনে গোমেস, ম্যানুয়েল আর অন্যান্য সবাই।

'বলাই বাহুল্য যে পাহাড়ে ওঠায় দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও গতবারে আমি সরঞ্জামের অভাবে পুরো উঠতে পারিনি। কিন্তু এবার তৈরি হয়ে এসেছি। আমি হলপ করে বলতে পারি যে ওই পিরামিডের মত পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে এখন আমার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু মূল মালভূমির সাথে যোগাযোগ না থাকলে এই পথে উপরে পৌঁছা অহেতুক। পুব দিকে ছয় মাইল পর্যন্ত আমি ঘুরে দেখেছি, উপরে ওঠার কোন পথ নেই। এখন করণীয় কি?'

'সেক্ষেত্রে আমাদের সামনে একটাই যুক্তিসঙ্গত পথ খোলা আছে,' বললেন সামারলী। 'আগেরবার আপনি যখন পুব দিকে দেখেছেন এবার আমাদের পশ্চিম দিকে খোঁজ করে দেখা উচিত।'

'ঠিক,' বলে উঠলেন জন। 'এই মালভূমিটা খুব বড় না হবারই সম্ভাবনা। আমরা এর চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে দেখতে পারি। কোন সহজ পথ না পেলেও ক্ষতি নেই, যেখান থেকে রওনা হব আবার সেখানেই ফেরত আসব আমরা।'

'এই ছেলেকে আমি আগেই বুঝিয়ে বলেছি,' বললেন চ্যালেঞ্জার। আমাকে বছর দশেকের স্কুলের ছাত্র হিসাবে গণ্য করা যেন তাঁর একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। 'সহজ রাস্তা থাকা একেবারেই অসম্ভব, ওঠার সহজ রাস্তা থাকলে সেই পথে ওরাও সহজেই নেমে আসতে পারত।'

'তবে এটা ঠিক যে দক্ষ পর্বতারোহীর পক্ষে হয়তো কোন কোন জায়গায় উপরে চড়া সম্ভব হতে পারে। এমন জায়গা অন্তত একটা আছে নিশ্চয়ই। বিশাল ভারী কোন জন্তুর পক্ষে হয়তো সেই পথ দিয়ে নীচে নামা অসম্ভব।'

'কথাটা কি প্রমাণ ছাড়া আন্দাজে বলা হলো না?' সামারলী কঠোর প্রতিবাদ করলেন। 'আপনার পাহাড়ের মত উঁচু জমি আমি স্বীকার করে নিতে রাজি আছি, কেননা আমি তা নিজে দেখেছি। কিন্তু তার উপরে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে এটা আমি মানতে রাজি নই।'

'আপনি মানেন কি মানেন না সেটা নিতান্তই অবান্তর বিষয়। তবে লাল পাহাড়টা যে আপনার মগজে একটু স্থান করে নিতে পেরেছে তা জেনে খুশি হলাম।' বলে উপরের দিকে চেয়ে পাহাড়টা দেখলেন চ্যালেঞ্জার। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে পাথর থেকে নেমে তিনি সামারলীর ঘাড়ে ধরে চিবুকটা ঠেলে উপরের দিকে চাইতে বাধ্য করলেন। 'এবার, সার!' চিৎকার করে বললেন চ্যালেঞ্জার, 'এবার তো বিশ্বাস করবেন যে উপরে জীবজন্তু আছে?'

উপরের সবুজ লতাপাতার ভিতর থেকে একটা কালো চকচকে বস্তু বেরিয়ে এল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বাইরে ঝুলে রইল কিছুক্ষণ। দেখলাম একটা বিরাট সাপ, মাথাটা কোদালের মত চ্যাপটা। মিনিট খানেক এঁকে বেঁকে মাথার উপর নড়াচড়া করল, সকালের রোদে ঝিলিক দিয়ে উঠল সাপটার মসৃণ তেলতেলে দেহ, একটু পরেই পিছু হটে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

সামারলী এতই বিস্মিত আর অভিভূত হয়ে দেখলেন দৃশ্যটা যে চ্যালেঞ্জারের অশোভন আচরণের প্রতিবাদ করতেও ভুলে গেলেন তিনি। সাপটা অদৃশ্য হতেই নিজেকে ছাড়িয়ে কাপড় জামা একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে স্ব-সত্তায় ফিরে এলেন তিনি।

'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, আপনার কিছু বক্তব্য থাকলে সেটা শুধু মুখে বললেই আমি খুশি হব। একটা পাথুরে পাইথনের আবির্ভাবেই এভাবে আমার থুতনি ঠেসে ধরার কোন অধিকার আপনার নেই।'

'কিন্তু এখন তো স্বীকার করবেন যে উপরে জীবজন্তু বাস করে?' বিজয়ী কণ্ঠে বললেন চ্যালেঞ্জার। 'আমার মতে এই প্রদর্শনীর পর আর সময় নষ্ট না করে ওপরে ওঠার পথের খোঁজে এক্ষুণি আমাদের পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে যাওয়া উচিত।'

খাঁড়ির নীচে জমি পাথরে ভর্তি আর ভাঙাচোরা, তাই আমাদের অগ্রগতি খুবই ধীর আর কঠিন হলো। হঠাৎ আরেকটা জিনিস আবিষ্কারে আমাদের মন খুশিতে ভরে উঠল। এখানে আমাদের আগেও কেউ ক্যাম্প করেছিল। কয়েকটা খালি মাংসের টিন পড়ে রয়েছে, টিনগুলো শিকাগোতে তৈরি। একটা খালি বোতল-লেবেলে লেখা, 'ব্র্যাণ্ডি,' একটা ভাঙা টিন খোলার যন্ত্র ইত্যাদি আরও অনেক কিছুর সাথে আমরা পেলাম একটা দুমড়ানো খবরের কাগজ। নামটা পড়তে পারলাম শিকাগো ডেমোক্র্যাট, কিন্তু তারিখ পড়া গেল না।

'এদিকে আমি আসিনি,' বললেন চ্যালেঞ্জার, 'এগুলো নিশ্চয়ই মেপল হোয়াইটের পরিত্যক্ত জিনিস হবে।'

লর্ড জন আগ্রহ ভরে একটা গাছের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'ম্যালোন, দেখ তো এটা বোধ হয় কোন চিহ্ন।'

একটা কাঠের টুকরো পেরেক দিয়ে গাছের গায়ে লাগানো রয়েছে, পশ্চিম দিকে নির্দেশ করে।

'অবশ্যই এটা পথ নির্দেশের চিহ্ন,' বলে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। 'সে চেয়েছিল যে আর কেউ যদি কোনদিন এই পথে আসে তবে যেন জানতে পারে কোন্ পথে গিয়েছিল মেপল। আমার মনে হয় সামনে আমরা আরও চিহ্ন দেখতে পাব।'

সত্যিই তাই। কিন্তু বিষয়টা খুবই অপ্রত্যাশিত আর মর্মান্তিক। এখানেও বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে বেত গাছ জন্মেছে। আমরা যে বেত বন পার হয়ে এসেছি সেই রকমই কিন্তু আরও হালকা। গাছগুলোর ডগা বেশ চোখা আর প্রায় বিশ ফুট

লম্বা–শক্তও। এক একটা বর্শার মত দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সাদা কি যেন একটা চোখে পড়ল আমার। কাছে গিয়ে বেতের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখলাম সামনে পড়ে রয়েছে চামড়া-মাংসহীন একটা মানুষের মাথার খুলি। অদূরেই বাকি কঙ্কালটাও পড়ে আছে, মাথাটা কেমন করে দেহ থেকে আলাদা হয়ে ঝোপের ধারে চলে এসেছে।

ইণ্ডিয়ানদের বড় বড় ছুরি দিয়ে কয়েক কোপ দিতেই পরিষ্কার হয়ে গেল জায়গাটা। জীর্ণ কয়েক টুকরো কাপড় এখনও চেনা যায়, বুট জোড়া রয়েছে পায়ের হাড়ের উপর। স্পষ্ট বোঝা যায় মৃত লোকটি সাদা চামড়াধারী ছিল। নিউ ইয়র্কের হাডসন কোম্পানীর তৈরি একটা সোনার ঘড়ি আর চেনের সাথে আটকানো একটা কলম পড়ে রয়েছে পাশেই। একটা রূপার সিগারেট কেসও পাওয়া গেল, কেসের গায়ে 'এ. ই. এস. থেকে জে. সি,' এই কথা ক'টা খোদাই করা। রূপার কেসের অবস্থা দেখে মনে হলো গত কয়েক বছরের মধ্যে ঘটে থাকবে এই দুর্ঘটনা।

'লোকটা কে হতে পারে?' জিজ্ঞেস করলেন জন। 'বেচারার শরীরের প্রায় প্রত্যেকটা হাড়ই ভাঙা।'

'ভাঙা পাঁজরের ভিতর দিয়ে বেত গাছ জন্মেছে,' মন্তব্য করলেন সামারলী। 'যদিও বেত গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, তবু যতদিন দেহটা এখানে আছে ততদিনে বিশ ফুট বেড়েছে, এটা অবিশ্বাস্য।'

'লোকটার পরিচয় সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। স্পারাতে যদিও কেউ মেপল হোয়াইট সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেনি, রোজারিওতে আমি খবর পেয়েছিলাম যে মেপলের সাথে একজন আমেরিকানও ছিলেন। নাম জেমস কোলভার। মেপলের স্কেচ বইটাতেও একটা ছবি আছে ওঁর। জেমস কোলভারেরই দেহাবশিষ্ট খুঁজে পেয়েছি আমরা, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।'

'কীভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন তাও সুস্পষ্ট,' বললেন জন, 'নিশ্চয়ই উপর থেকে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল বা তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। এত উপর থেকে না পড়লে তাঁর হাড়ও ভাঙত না আর বেতের ঝোপে শূলবিদ্ধও হতেন না।'

ভাঙা হাড়গুলোর সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। জনের কথাটা যে কত সত্যি তা উপলব্ধি করলাম সবাই। সন্দেহ নেই তিনি উপর থেকেই পড়েছিলেন, কিন্তু কথা হচ্ছে সেটা হঠাৎ দুর্ঘটনা বশত পা ফস্কে নাকি তাঁকে···? নানা অশুভ চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করল অচেনা অজানা জায়গাটাকে ঘিরে।

কোন কথা না বলে চুপচাপ পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগিয়ে গেলাম আমরা। সবখানেই একই রকম খাড়া ভাবে উঠে গেছে পাহাড়। দক্ষিণ মেরুর বিশাল হিমাবাহের মতই যেন সোজা উপরে উঠেছে।

পাঁচ মাইল ঘোরার পরেও কোন ফাটল চোখে পড়ল না। হঠাৎ নতুন আশার সঞ্চার হলো আমাদের মনে। বৃষ্টিতে ভেজে না এমন এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে

খড়িমাটি দিয়ে একটা তীর চিহ্ন আঁকা রয়েছে, তীরের মাথা পশ্চিম দিকে।

'মেপল হোয়াইটের নির্দেশ,' বলে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। 'সাদা চক ব্যবহার করেছিল বলেই ওর বাক্সের রঙিন চকগুলো আস্ত ছিল। কিন্তু সাদাটা ছিল ক্ষয়ে যাওয়া, ছোট্ট।'

'ঘটনাক্রমে প্রমাণ হচ্ছে যে তিনি এই পথেই এগিয়েছিলেন,' বললেন সামারলী। 'আমাদেরও এই পথই অনুসরণ করে পশ্চিমে যাওয়া উচিত হবে।'

আমরা আরও প্রায় পাঁচ মাইল এগিয়ে গেলাম। আরও একটা তীর চিহ্ন দেখতে পেলাম। নির্দেশ অনুযায়ী লক্ষ করতে করতে পাহাড়ের গায়ে এই প্রথম একটা ফাটল নজরে পড়ল। ফাটলের কাছে গিয়ে ভিতরে ঢুকতেই দেখলাম আরও একটা চিহ্ন। এবারের সঙ্কেতটা বেঁকে কিছুটা উপরে উঠে গেছে, মনে হয় যেন মাটি থেকে একটু উপরে কোন একটা জায়গা নির্দেশ করছে।

নিচ থেকে সরু একফালি নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে, সামান্য আলো কোন রকমে ঢুকছে; আধো আলো আধো ছায়া, দু'পাশে বিশাল পাথরের দেয়াল।

গত কয়েক ঘণ্টা ধরে আমাদের পেটে কিছুই পড়েনি। কিন্তু সবাই এমন উত্তেজনা বোধ করছি যে এই মুহূর্তে আর আমাদের পক্ষে ক্ষান্ত দেয়া সম্ভব নয়।

ইণ্ডিয়ানদের ক্যাম্প খাটানোর কাজে লাগিয়ে দিয়ে আমরা চার জন ভিতরে ঢুকলাম, জোসেফ আর ম্যানুয়েলও এল আমাদের পিছু পিছু।

সরু পথ ধরে এগুচ্ছি। মুখের কাছে প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া হলেও দ্রুত সরু হয়ে এল পথটা। ছোট হতে হতে একটা সূক্ষ্ম কোণে মিলে শেষ হলো। পাথর এত মসৃণ আর এমন খাড়া ভাবে ওপরে উঠেছে যে কোন মানুষের পক্ষেই সেখান দিয়ে বেয়ে ওঠা সম্ভভ নয়। ফিরে চললাম আমরা। গিরিখাতটা মাত্র সিকি মাইল মত ভিতরে ঢুকেছে। আমরা যা খুঁজছিলাম তা হঠাৎ লর্ড জনের চোখে পড়ল। আমাদের মাথার বেশ উপরে আধো আলো আধো ছায়ায় দেখা গেল অপেক্ষাকৃত অন্ধকার গোল মত একটা জায়গা। হয়তো কোন গুহার মুখ।

ওইখানে পাহাড়ের গোড়ায় অনেক আলগা পাথর পড়ে রয়েছে। সেগুলো জড়ো করে হাত পা দুই-ই চালিয়ে উপরে ওঠা খুব কঠিন হলো না। সেখানে পৌঁছে আমাদের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। সত্যিই একটা গুহা, আর যেটা বড় কথা, খড়িমাটির দাগ রয়েছে গুহার গায়ে। এখান দিয়েই তা হলে উপরে উঠেছিলেন তাঁরা।

একটা প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ না করে এখন আর ক্যাম্পে ফেরা যায় না। রক্সটনের পিঠে ক্যানভাস ব্যাগের মধ্যে একটা টর্চ ছিল, সেটাই আমাদের একমাত্র আলো। টর্চের ছোট গোল আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চললেন জন, আর আমরা সবাই সার বেঁধে চলেছি তাঁর পিছনে।

পানিতে ক্ষয়ে তৈরি হয়েছে গুহাটা। দুই পাশের পাথর খুবই মসৃণ, মেঝেটা গোল গোল পাথরে ভর্তি। গুহা যথেষ্ট বড়, একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেই একজন মানুষ

স্বচ্ছন্দে এঁটে যায়। চল্লিশ ফুট সোজা ভিতরে যাবার পর দেখলাম গুহাটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী হয়ে উপরে উঠে গেছে। কিছুদূর গিয়ে আরও খাড়া উঠেছে, আমরা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললাম। মেঝের আলগা পাথর মাঝে মাঝে গড়িয়ে পড়ছে নীচে।

হঠাৎ রক্সটনের উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'পথ বন্ধ।'

সবাই তাঁর পিছনে জড়ো হয়ে টর্চের আলোয় দেখলাম ভাঙ্গা বেসল্ট পাথরে গুহার মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে।

'ছাদ ধসে পড়েছে।'

বৃথাই চেষ্টা করলাম আমরা, কয়েকটা পাথর সরাতেই আরও বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়তে লাগল। আরও বড় আকারের পাথর যদি গড়িয়ে পড়ে তা হলে আমাদের পিষে ফেলবে। বোঝা গেল, এই পথ পরিষ্কার করে ওপরে ওঠার কোন আশা নেই। মেপল হোয়াইট যে পথ ধরে উঠেছিল সে পথ আর আমরা ব্যবহার করতে পারব না।

হতাশ মনে ফিরে চললাম। ছোট দলে জড়ো হলাম আমরা। যখন ফাটলের মুখ থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট ভিতরে, হঠাৎ একটা বড় পাথর ভীষণ বেগে ছুটে গেল আমাদের পাশ দিয়ে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেলাম আমরা। পাথরটা কোন্ দিক থেকে এল ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। জোসেফ আর ম্যানুয়েল তখনও গুহার মুখে, ওরা এসে জানাল যে পাথরটা ওদের পাশ দিয়ে এসেছে। তা হলে নিশ্চয়ই পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়েছে ওটা।

উপরে তাকালাম, কোন নড়াচড়া নজরে পড়ল না আমাদের। সবুজ লতা-পাতা গাছ সবই স্থির। এতে কোন সন্দেহ নেই যে পাথরটা আমাদের লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হয়েছিল, ঘটনাটা মানুষের উপস্থিতিরই প্রমাণ দেয়। তবে কি হিংসাপরায়ণ জংলী মানুষের বাস আছে মালভূমির উপরে?

দ্রুত ফাটল থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। সবার মাথায় একই চিন্তা। এই নতুন পরিস্থিতি আমাদের অভিযানে কতখানি বাধার সৃষ্টি করবে? এখানে পাহাড়ের উচ্চতা কিছুটা কম। আর মালভূমির ধারটাও উত্তর দিকে বাঁক নিতে আরম্ভ করেছে। এটাকে যদি আমরা গোল বলে ধরে নেই তবে পরিসীমা খুব বেশি বড় হবে না। উপরে ওঠার সুবিধা না পেলেও কয়েক দিন পরেই আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আবার সেখানে ফিরতে পারব।

একটা চিন্তা সবার মনেই খচ খচ করছে এমনিতেই প্রাকৃতিক বাধাহেতু উপরে ওঠা শক্ত কাজ, তার উপর আবার যদি আমাদের মানুষের বাধার সম্মুখীন হতে হয় তবে কাজটা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। কিন্তু উপরের সুন্দর তাজা সবুজ ঝালরের দিকে চেয়ে, সবকিছু ভাল করে খতিয়ে না দেখে লণ্ডনে ফেরার কথা আমরা কেউই ভাবতে পারলাম না।

প্রায় বাইশ মাইল হাঁটলাম সেদিন, কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন হলো না। নৌকা ছাড়ার

পর থেকে হেঁটে ক্রমাগত উপরেই উঠেছি আমরা। ব্যারোমিটারে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছি। উচ্চতার কারণে তাপমাত্রা আর গাছ পালা, দুটোতেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। পোকার দৌরাত্ম্য এখন অনেক কম। গ্রীষ্মমণ্ডলের যে কোন দেশ ভ্রমণে পোকাই সাধারণত বড় বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু পাম আর অনেক ফার্ণ গাছ এখনও দেখা যাচ্ছে। আমাজন উপকূলের গাছ পিছনে ফেলে এসেছি আমরা। কনভলভিউলাস, কামনা ফুল আর বেগোনিয়া ফুলগুলো দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিদেশ বিভুঁইয়ে চেনা ফুল দেখলে দেশের জন্য মন কেমন করে। একটা লাল বেগোনিয়া আরও বেশি করে মনে করিয়ে দেয় স্ট্র্যাদামের একটা ভিলার কথা। জানালার উপর ঠিক এই রঙেরই ফুল রাখা আছে একটা ফুলদানীতে। ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ছি আমি।

সেই সন্ধ্যায় লর্ড জন একটা অজুটি শিকার করলেন। জন্তুটা অনেকটা শুয়োরের মত দেখতে। অর্ধেক ইণ্ডিয়ানদের দিয়ে বাকি অর্ধেক আমরা রোস্ট করলাম আমাদের খোলা আগুনের ওপর। বেশ একটু শীত শীত ভাব, তাই আমরা সবাই আগুন ঘিরে বসেছি। রাত হয়ে এল, আকাশে চাঁদ নেই, কিন্তু তারার আলোয় আর আমাদের আগুনের আলোতে কিছু কিছু এখনও দেখতে পাচ্ছি।

হঠাৎ রাতের আঁধারের ভিতর থেকে কি যেন বেরিয়ে এল। উড়োজাহাজের মত শোঁ শোঁ শব্দ তুলে নেমে এল ওটা। মুহূর্তের জন্যে দলের আমরা সবাই চামড়ার পাখার বিশাল চাঁদোয়ার নীচে ঢাকা পড়লাম। ক্ষণিকের জন্যে চোখে পড়ল একটা সাপের মত লম্বা গলা, ভীষণ ভয়ঙ্কর রক্তিম লোভাতুর চোখ। বিরাট ঠোঁট হাঁ করে কামড় দেয়ার সময়ে দেখলাম ভিতরে দুই সারি ধারাল দাঁত।

পরমুহূর্তেই দূরে চলে গেল ওটা, দেখলাম সেই সাথে আমাদের খাবারও অদৃশ্য হয়েছে। একটা বিরাট কালো ছায়া অন্তত বিশ ফুট চওড়া, ডানা ঝাপটে উপরে উঠে গেল; তারপর মালভূমির ওপর দিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আমরা হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলাম।

সামারলীই প্রথম স্তব্ধতা ভাঙলেন, 'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার,' ভাবাবেগে কাঁপছে তাঁর গলা, 'ক্ষমা চেয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না, আমার ভুল ভেঙেছে। অতীতে যা বলেছি দয়া করে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।'

সামারলী খুব সুন্দরভাবেই নিজেকে ব্যক্ত করলেন। সমগ্র অভিযানে এই প্রথমবারের মত দুই প্রফেসর হাত মেলালেন। টেরাড্যাকটিলকে চাক্ষুষ দেখে আমাদের একটা লাভ হলো। রাতের খাবার যে চুরি হয়ে গেল সেই শোক আমরা ভুলে গেলাম দুই প্রফেসরের এই মধুর মিলনে।

সত্যিই অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হলো আমার। মনে সামান্য যা একটু সন্দেহ

ছিল তা এবার সম্পূর্ণ মুছে গেল। দৈনিক গেজেট সম্ভবত এই প্রথম ফলপ্রসূ কোন কাজে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। তবে আরও ভাল করে অনুসন্ধান করে সব দেখেশুনে প্রমাণ সহ যদি লণ্ডনে ফিরতে পারি, আর প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যদি অনুমতি দেন, তবেই এটা কাগজে ছাপা সম্ভব হবে। প্রমাণ ছাড়া এমন কিছু লিখলে লোকে আমাকে নির্ঘাৎ 'সাংবাদিক মাঞ্চুসেন' বলে ডাকবে।

কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু মালভূমির উপর থাকলেও তারা সংখ্যায় খুব বেশি হবে না, কারণ পরবর্তী তিন দিনে আমরা আর কোন টেরাড্যাকটিল বা অন্য কোন প্রাণীর দেখা পাইনি। এই তিন দিনে আমরা কেবল বিরক্তিজনক অনুর্বর জমি পার হলাম কখনও পাথুরে শুকনো জমি কখনও বা বন মুরগীতে পরিপূর্ণ নোংরা জায়গা। উত্তর আর পুবদিক পার হতে গিয়ে এমন এক বাধা পড়ল যে পাহাড়ের নীচের বাইরে বেরিয়ে থাকা শক্ত ধারটা না থাকলে আমাদের ফিরেই আসতে হত। কয়েকবারই কোমর পর্যন্ত চর্বির মত এঁটেল কাদা দিয়ে চলতে হলো। তার ওপর আরেক বিপদ, দেখা গেল জায়গাটা জারাকাকা সাপের বংশবৃদ্ধির অতি প্রিয় স্থান। দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বিষধর আর আক্রমণাত্মক সাপ হচ্ছে এই জারাকাকা। নলখাগড়ার ভিতর থেকে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে এসে সাপগুলো বারবার আক্রমণ করতে লাগল। সর্বক্ষণ বন্দুক নিয়ে তৈরি থেকে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা করলাম আমরা।

একটা ছোট ডোবা পড়ল পথে। এক ধরনের সবুজ শৈবালে ভর্তি, সেটার পানির রঙও সবুজ হয়ে রয়েছে। এখানকার ঘটনা আমার চিরদিন দুঃস্বপ্নের মত মনে থাকবে। এই ডোবাটা ওই সাপের বিশেষ প্রিয় জায়গা হবে হয়তো; আমাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে ডোবার ঢালগুলো জীবন্ত হয়ে উঠল, হাজার হাজার সাপ কিলবিল করে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। জারাকাকা সাপের স্বভাবই হচ্ছে যে দেখা মাত্র ওরা আক্রমণ করবে। আর এতগুলোকে গুলি করে মারাও অসম্ভব।

ঝেড়ে দৌড় দিলাম। অনেক দূর গিয়ে ক্ষণিকের জন্যে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম নলখাগড়ার ভিতর থেকে সাপগুলো একবার মাথা তুলছে আবার নামিয়ে নিচ্ছে। যতক্ষণ দমে কুলাল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম আমরা।

এদিককার পাহাড়ে এখন সেই লালচে রঙের বদলে তামাটে চকোলেটের মত রঙ ধরেছে। গাছও এদিকে কম আর বেশ দূরে দূরে। তবে এক একটা গাছ প্রায় তিন চারশো ফুট উঁচু। কিন্তু এত ঘুরেও কোথাও উপরে ওঠার পথ খুঁজে পেলাম না। বরং আমরা প্রথম যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম সেদিকের চেয়ে এদিকে উপরে ওঠা আরও বেশি কঠিন।

আলোচনার মাঝে আমি বলে উঠলাম, 'বৃষ্টির পানি নিশ্চয়ই কোন না কোন পথে নীচে নামে। পাথরের মধ্যে অবশ্যই কোথাও সুরঙ্গ আছে।'

সস্নেহে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন, 'মাঝে মধ্যে ছেলেটার

মাথা খুলে যায়।'

'বৃষ্টির পানি সরতেই হবে কোথাও,' নিজের যুক্তিতে অটল রইলাম আমি।

'কঠিন বাস্তববাদী এই ম্যালোন, কিন্তু নিজেই তো ঘুরে দেখে প্রমাণ পেলে যে পানি বের হওয়ার কোন পথ নেই পাথরের ভিতরে, তাই না?'

'তা হলে পানি যায় কোথায়?'

'আমি মনে করি আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ধরে নিতে পারি যে পানি যখন বাইরে আসছে না তখন ভিতরের দিকেই কোথাও যায়।'

'তা হলে মাঝখানে কোন হ্রদ আছে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'সম্ভবত,' জবাব দিলেন প্রফেসর।

সামারলী বললেন, 'পুরানো কোন আগ্নেয়গিরির গর্তই হয়তো এখন হ্রদে পরিণত হয়েছে।' তারপর নিভে যাওয়া পাইপটা আবার ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'পুরো মালভূমিটাই আগ্নেয়শিলায় তৈরি। যে কোন কারণেই হোক জায়গাটা ভিতরের দিকে ঢালু আর মাঝখানে বিরাট একটা হ্রদ আছে বলে আমার ধারণা। হয়তো সেখান থেকেই মাটির তলা দিয়ে কোন যোগাযোগ আছে জারাকাকা আর অন্যান্য জলাভূমিগুলোর সাথে।'

'অথবা পানি বাষ্পীভূত হয়ে সমতা রক্ষা করছে,' বললেন চ্যালেঞ্জার।

দুই প্রফেসর এমন সব গভীর বৈজ্ঞানিক যুক্তি তর্কের মধ্যে চলে গেলেন যে সেগুলোতে আমাদের পক্ষে দাঁত বসানো সম্ভব নয়।

ছয় দিনের দিন মালভূমি প্রদক্ষিণ শেষ হলো। আমরা আমাদের প্রথম ক্যাম্পে ফিরে এলাম। সেই বিচ্ছিন্ন পিরামিডের চূড়ার মত পাহাড়টার নীচেই আবার ক্যাম্প করলাম আমরা। নৈরাশ্য সবাইকে গ্রাস করেছে। অনুসন্ধানে কোন খুঁত নেই আমাদের। কিন্তু কোথাও এমন একটা জায়গা খুঁজে পাইনি যেখান দিয়ে কোন মানুষ উপরে ওঠার কথা আদৌ ভাবতে পারে।

শিকার করার কারণে আমাদের অনেক খাবার বেঁচেছে, কিন্তু তাতে অনির্দিষ্ট কাল চলবে না। আরও খাবারের প্রয়োজন একদিন হবেই। দু'মাস পরে বৃষ্টি আরম্ভ হবে, তখন পানির তোড়ে ক্যাম্প ভেসে যাবে। পাহাড়টা মার্বেল পাথরের মত শক্ত, পাথর কেটে যে পথ তৈরি করব তাও অসম্ভব। বিষণ্ন মনে আমরা কম্বলের উপর গা এলিয়ে দিলাম, কথা বলার মত মনের অবস্থা কারোই নেই। ঘুমানোর আগে চ্যালেঞ্জারকে শুভরাত্রি জানিয়ে কোন সাড়া পেলাম না, একটা পাথরের ওপর বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন তিনি।

কিন্তু সকালে চ্যালেঞ্জারের সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখলাম। তৃপ্তি আর আত্মপ্রশংসার ভাব তাঁর সারা মুখে। হাত দুটো সামনে জ্যাকেটের উপর রেখেছেন তিনি। ভঙ্গি দেখে মনে হয় অবসর সময়ে তিনি ট্র্যাফালগার স্কোয়ারের মূর্তিটার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে থাকেন।

'পেয়েছি!' বললেন চ্যালেঞ্জার। তাঁর কুচকুচে কালো দাড়ির ভিতর দিয়ে

ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো হেসে উঠল। 'আপনারা আমাকে অভিনন্দন জানাতে পারেন, আমরা সবাই সবাইকে অভিনন্দন জানাতে পারি; সমসার সমাধান হয়ে গেছে।'

'তা হলে আপনি উপরে ওঠার পথ খুঁজে পেয়েছেন?' সোৎসাহে জিজ্ঞেস করলেন জন।

'আমার তো তাই মনে হয়,' তিনি জবাব দিলেন।

'কোন্ পথে?' আমি জানতে চাইলাম।

জবাবে পিরামিডের মত বিচ্ছিন্ন পাহাড়টার দিকে আঙ্গুল তুলে নির্দেশ করলেন চ্যালেঞ্জার।

অন্যদের কথা জানি না, ভাল করে ওটার দিকে তাকিয়ে আমি নিরাশ হলাম। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কথা মত আমরা ওটার উপরে উঠতে সক্ষম হলেও মালভূমির সাথে তার যে ব্যবধান সেটা পার হব কি ভাবে?

'আমরা কিছুতেই পার হতে পারব না,' মনের কথা বলেই ফেললাম আমি।

'ঠিক আছে, অন্তত ওই পর্যন্ত তো পৌছাই, তারপরে প্রমাণ করা যাবে যে মানুষের মস্তিষ্ক অনেক কিছুই উদ্ভাবন করার ক্ষমতা রাখে।'

নাস্তা খেয়ে আমরা প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের আনা পাহাড়ে চড়ার সরঞ্জামের বাক্স খুললাম। ওটা থেকে বের হলো দেড়শো ফুট নাইলনের দড়ি, গজাল, খিল আরও অনেক কিছু।

জন পাহাড়ে চড়ায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সামারলীও কম বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাঁর বিগত জীবনে। আর চ্যালেঞ্জারের তো কথাই নেই। একমাত্র আমিই অনভিজ্ঞ। আমাকে সম্পূর্ণ দৈহিক শক্তি আর প্রাণ-প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করতে হবে।

যত কঠিন মনে করেছিলাম ঠিক ততটা কঠিন হলো না উপরে চড়া। যদিও কোন কোন মুহূর্তে ভয়ে আমার মাথার চুল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তবু প্রথম অর্ধেক বেশ সহজেই উঠলাম আমরা। কিন্তু পরের অর্ধেক পাহাড় আরও খাড়া হতে হতে একেবারে সোজা ওপরে উঠেছে। আমরা কোন মতে হাত পায়ের আঙ্গুল পাথরের খাঁজে ঢুকিয়ে লটকে রইলাম। আমার আর সামারলীর পক্ষে উপর পর্যন্ত পৌছানো একেবারেই অসম্ভব হত কিন্তু চ্যালেঞ্জার উপরে পৌছে একটা গাছের গুঁড়ির সাথে শক্ত করে দড়ি বেঁধে নীচে ফেললেন। আমাদের পক্ষে দড়ি বেয়ে ওঠা অনেকটা সহজ হয়ে গেল। উপরে উঠে দেখলাম পঁচিশ ফুট লম্বা, পঁচিশ ফুট চওড়া এক সমতল চূড়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

দম নিয়ে ফিরে তাকাতেই দেখলাম আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য। ব্রাজিলের বিশাল বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি বিছিয়ে রয়েছে আমার চোখের সামনে। প্রথমে লম্বা ফার্ণ গাছ আর পাথরে পূর্ণ মাঝামাঝি জায়গায় ঘোড়ার পিঠের মত পাহাড়ের ঢিবি, ওপাশে বেতের সবুজ হলুদ রঙ, তারপর থেকে গাছপালা ঘন হয়েছে। যতদূর চোখ যায়

কেবল সবুজ আর সবুজ। আকাশের সাথে গিয়ে মিশেছে অনেক অনেক দূরে।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের একটা বলিষ্ঠ হাত যখন আমার কাঁধে পড়ল আমি তখনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুধা পান করছি। 'এই পথে, খোকা,' বললেন তিনি, 'পিছু দেখতে নেই, সব সময়ে সামনের গৌরবময় ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের দিকে চাইতে হবে আমাদের।'

ঘুরেই লক্ষ করলাম মালভূমির উচ্চতা ঠিক এই পাহাড়টারই সমান। সবুজ ঝোপঝাড় আর লম্বা উঁচু গাছগুলো এত কাছে যে মাত্র এই সামান্য দূরত্বটুকুই পার হওয়া যে কত অসম্ভব তা চট করে উপলব্ধি করা যায় না। ফাঁকটা আন্দাজ চল্লিশ ফুট হবে। তবে চল্লিশ ফুট না হয়ে চল্লিশ মাইল হলেও কথা একই হত; পার হবার কোন উপায় নেই। এক হাতে একটা গাছের গোড়া ধরে ঝুঁকে নীচের দিকে চাইলাম; দেখলাম অনেক নীচে ছোট ছোট আকৃতির ইণ্ডিয়ানরা সব উপরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

'আশ্চর্য!' সামারলীর স্বর শোনা গেল।

ঘুরে দেখলাম খুব মনোযোগ দিয়ে সেই বড় গাছটা পরীক্ষা করছেন তিনি।

মসৃণ বাকল, পাঁজরের মত শিরাওয়ালা ছোট ছোট পাতা, আমার খুবই পরিচিত। 'আরে, এটা তো একটা বীচ গাছ,' চেঁচিয়ে বললাম আমি।

'ঠিক তাই,' বললেন সামারলী, 'বিদেশ বিভূঁই-এ দেশী গাছ!'

'মহামান্য জনাব, শুধু দেশীই নয়,' নাটকীয় ভঙ্গিতে আরম্ভ করলেন চ্যালেঞ্জার, 'অকৃত্রিম বন্ধুও বটে। এটাই আমাদের পথের নির্দেশ দেবে।'

'পুল! একটা পুল!' উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন জন।

'ঠিক বন্ধুগণ–একটা পুল। গতরাতে আমাদের এই সমস্যা নিয়ে পুরো একঘণ্টা চিন্তা করেছি আমি। আমার চেষ্টা বিফলে যায়নি।' বলে দাড়িতে একটু হাত বুলিয়ে নিলেন চ্যালেঞ্জার। 'এই তরুণ সঙ্গীকে আমি আগেই বলেছি যে নিরুপায় অবস্থায় পড়লেই জি. ই. সি-র মাথা খোলে ভাল।'

সত্যিই এক চমৎকার উপায় বের করেছেন চ্যালেঞ্জার। গাছটা প্রায় ষাট ফুট উঁচু। পড়ার সময়ে কেবল ঠিক দিকে পড়লেই হয়। চ্যালেঞ্জার পাহাড়ে ওঠার সময়ে কুঠারটা কাঁধে ঝুঁলিয়ে নিয়েছিলেন, এবার সেটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, 'এই ছেলের পেশী আর শক্তি দুইই আছে। এই কাজের জন্যে ম্যালোনই সবচেয়ে উপযুক্ত। তবে একটা অনুরোধ, নিজের ভাবনা চিন্তা মতামত বাদ দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে আমার নির্দেশ মত কাজ করতে হবে তোমাকে।'

তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী গাছটা এমন ভাবে কাটলাম যেন ঠিক জায়গা মত পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই ওদিকে একটু ঝুঁকে ছিল গাছটা, জন আর আমি পালা করে কেটে একঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করে, মট মট শব্দে গাছটা ফেললাম। ওটা সশব্দে পড়ল গিয়ে মালভূমির ঝোপগুলোর উপর। ঝাঁকির চোটে কাটা গুঁড়ির দিকটা খাদের একেবারে কিনারায় চলে এল। মুহূর্তের জন্যে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে

উঠেছিলাম, কিন্তু কিনারার কয়েক ইঞ্চির মধ্যে এসে স্থির হয়ে থেমে গেল গাছটা। অজানাকে জানার জন্যে আমাদের সেতু তৈরি হলো।

কারও মুখে রা নেই, একে একে সবাই প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সাথে নীরবে হাত মেলালাম আমরা। প্রফেসর তাঁর খড়ের হ্যাটটা একটু পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে কুর্নিশের কায়দায় ঝুঁকে প্রত্যেককে সম্মান দেখালেন।

'আমিই প্রথম পার হয়ে অজানা রাজ্যে পা রাখব,' বললেন চ্যালেঞ্জার। 'এটা আমার ন্যায্য দাবি।'

তিনি পুলের দিকে এগিয়ে যেতেই জন তাঁর কোটের উপর হাত রেখে বাধা দিলেন, বললেন, 'আমি দুঃখিত, প্রফেসর, আমি এতে অনুমতি দিতে পারছি না।'

'অনুমতি?' মাথাটা পিছন দিকে আর দাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে এল তাঁর উদ্ধত ভঙ্গিতে।

'বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমি সবসময়ে আপনার নেতৃত্ব নির্দ্বিধায় মেনে এসেছি, কারণ আপনি বিজ্ঞান জগতের মানুষ। কিন্তু আমার জগতে আমার কথা আপনাদের মেনে চলতে হবে।'

'তোমার জগৎ?'

'আমাদের সবারই নিজস্ব পেশা আছে–আমি যোদ্ধা এবং শিকারী আমার মতে আমরা একটা নতুন অজানা জায়গায় অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছি। নানা শত্রু আর বিপদ আমাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকতে পারে ওখানে। বলে থেমে মাথা নেড়ে আবার বললেন, 'না, না, একটু সাধারণ বুদ্ধি আর ধৈর্যের অভাবে এমন অন্ধের মত হুড়মুড় করে ঢুকে বিপদে পড়া আমাদের কোনমতেই ঠিক হবে না।'

'খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা,' একটু নরম হলেন চ্যালেঞ্জার; কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে তুমি কি করতে বলো আমাদের?'

জন বললেন, 'জানি না। হয়তো বা ওই ঝোপের আড়ালেই লুকিয়ে আছে একদল মানুষখেকো লোক, ভূরিভোজনের অপেক্ষায়। বোকার মত ঝুঁকি না নিয়ে ম্যালোন আর আমি গিয়ে নীচে থেকে গোমেস আর ম্যানুয়েল সহ প্রথমে চারটে রাইফেল নিয়ে আসি।' পুলের ওপারে তাকিয়ে আবার বললেন, 'একজন প্রথমে পার হবে, এপার থেকে সবাই তাকে রাইফেলের কভার দেবে। সে গিয়ে সবার পার হওয়া নিরাপদ, এমন ইশারা করলে তখন বাকি সবাই পার হব।'

চ্যালেঞ্জার গাছের কাটা গুঁড়িটার উপর বসে পড়ে অধৈর্য হয়ে ছটফট করতে লাগলেন। প্রফেসর সামারলী আর আমি দু'জনেই একমত হলাম যে এসব ক্ষেত্রে জনকেই আমাদের নেতা মানতে হবে।

এবারে আর চড়তে কষ্ট হলো না। সবচেয়ে কঠিন জায়গাটার উপরই দড়ি ঝুলছিল। শঙ্কর ইণ্ডিয়ানদের দিয়ে কিছু খাবারও উপরে ওঠালেন জন। আমাদের হয়তো বা লম্বা সময় ধরে অনুসন্ধান চালাতে হবে। যথেষ্ট কার্তুজও আনলাম আমরা।

'প্রফেসর,' সব দিক থেকে তৈরি হয়ে জন বললেন, 'আপনি যদি সত্যিই প্রথমে পার হতে চান, তা হলে এবার এগোন।'

'তোমার সদয় অনুমতির জন্যে আমি কৃতার্থ।' রোষের সাথে জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার। অপরের নেতৃত্ব সহ্য করা তাঁর ধাতে সয় না। 'ঠিক আছে, সবার অগ্রদূত হিসাবে আমি এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।'

দু'পাশে পা ঝুলিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে পার হয়ে গেলেন চ্যালেঞ্জার। পিঠে একটা হাত-কুড়াল ঝুলছে তাঁর। ওপারে গিয়ে দ্রুত চারদিক দেখে নিয়ে হাত নেড়ে সবাইকে পার হতে বললেন তিনি।

উদ্বিগ্নভাবে চেয়ে রয়েছি আমি প্রফেসরের দিকে। প্রতি মুহূর্তেই ভয় হচ্ছে আমার এই বুঝি পিছনের সবুজ ঝোপ থেকে ভয়ঙ্কর কিছু বেরিয়ে এসে আক্রমণ করল তাঁকে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। চারদিক চুপচাপ, ঘটনার মধ্যে কেবল তাঁর পায়ের কাছ থেকে হঠাৎ একটা বিচিত্র রঙের পাখি উড়ে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হলো।

এরপর পার হলেন সামারলী। তাঁর ছোট্ট কাঠামোয় এত তেজ সত্যিই আশ্চর্যজনক। জিদ করেই পিঠে দুই দুইটা রাইফেল বহন করলেন তিনি, ওপারের দুই প্রফেসরই সশস্ত্র হচ্ছেন সামারলী পৌঁছার সাথে সাথে, এটাই তাঁর যুক্তি।

এরপর এল আমার পালা। নীচের দিকে চাওয়া থেকে নিজেকে আমি অনেক কষ্টে বিরত রাখলাম। ওপারে আমাকে সাহায্য করার জন্যে সামারলী রাইফেলের নল বাড়িয়ে দিলেন, অল্পক্ষণ পরেই তাঁর হাতের নাগাল পেলাম আমি।

সর্বশেষ পালা লর্ড জনের। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সোজা হেঁটে পার হলেন তিনি। তাঁর স্নায়ু সব ক'টাই স্টীলের তৈরি কিনা জানি না। সবার চোখই ছানাবড়া হয়ে গেল।

চারজনই এখন দাঁড়ালাম এক অদ্ভুত স্বপ্নের রাজ্যে–মেপল হোয়াইটের 'হারানো পৃথিবীতে'। সবার কাছেই মনে হচ্ছে যেন আমরা একটা মস্তবড় বিজয় সমাধা করেছি।

ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পঞ্চাশ গজ অগ্রসর হতেই পিছন দিকে মড়মড় শব্দ শুনে সবাই একসাথে ছুটে এলাম মালভূমির ধারে; পুলটা অদৃশ্য হয়ে গেছে!

বহু নীচে পাহাড়ের গোড়ায় দেখা গেল ভেঙে পেঁচিয়ে যাওয়া ডালপালা আর ফেটে চৌচির হওয়া গুঁড়িটা। তবে কি পাহাড়ের ধার ভেঙে নীচে পড়ে গেছে গাছটা? সবাই প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। এমন সময় একটা কালো মুখ দেখা দিল ওপারের পাহাড়ে–গোমেস। কিন্তু তার মুখে তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব ফুটে উঠেছে। চোখ দুটো চকচক করছে, উত্তেজনা আর ঘৃণায় জ্বলছে। মুখে একটা উন্মত্ত জিঘাংসার ছাপ।

'লর্ড রক্সটন!' চিৎকার করে ডাকল গোমেস, 'লর্ড জন রক্সটন!'

'কি?' জবাব দিলেন জন, 'এখানে এই যে আমি।'

চড়া স্বরে হাসির শব্দ এল ওপাশ থেকে।

'হ্যাঁ, ওই যে ইংরেজ কুত্তা! ওখানেই থাকবি তুই। অনেক কাল অপেক্ষা করেছি আমি, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি। শেষ পর্যন্ত আজ সুযোগ এসেছে। উঠতেই অনেক কষ্ট হয়েছে তোদের, নামা আরও কঠিন হবে। অভিশপ্ত বোকার দল, তোরা সব কয়জন ফাঁদে পড়েছিস।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম আমরা। বিরাট একটা বড় ভাঙা ডাল পড়ে আছে ওপাশে ঘাসের ওপর। ওই ডালটা বাধিয়েই আমাদের পুলটা ঠেলে নীচে ফেলে দিয়েছে সে। গোমেসের মুখ অদৃশ্য হলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার দেখা গেল, এবার মুখটা আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর ক্রোধে উন্মত্ত।

'ওই গুহার কাছে পাথর ছুঁড়ে তোদের প্রায় শেষ করেছিলাম।' চিৎকার করে জানাল সে, 'কিন্তু এটা আরও ভাল হয়েছে, ধীর স্থির আর অনেক বেশি ভয়াবহ। ওখানে পড়ে থাকতে থাকতে তোদের হাড্ডিগুলো সব সাদা হবে। মরণ শয্যায় শুয়ে ভাবিস লোপেজের কথা, যাকে পাঁচ বছর আগে পুটুমায়ো নদীর ধারে গুলি করে মেরেছিলি। আমি তার ভাই। প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে, এবার আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব। মুঠো করা হাত আমাদের দিকে কয়েকবার সজোরে ঝাঁকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

নীরবে প্রতিশোধ নিয়ে কেটে পড়লেই হয়তো ওর জন্যে ভাল হত। নাটকীয়তা করার নির্বোধ দক্ষিণ আমেরিকান প্রবণতাই কাল হলো। লর্ড জন তিনটি দেশে বন্ধুর বন্ধু শত্রুর যম এই নামটি বৃথা কামাননি। দড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছিল গোমেস, জন দৌড়ে মালভূমির ধার দিয়ে ছুটে গেলেন। যেখান থেকে লোকটাকে দেখা যায় এমন একটা জায়গা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। তাঁর হাতের রাইফেলটা একবার গর্জে উঠল। প্রথমে প্রচণ্ড চিৎকার আর তারপর ধপ করে একটা কিছু পড়ার শব্দ পেলাম আমরা।

মুখ মলিন করে ফিরে এলেন জন। 'আমার দোষেই আপনাদের সবার আজ এই দুরবস্থা হলো। আমার আগে থেকেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এরা বংশ পরম্পরায় রক্তের প্রতিশোধ নেয়, কথাটা জেনেও আমি সাবধান হইনি। চরম বোকামি হয়েছে আমার।'

'অন্য লোকটার কি হলো? দু'জন ছাড়া অতবড় গাছটাকে নীচে ফেলা অসম্ভব,' বললাম আমি।

'ওকেও গুলি করতে পারতাম, কিন্তু ছেড়ে দিলাম। হয়তো এতে ওর কোন হাত ছিল না, কে জানে?'

গোমেসের উদ্দেশ্য জানার পর এখন দুয়ে দুয়ে চারের মত মিলে যাচ্ছে সব। আমাদের পরিকল্পনা জানার জন্যে ওর অদম্য কৌতূহল, ওর ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টি, সবই এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, আমরা তখনও আকস্মিক ঘটে যাওয়া ঘটনাটা নিয়ে আলাপ করে নতুন পরিস্থিতির সাথে নিজেদের মনকে খাপ

খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে নীচের একটা দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সাদা কাপড় পরা একজন লোক–ম্যানুয়েল ছাড়া আর কেউ নয়–প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। মৃত্যুভয় না থাকলে এমন করে কেউ ছোটে না। তার মাত্র কয়েক গজ পিছনেই ছুটছে বিরাট কাঠামোর জাম্বো। আমাদের বিশ্বস্ত নিগ্রো।

আমাদের চোখের সামনেই পলাতকের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাম্বো। মাটিতে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি খেলো ওরা–একটু পরেই জাম্বো উঠে দাঁড়াল, অসাড় দেহটার দিকে চাইল সে একবার, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে খুশিতে হাত নেড়ে ছুটে এগিয়ে এল।

বিশ্বাসঘাতক দু'জন শেষ হলো বটে কিন্তু তাদের কৃতকর্মের ফলটা রয়ে গেল। কোনমতেই আর আমাদের ওই চূড়ায় ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। আমরা ছিলাম পৃথিবীর মুক্ত মানুষ আর এখন হয়েছি মালভূমির বাসিন্দা–বন্দী। সভ্য জগৎ থেকে এখন আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

লক্ষ করলাম আমার তিনজন সঙ্গীই নিজেদের খুব সংযত রেখেছেন। তাঁদের মুখ গম্ভীর, চিন্তিত কিন্তু শান্ত। চুপচাপ জাম্বোর জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই আমাদের। একটু পরেই তার কালো মুখটা দেখা গেল ওপাশের পাথরের ওপর এবং পরক্ষণেই তার বিশাল দেহটা চূড়ার ওপর উঠে এল।

ধারের কাছে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল সে, 'আমি কি করব এখন? আপনারা যা বলবেন তাই করব আমি।'

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা সোজা হলেও এর উত্তর সত্যিই কঠিন। খুব সত্যি কথা যে জাম্বোই এখন আমাদের সাথে বাইরের জগতের যোগাযোগ রাখার একমাত্র সূত্র। সে চলে গেলে কোন অবস্থাতেই আমাদের আর চলবে না।

'না না! আপনাদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না,' বলল জাম্বো, 'তবে আমার পক্ষে আর বাকি সবাইকে ঠেকিয়ে রাখা বোধ হয় সম্ভব হবে না। এখনই নানান কথা বলা আরম্ভ করেছে, কুরুপুরি থাকে এখানে তাই ওরা সবাই বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

'কাল পর্যন্ত কোনমতে ওদের ঠেকিয়ে রাখো, জাম্বো,' আমি চিৎকার করে বললাম। 'ওদের হাতে একটা চিঠি পাঠাতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে, সাহ্, আমি কথা দিলাম আগামীকাল পর্যন্ত ওরা থাকবে।'

অনেক কাজই করতে হলো জাম্বোকে। নিষ্ঠা আর আনুগত্যের সাথে সব কাজই চমৎকার ভাবে সম্পন্ন করল সে। আমাদের নির্দেশ মত প্রথমে গাছের গুঁড়ি থেকে দড়িটা খুলে নিয়ে এক মাথা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিল। কাপড় শুকানোর দড়ির চেয়ে সামান্য মোটা হবে দড়িটা, কিন্তু খুব শক্ত। এটা দিয়ে কোন পুল তৈরি করা সম্ভব হবে না বটে, তবে আমাদের যদি মালভূমিতে কোন পাহাড়ে চড়ার দরকার হয় তখন ওটা খুবই কাজে আসবে। দড়ির একদিক ছুঁড়ে দিয়ে

অন্যদিকে সে নীচে থেকে আনা খাবারের প্যাকেটটা বাঁধল। আমরা সেটা টেনে এপারে নিয়ে এলাম। সপ্তাহ খানেকের জন্যে আমাদের খাবারের চিন্তা দূর হলো। একই ভাবে নানান জিনিসের সাথে কিছু গোলাবারুদও এপারে পাঠাল জাম্বো। সব কাজ সেরে সন্ধ্যার দিকে নীচে নেমে গেল সে। যাবার আগে বলে গেল ইণ্ডিয়ানদের সে সকাল পর্যন্ত আটকে রাখবে। খাড়া চূড়ার ধারেই আমরা ক্যাম্প করলাম। একটা প্যাকেটের মধ্যে দুই বোতল অ্যাপোল্লিনারিস পাওয়া গেল। তাই দিয়ে তৃষ্ণা মেটালাম আমরা। আমাদের জন্যে পানি খুঁজে পাওয়া একান্তই জরুরী। একদিনের মত যথেষ্ট অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেছে আজ লর্ড জনের। আজই ভিতরে ঢোকার ইচ্ছা আর কারও মনেই জাগল না। আগুন জ্বালানো, এমনকী নিষ্প্রয়োজনে শব্দ করা থেকেও বিরত রইলাম আমরা। রাতের বেশির ভাগ সময়ই আমার কাটল মোমবাতির আলোতে রিপোর্ট লিখে।

আগামীকাল–মানে আজই, কারণ ভোর প্রায় হয়ে এসেছে–আমরা বেরুব অজানার সন্ধানে।

নয়

অত্যাশ্চর্য সব ঘটনা অনবরত ঘটে চলেছে আমাদের সামনে। মোট কাগজ যা আছে আমার কাছে তা হচ্ছে পাঁচটা খাতা আর কিছু ফাসকা কাগজ। আর আছে মাত্র একটা সীস কলম। যতক্ষণ হাত চলে আমি লিখে যাব, সেই লেখা কোনদিন সভ্য সমাজে পৌঁছবে কিনা জানি না, তবে লিখতে আমাকে হবেই। এমন সব অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে যা কোন মানুষ কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি।

মালভূমিতে আটকা পড়ার পরদিন থেকেই নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হতে লেগেছে আমাদের। আমার প্রথম অভিজ্ঞতা থেকেই এই জায়গা সম্বন্ধে খুব একটা অনুকূল মনোভাব আমি পোষণ করতে পারিনি।

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই আমার পায়ের উপর কি যেন একটা জিনিস নজরে পড়ল। আমার ট্রাউজার্স ঘুমের ঘোরে একটু উপরে উঠে এসেছিল, পায়ের উপর দেখলাম একটা বেগুনী রঙের আঙ্গুর। পা থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করতেই ফেটে গেল সেটা। চারপাশে রক্ত ছিটিয়ে পড়ল পিচকারির মত। ঘৃণায় আমার মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল; সাথে সাথেই প্রফেসর দু'জন এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে।

সামারলী বললেন, 'চমৎকার!' আমার পায়ের উপর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করলেন তিনি। 'রক্তপায়ী জীব সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত এর কোন শ্রেণী বিভাগ হয়নি।'

'আমাদের এত কষ্টের প্রথম ফল,' গমগমে গলায় বললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। 'আমরা এটার নামকরণ করতে পারি "ইক্সোডেস ম্যালোনী"। জীবতত্ত্বের ইতিহাসে তোমার নাম চিরদিন বেঁচে থাকবে। অমরত্বের আনন্দের কাছে একটা কামড় নিতান্তই তুচ্ছ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তুমি এই সুন্দর নমুনাটাকে চ্যাপ্টা করে ফেলেছ।'

'জঘন্য কীট!' বীতশ্রদ্ধ হয়ে বললাম আমি।

ভুরু উঁচিয়ে আমার কথার প্রতিবাদ জানালেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে তাঁর একটা বিরাট থাবা তিনি আমার কাঁধের উপর রাখলেন। 'তোমাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গি আর আলাদা বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে, হে তরুণ। আমার মত দার্শনিক মেজাজের মানুষের কাছে ওটা একটা প্রকৃতির বিস্ময়। ওর বর্শার ফলার মত শুঁড়, আর রবারের বেলুনের মত পেট, ময়ূরপুচ্ছ বা অরোরা বোরিয়ালিসের রঙিনচ্ছটার মতই সুন্দর। ঠিক মত অনুসন্ধান চালাতে পারলে আমরা ওটার একটা আস্ত নমুনা সংগ্রহ করতে পারব আশা করি।'

'তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই,' বিষণ্ন মুখে বললেন সামারলী। 'এইমাত্র আপনার শার্টের কলারের পিছনে একটাকে অদৃশ্য হতে দেখলাম।'

ষাঁড়ের মত ডাক ছেড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। পাগলের মত শার্ট কোট খুলতে গিয়ে একেবারে ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করলেন। সামারলী আর আমি তাঁকে সাহায্যই করব না হাসব ভেবে পেলাম না। হাসি থামলে শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁর জামা খুলে সেই বিশাল আকৃতিটি উন্মুক্ত করলাম। দরজির ফিতায় অন্তত চুয়ান্ন ইঞ্চি বুক। সারা দেহ ঘন কালো লোমে ঢাকা। সেই জঙ্গলের অভ্যন্তর থেকে প্রফেসরকে কামড়ানোর আগেই আমরা জীবটাকে খুঁজে বের করলাম। আশপাশের ঝোপঝাড়ে নানান ধরনের অসংখ্য পোকামাকড়ে বোঝাই। অতএব স্থির করলাম, এখান থেকে আমাদের ক্যাম্প সরিয়ে নিতেই হবে।

কিন্তু তার আগে আমাদের বিশ্বস্ত নিগ্রো জাম্বোর সাথে ব্যবস্থা করে নিতে হয়। সকাল বেলাই কতগুলো কোকো আর বিস্কিটের টিন নিয়ে হাজির হলো সে। এক এক করে টিনগুলো ছুঁড়ে এপারে ফেলল। নীচে যা খাবার ছিল তা থেকে তার নিজের জন্যে দু'মাসের খাবার রেখে বাকিটা ইণ্ডিয়ানদেরকে সহযোগিতার পুরস্কার হিসাবে আর আমাজনে চিঠি পৌঁছে দেয়ার পারিশ্রমিক স্বরূপ দিয়ে দিতে বলা হলো। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখলাম দূরে সারি বেঁধে চলেছে ওরা ফিরতি পথে। প্রত্যেকের মাথায় একটা করে পুটুলী। নীচের ছোট তাঁবুটা ব্যবহার করছে জাম্বো। সে-ই এখন আমাদের সঙ্গে নীচের পৃথিবীর একমাত্র যোগসূত্র।

ঝোপের পোকা মাকড়ের দৌরাত্ম্য থেকে ক্যাম্প দূরে সরিয়ে নিলাম আমরা। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার–চারিদিকে বিশাল বিশাল গাছ দিয়ে ঘেরা। কতগুলো চ্যাপটা পাথরের টুকরা রয়েছে ঠিক মাঝখানে। কাছেই একটা কুয়াও পাওয়া

গেল। সেখানে পরিচ্ছন্ন জায়গায় আরাম করে বসে আমরা এই অজানা দেশে অনুসন্ধান চালানোর প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে ফেললাম।

গাছের উপর থেকে পাখির ডাক ভেসে আসছে। বিশেষ করে যে পাখিটা উচ্চস্বরে ডাকছে সেটা আমাদের কাছে নতুন। কিন্তু এ ছাড়া অন্য আর কোন প্রাণীর সাড়া পেলাম না আমরা।

প্রথমেই আমাদের জিনিসপত্রের একটা তালিকা তৈরি করে ফেললাম। কিসের ওপর নির্ভর করে চলতে হবে, তার একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেল। আমরা সাথে যা বয়ে এনেছি আর জাম্বো দড়ির মাথায় বেঁধে যা পাঠিয়েছে তাতে আমাদের বেশ কয়েক সপ্তাহ চলবে। সবচেয়ে বড় কথা যে কোন বিপদই আসুক না কেন তা মোকাবেলা করার জন্যে আমাদের আছে চারটে রাইফেল আর এক হাজার তিনশো গুলি। বন্দুকও একটা আছে তবে কার্তুজ মাত্র একশো পঞ্চাশটা–তাও খুব শক্তিশালী নয়, মাঝারি ছররা। অন্যান্য সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট তামাক, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, একটা বড় টেলিস্কোপ, আর একটা ভাল বিনকিউলার, ক্যামেরা ইত্যাদি।

আমাদের সব মালামাল মাঝখানে রেখে প্রাথমিক নিরাপত্তা হিসাবে হাত কুড়াল আর বড় ছুরি দিয়ে বেশ কিছু কাঁটাগাছ কেটে আমাদের চারপাশে গোল করে ঘিরে দিলাম। আপাতত এটাই হলো আমাদের প্রধান ক্যাম্প। চ্যালেঞ্জারের সম্মানে এটার নাম দিলাম আমরা 'ফোর্ট চ্যালেঞ্জার'।

সব রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমেত 'দুর্গ' তৈরি করতে আমাদের দুপুর গড়িয়ে গেল। বীচ, ওক, বার্চ, এসব গাছ আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। একটা বিশাল জিংকো গাছ অন্যান্য সব গাছ ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে গেছে। ওটারই ডালপাতা আমাদের ক্যাম্পে ছায়া দিচ্ছে। আমাদের এই বেঁচে থাকার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিলেন লর্ড জন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার শেষে তিনি কিছু বলার জন্যে তৈরি হলেন।

'এতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ বা জন্তু আমাদের অস্তিত্ব টের পায়নি, আমরা এখনও নিরাপদ,' ব্যাখ্যা দিলেন জন, 'কিন্তু যেইমাত্র ওরা টের পাবে, ঠিক তখন থেকেই আরম্ভ হবে বিপদ। এই অজানা জায়গায় আমরা চুপি চুপি খোঁজখবর নেব, সামনাসামনি সাক্ষাৎ হবার আগেই এখানকার প্রতিবেশীদের স্বভাব সম্পর্কে ভাল ভাবেই জেনে নিতে হবে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাদের তো ভিতরে ঢুকতেই হবে?'

'অবশ্যই,' জবাব দিলেন জন, 'আমরা আগে বাড়ব, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে। আমরা হিসাব করে প্রত্যেক বারে এতটুকুই প্রবেশ করব যেন দিনের শেষে নিরাপদে আবার ঘাঁটিতে ফিরে আসতে পারি। আর একটা কথা, জীবন-মরণ সমস্যা না হলে গুলি ছোঁড়া চলবে না।'

'গতকাল তুমি গুলি করেছিলে,' স্মরণ করিয়ে দিলেন সামারলী।

'না করে উপায় ছিল না। তবে উল্টো দিকে জোর হাওয়া বইছিল–শব্দ মালভূমির মধ্যে সম্ভবত খুব বেশিদূর যায়নি। হ্যাঁ, ভাল কথা–এই মালভূমিটার একটা নাম তো দিতে হয়। কি নাম দেব আমরা এটার?'

কয়েকটি নামের প্রস্তাব করা হলো, কিন্তু চ্যালেঞ্জার কোনটিই মানতে রাজি নন।

'এই জায়গার একটাই নাম হতে পারে,' বললেন প্রফেসর, 'প্রথম আবিষ্কারকের নাম অনুসারে সেটা হচ্ছে "মেপল হোয়াইট ল্যাণ্ড"।'

ওই নামই গ্রহণ করা হলো। আমার উপর বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এখানকার ম্যাপ আঁকার, তাই আমার মানচিত্রেও সেই নামই আছে। একদিন হয়তো বিশ্বের মানচিত্রেও ওই নামেই পরিচিত হবে এই জায়গা।

মেপল হোয়াইট ল্যাণ্ডের ভিতরে নির্বিঘ্নে ঢোকাই এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। নিজের চোখেই আমরা দেখেছি এখানে অচেনা অজানা প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে। তা ছাড়া মেপলের স্কেচ বই দেখে আঁচ করা যায় যে ভয়ানক শক্তিশালী হিংস্র দানবের অস্তিত্ব থাকাও অসম্ভব নয়। মানুষের বাসও থাকা সম্ভব। মানুষ থাকলে, তারা যে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করবে না তা বোঝা গেছে বেতের ঝাড়ে জেমস কোলভারের কঙ্কাল দেখে। তাঁকে নিশ্চয়ই উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল, নাহলে ওখানে তিনি যাবেন কীভাবে?

একটা বিপদসঙ্কুল জায়গায় আটকা পড়েছি আমরা, বেরোবার কোনো পথ নেই। চারদিকে বিপদ–লর্ড জনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি আমাদের যতগুলো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বললেন সবগুলোই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এতদূর এসে–বিরাট একটা আবিষ্কারের এত কাছে এসে সংযত থাকা সত্যিই কষ্টসাধ্য। অধৈর্য মন রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে ছটফট করছে।

আমাদের ঘাঁটিতে ঢোকার পথ ভাল করে কাঁটাগাছ দিয়ে বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম। খুব সাবধানে, খুব ধীরে এগিয়ে চললাম অজানার উদ্দেশে। আমাদের ঝর্নাটা থেকে যে ছোট স্রোতটা বইছে সেটা ধরেই এগিয়ে চললাম। ফেরার সময়ে ওটাই পথ নির্দেশ করবে।

কয়েকশো গজ ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। অনেক গাছই আমার অচেনা, কিন্তু সামারলী গাছ গাছড়ার বিশেষজ্ঞ, তিনি ঠিকই চিনলেন। ওগুলো হচ্ছে কনিফেরা আর সাইকাডেশিয়াস গাছ, আমাদের নীচের পৃথিবী থেকে ওগুলো অনেক আগেই হারিয়ে গেছে।

আমরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখানে ছোট্ট স্রোতটা চওড়া হয়ে একটা জলাতে পরিণত হয়েছে। এক ধরনের লম্বা নলখাগড়া ঘন হয়ে জন্মেছে এখানে, জানলাম ওগুলো ইকুইসেটোসিয়া বা ঘোটকীর লেজ। ফার্ণ গাছও রয়েছে মাঝে মাঝে। দমকা হাওয়ায় দুলছে গাছগুলো।

হঠাৎ লর্ড জন হাত তুলে সবাইকে থামতে বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাটিতে একটা ছাপ দেখিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'দেখেছেন! বাবারও বাবা আছে; কিন্তু এই ছাপ দেখে মনে হয় এ হচ্ছে আদি বাবা!'

বিরাট বিরাট তিন আঙুলের একটা ছাপ পড়েছে নরম কাদায়। যে প্রাণীই হোক না কেন জলা পার হয়ে গিয়ে বনে ঢুকেছে। ভাল ভাবে পায়ের ছাপটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে আমরা সবাই দাঁড়ালাম। যদি ওটা পাখির ছাপ হয়–পাখি ছাড়া এরকম ছাপ আর কার হবে?–ছাপটা এতই বড় যে সেই পাখির আকৃতি অত্যন্ত বিশাল হবে। জন এদিক ওদিক চেয়ে চট করে দুটো হাতিমারা কার্তুজ ভরে নিলেন তাঁর রাইফেলে।

তিনি বললেন, 'শিকারী হিসাবে আমার সুনাম বাজি রেখে আমি বলতে পারি যে ছাপটা নতুন। এখনও পানি চুঁইয়ে পড়ছে ওই গভীর ছাপটার মধ্যে। অর্থাৎ দশ মিনিটও হয়নি ওটা এখান দিয়ে পার হয়েছে। আরে! এখানে দেখছি একটা বাচ্চার পায়ের ছাপও রয়েছে!'

ছোট দাগগুলো বড় ছাপের সমান্তরাল ভাবে গেছে।

'কিন্তু এটাকে আপনারা কি বলবেন?' প্রফেসর সামারলী মানুষের হাতের মত বিশাল একটা ছাপের দিকে নির্দেশ করে বিজয়ীর মত হাসলেন।

'উইলডেন!' উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। 'উইলডেন ক্লে ফসিলে আমি দেখেছি ওই ছাপ। ওরা তিন আঙুলের পিছনের পায়ে চলে–মাঝে মধ্যে পাঁচ আঙুলের একটা সামনের পা মাটিতে ছোঁয়ায়। পাখি নয়, রক্সটন, ওটা মোটেও কোন পাখি নয়।'

'তবে কি, জন্তু?' প্রশ্ন করলেন জন।

'না,' গর্বের সাথে বললেন চ্যালেঞ্জার, 'ওটা একটা সরীসৃপ, ডাইনোসর। আর কিছুই এমন ছাপ ফেলতে পারে না। সাসেক্সের এক ডাক্তারকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল এই ছাপ, প্রায় নব্বই বৎসর আগে। কিন্তু কে আশা করেছিল যে এমন দৃশ্য আমরা দেখতে পাব?'

শেষের দিকে চ্যালেঞ্জারের কথা ফিসফিসানি হয়ে মিলিয়ে গেল, আর আমরা সবাই বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলাম। পায়ের ছাপ ধরে এগুচ্ছিলাম। জলা পার হয়ে কয়েকটা ঝোপঝাড় আর গাছের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে আমরা দেখলাম সামনে একটা ফাঁকা জায়গায় পাঁচটা অসাধারণ জীব চরছে। ঝোপের পিছনে উপুড় হয়ে বসে আড়াল থেকে আমরা অবাক চোখে দেখতে লাগলাম।

পাঁচটার মধ্যে দুটো পূর্ণ বয়স্ক আর তিনটে বাচ্চা। কিন্তু বাচ্চা হলে কি হবে এক একটা হাতির মত বড়। আর বড় দুটো আমি জীবনে যত জীবজন্তু দেখেছি তাদের চেয়ে অনেক গুণে বড়।

চামড়া পেটের মত কালো। গায়ে গিরগিটির মত আঁশ। সূর্যের আলোয় রামধনুর মত চমকাচ্ছে সেই আঁশ। পাঁচটাই লেজ আর পিছনের দু'পায়ের উপর

ভর দিয়ে খাড়া হয়ে বসেছে। পাঁচ আঙুলের সামনের পা দিয়ে গাছের বড় বড় ডাল ভেঙে পাতা খাচ্ছে। দেখতে অনেকটা কালো কুমিরের চামড়াওয়ালা বিশাল বিশ ফুট উঁচু ক্যাঙ্গারুর মত।

আমরা কতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছি বলতে পারব না। বেশ জোর হাওয়া বইছিল আমাদের দিকে, সামনের ঘন ঝোপগুলো ভাল ভাবেই আমাদের আড়াল রেখেছে; তাই আমাদের অবস্থান ফাঁস হবার সম্ভাবনা নেই। বাপ মায়ের আশেপাশে খেলে বেড়াচ্ছে বাচ্চা তিনটা, দেহের বিশালতায় ওদের নড়াচড়ার ভঙ্গি যেন কিছুটা আড়ষ্ট, মাঝে মাঝে লাফিয়ে শূন্যে উঠে আবার ধপ করে মাটি কাঁপিয়ে নীচে পড়ছে।

বড় দুটোর শক্তির সীমা নেই। মোটা একটা গাছের ডালের নাগাল না পেয়ে ওদের একটা সামনের দুই পা দিয়ে গাছটা জাপটে ধরে চারাগাছের মত মট করে ভেঙে ফেলল। প্রমাণ পেলাম যে শক্তিতে ওরা যতটা বড় বুদ্ধিতে ঠিক ততটা খাট; গাছটা হুড়মুড় করে ওরই মাথার ওপর ভেঙে পড়ল।

তারস্বরে কিছুক্ষণ চিৎকার করে জন্তুটা জানিয়ে দিল যে আকৃতিতে যত বড়ই হোক না কেন ওদেরও একটা সহ্যের সীমা আছে। ঘটনায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা সুবিধাজনক নয় মনে করে একে একে ওরা জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল; প্রথমে আহত ডাইনোসর, তারপর তার সঙ্গীটি এবং সবশেষে বাচ্চা তিনটে।

সঙ্গীদের দিকে তাকালাম। লর্ড জন একদৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর আঙুল রাইফেলের ট্রিগারের উপর প্রস্তুত। শিকারী সত্তা পুরোপুরি ফুটে উঠেছে তাঁর চোখে মুখে।

অমন একটা মাথা বৈঠকখানার বৈঠা দুটোর উপরে ঝুলানোর জন্যে কী না দিতে পারতেন জন। কিন্তু ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত রেখেছেন তিনি।

প্রফেসর দু'জন নীরব যেন আত্মসমাহিত। উত্তেজনায় দু'জন দু'জনের হাত আঁকড়ে ধরে আছেন। যেন দু'টি ছোট্ট শিশু কোন যাদুমন্ত্রের খেলা দেখতে বিভোর। চ্যালেঞ্জারের গাল দুটো ফুলে উঠেছে স্বর্গীয় হাসিতে আর সামারলীর কঠিন সমালোচক মুখটা যেন সেই মুহূর্তে কোমল হয়ে এসেছে শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ে।

'নাঙ্ক ডিমিট্রিস।' কাঁপা উত্তেজিত গলায় বললেন সামারলী। 'লণ্ডনের ওরা কি বলবে?'

'প্রিয় সামারলী,' চ্যালেঞ্জার বললেন, 'আমি জানি কি মন্তব্য করত লণ্ডনবাসীরা। তাঁরা বলত যে আপনি ডাহা মিথ্যুক আর একজন হাতুড়ে বৈজ্ঞানিক। ঠিক যা আপনি আর অন্যান্য সবাই আমাকে বলেছিলেন।'

'ছবিগুলো দেখার পরেও?'

'জাল, সামারলী, জাল, সবই জাল করা!'

'নমুনা দেখেও ওকথা বলবে?'

'হ্যাঁ, ওই একটা জায়গায় হয়তো আপনি ওদের কাবু করতে পারবেন। ম্যালোন আর তার ফ্লিটস্ট্রীটের নীচ সহকর্মীরা হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাদের জয়গান গাইবে। আগস্টের আটাশ তারিখে আমরা পাঁচটা জীবন্ত ইগুয়েনোডন দেখেছি, লিখে রাখো তোমার ডায়েরীতে। সুযোগ পেলে তোমার অফিসে পাঠিও খবরটা।'

'হ্যাঁ,' ফোড়ন কাটলেন জন, 'সেই সাথে সম্পাদকীয় বুটের লাথি খাওয়ার জন্যেও তৈরি থেকো। লণ্ডন থেকে সব কিছুই একটু ভিন্ন রকম দেখায়। অনেকে তো তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতেই সাহস পায় না। লোকে বিশ্বাস করবে না। অবশ্য সেজন্যে তাদের দোষ দেয়া যায় না। মাস দু'য়েক পরে এই এটা আমাদের কাছেই স্বপ্নের মত মনে হবে। ওগুলোর নাম না কি বললেন?'

'ইগুয়েনোডন্,' জবাব দিলেন সামারলী। 'কেন্ট আর সাসেক্স-এর হেস্টিংস্যাণ্ডস্-এ বহু পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে ওদের। দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে এক সময় গিজগিজ করত ওরা, প্রচুর সবুজ খাবারও ছিল তখন সেখানে। পরে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলে যায়, ওরাও মারা পড়ে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি, জানোয়ারগুলো বেঁচে আছে।'

লর্ড জন বললেন, 'এখান থেকে যদি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারি তা হলে এর একটা মাথা নিয়েই ফিরব। উহ্! সোমালী ল্যাণ্ড, ইউগাণ্ডার লোকেরা এদের চেহারা দেখলে সবুজ হয়ে যাবে ভয়ে। আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি তা। কে কি ভাবছেন জানি না, আমার মনে হয় এখানে আমরা ভীষণ বিপদের মধ্যে রয়েছি।'

আমাদের চারপাশে রহস্যময় পরিবেশ আর বিপদ সম্বন্ধে জনের সাথে আমি একমত। গাছের ছায়ায় কেমন যেন একটা ছমছমে ভাব। ওদিকে তাকালে মনে আপনাআপনি কেমন একটা অজানা ভয় জন্মায়। যে দানব জন্তুগুলোকে আমরা চরতে দেখলাম তারা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না বলেই ধরে নেয়া যায়, ওরা তৃণভোজী। কিন্তু এই বিচিত্র জায়গায় হাজার রকমের ভয়ঙ্কর আর হিংস্র প্রাণী থাকতে পারে। কোন ঝোপ বা পাথরের আড়াল থেকে যে কোন মুহূর্তে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমাদের উপর। প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু সম্বন্ধে আমার খুব বেশি জানা নেই, তবে এটুকু মনে আছে, একটা বইয়ে পড়েছিলাম যে ওদের মধ্যে কোন কোন জন্তু বিড়ালের ইঁদুর ধরে খাওয়ার মত বাঘ সিংহ ধরে খায়। তেমন প্রাণীর অস্তিত্ব এখানেও থাকা অসম্ভব নয়!

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চললাম আমরা। আমাদের ধীর গতির কারণ কিছুটা জন, আর বাকিটা দুই প্রফেসর। জন নিজে এগিয়ে ভাল করে চারদিক না দেখে আমাদের সামনে বাড়তে দিচ্ছেন না। আর প্রফেসর দু'জনের একজন না একজন প্রতি পদেই একটা করে বিস্ময়কর ফুল বা পোকা দেখে

একেবারে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। জলস্রোতের ডান ধার ধরে আমরা প্রায় দু'তিন মাইল এগুলাম। তারপর হঠাৎ পৌঁছলাম একটা বেশ বড় ফাঁকা জায়গায়। ঝোপের একটা সারি একটানা গিয়ে কতগুলো পাথরের ধারে শেষ হয়েছে। পুরো এলাকাটাই বড় বড় পাথরে ভর্তি। আমরা ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম পাথরগুলোর দিকে। ঝোপ প্রায় আমাদের কোমর সমান উঁচু।

একটা অদ্ভুত শিস আর গড়গড় শব্দ পেলাম আমরা। হাত তুলে আমাদের থামতে বলে লর্ড জন ঝুঁকে নিচু হয়ে দ্রুত ছুটে গেলেন পাথরের সারির কাছে। পাথরের উপর দিয়ে উঁকি দিলেন তিনি। কিছু একটা দেখে শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেছে তাঁর। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রয়েছেন সেই দিকে, আমাদের কথা যেন ভুলেই গেছেন। শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় আমাদের এগুতে বলে হাতটা উঁচিয়েই রাখলেন, অর্থাৎ খুবই সাবধানে আগে বাড়তে বলছেন আমাদের। জনের ইঙ্গিত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পাথরের ওপাশে আশ্চর্য অথচ বিপজ্জনক কিছু একটা রয়েছে।

গুড়ি মেরে তাঁর পাশে পৌঁছে পাথরের উপর দিয়ে উঁকি দিলাম আমরা। সামনেই একটা গভীর গর্ত, সম্ভবত আগে এটা আগ্নেয়গিরির ছোট মুখ ছিল। বাটির মত গর্তটার কয়েকশো ফুট নীচে একেবারে তলায় সবুজ পানি জমে রয়েছে। পানির চারপাশে নলখাগড়ার ঝালর, যেন এক ভৌতিক জায়গা।

টেরাড্যাকটিলের একটা ঘিঞ্জি বস্তি! শয়ে শয়ে একত্র হয়েছে ওরা এখানে। পানির ধারে বাচ্চাগুলো কিলবিল করছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ওদের মায়েরা হলুদ চামড়ার মত ডিমে বসে তা দিচ্ছে। আমরা যে শব্দ শুনেছিলাম সেটা এগুলোরই শব্দ। কাছে আসায় এখন শব্দের সাথে যোগ হয়েছে বোটকা বিচ্ছিরি একটা ছাতা পড়া গন্ধ। আরও উপরের দিকে পুরুষগুলো নিজের নিজের পাথরের উপর বসে আরাম করছে। দেখতে মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত নয়, মরা, শুকানো নমুনার মত। একেবারে স্থির হয়ে বসে রয়েছে ওগুলো। লাল চোখগুলো কেবল এদিক ওদিক ঘুরছে আর কচিৎ কখনও পাশ দিয়ে ফড়িং উড়ে যেতে দেখলেই ইঁদুর ধরা ফাঁদের মত ঠোঁট দিয়ে খটাস করে আওয়াজ তুলছে।

পাতলা চামড়ার মত বিশাল পাখা ভাঁজ করে বসেছে ওরা। এক একটাকে মাকড়সার জাল রঙের শাল জড়ানো বিশাল আকারের বুড়ীর মত দেখাচ্ছে। ছোট বড় মিলিয়ে সংখ্যায় কমপক্ষে হাজার খানেকের উপরে হবে।

দুই প্রফেসর তো আনন্দের সাথেই ওখানে সারাটা দিন কাটিয়ে দিতে রাজি। এত কাছে থেকে প্রাগৈতিহাসিক জীবন পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়ে তাঁরা সব ভুলে গেছেন। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে মরা মাছ আর পাখিগুলো দেখিয়ে প্রফেসর দু'জন জানালেন, এসবই ওদের খাদ্য। তাঁরা দু'জনে দু'জনকে অভিনন্দন জানালেন, কারণ এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেল যে কোন কোন জায়গায় এইসব উড়ন্ত ড্রাগনের এত হাড় কেন দেখা গেছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে

পেঙ্গুইনের মত এরাও দলবদ্ধ হয়ে বাস করে।

চ্যালেঞ্জারের একটা মন্তব্যে সামারলী প্রতিবাদ করায় নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার জন্যে তিনি মাথা অনেকখানি সামনে বাড়িয়ে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে কাছে বসা পুরুষ টেরাড্যাকটিলটা উচ্চ কর্কশ শিস দিয়ে বিশ ফুট পাখা ঝাপটে আকাশে উঠে গেল। মাদীগুলো বাচ্চাদের সাথে পানির ধারে জড় হলো। আর প্রত্যেকটা প্রহরী আকাশে উঠল একের পর এক।

সে এক অপরূপ দৃশ্য। প্রায় একশো বিদঘুটে জীবন্ত প্রাণী দোয়েলের মত দ্রুত ডানা নেড়ে শোঁ শোঁ করে নেমে আসছে আমাদের মাথার উপর। অল্পক্ষণের মধ্যেই টের পেলাম এই দৃশ্য দেখে নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। নৃশংস প্রাণীগুলো আমাদের মাথার চারপাশে বিরাট চক্কর দিয়ে ঘুরছে; যেন প্রতিপক্ষকে জরিপ করে নিচ্ছে। তারপর ক্রমে নীচে নেমে এল ওরা, চক্করের বৃত্তটাও অনেক ছোট হয়ে এল। শোঁ শোঁ করে ঘুরতে থাকল আমাদের চারপাশে। এতগুলো শুকনো সশব্দ কালো পাখার ঝাপটা হেন্‌ডন্‌ বিমান ঘাঁটির বিমান প্রতিযোগিতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

জন চিৎকার করে বললেন, 'সবাই একসাথে জঙ্গলের দিকে ছুটুন। মহাবিপদ ঘটতে যাচ্ছে।' রাইফেলটাকে গদার মত ধরে ছুটলেন জন্‌, সাথে আমরাও।

আমাদের পালাতে দেখেই আক্রমণ করল ওরা। কাছের জীবগুলোর পাখার ঝাপটা প্রায় মুখে লাগছে আমাদের। রাইফেলের কুঁদোর বাড়ি দিয়ে ঠেকাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওদের শরীর চামড়ার মত, শক্ত বা বাড়ি মারার মত কোন জায়গা খুঁজে পেলাম না। হঠাৎ সাঁ সাঁ শব্দে লম্বা কালো গলা নিচু হয়ে এসে ঠোকর দেয়ার চেষ্টা করল, তারপর একের পর এক নেমে আসতে লাগল ওরা।

সামারলী চিৎকার করে হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন, তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত ঝরছে। গলার পিছনে একটা গুঁতো খেলাম আমি, প্রচণ্ড ধাক্কার চোটে মাথা ঘুরে উঠল আমার। চ্যালেঞ্জার পড়ে গেলেন, তাঁকে তুলতে গিয়ে আর এক ঠোকর খেয়ে আমি তাঁর উপরই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

লর্ড জনের রাইফেল গর্জে উঠল। একটা ডানা ভাঙা টেরাড্যাকটিল মাটির উপর দাপাচ্ছে আর আমাদের দিকে থুথু ছিটিয়ে গলা দিয়ে গড়গড় শব্দ করছে। বিরাট হাঁ করা ঠোঁট, রক্তবর্ণ গোল চোখ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে আঁকা পিশাচের ছবির মতই দেখাচ্ছে। ওর সঙ্গীরা গুলির শব্দ শুনে অনেক উপরে উঠে গেল, চক্কর দিতে লাগল আমাদের মাথার উপর।

জন চিৎকার করে বললেন, 'জলদি দৌড়ান!'

ঝোপের ভিতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে আবার ছুটলাম আমরা। বড় গাছগুলোর কাছাকাছি পৌঁছতেই আবার আর এক দফা আক্রমণ এল। সামারলী পড়ে গেলেন, আমরা তাঁকে কোনমতে তুলে নিয়ে ছুটে গাছের গুঁড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লাম। এখানে আমরা নিরাপদ, অতবড় পাখা নিয়ে কোনমতেই ওরা

ডালপালার ভিতরে ঢুকতে পারবে না।

খুঁড়িয়ে ঘাঁটির দিকে ফিরে চললাম। সবাই টানা হেঁচড়ায় আহত আর পরাজিত। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখলাম বহু উপরে আকাশে ওরা উড়ছে। ওদের রক্ত চক্ষু নিশ্চয়ই তখন আমাদের উপরই নজর রাখছে। আমরা আরও ঘন জঙ্গলে ঢুকলে পরে ওরা রণেভঙ্গ দিল।

ঝর্নার ধারে থেমে চ্যালেঞ্জার তাঁর খোলা হাঁটুতে পানি দিতে দিতে বললেন, 'খুবই বিস্ময়কর আর চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। ক্রুদ্ধ টেরোড্যাকটিল কি রকম ব্যবহার করে সে সম্বন্ধে আমরা অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করলাম।'

সামারলী তাঁর কপালের কাটা জায়গাটা পানিতে ধুয়ে নিলেন। আমি আমার গলার পিছনের ক্ষতটার পরিচর্যায় ব্যস্ত। জনের কোট কাঁধের কাছে ছিঁড়ে গেছে কিন্তু তাঁর গায়ে দাঁতের সামান্য আঁচড় মাত্র লেগেছে।

'লক্ষ করার মত বিষয়,' আগের কথার সূত্র ধরেই বলে চললেন প্রফেসর, 'আমাদের এই ম্যালোন ছেলেটা খোঁচা খেয়েছে, আর জনের কোট দাঁতের কামড়েই ছিঁড়েছে। আর আমি ডানার বাড়ি খেয়েছি মাথায়; অর্থাৎ আমরা তাদের বিভিন্ন আক্রমণ পদ্ধতির একটা সুন্দর প্রদর্শনী দেখলাম।'

'এটা ছিল আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা,' গম্ভীর ভাবে বললেন জন। 'এমন একটা জীবের হাতে মৃত্যু বরণ করার চেয়ে জঘন্য কোন মৃত্যু আমি ভাবতেও পারি না। রাইফেল ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছি বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু না করে কোন উপায় ছিল না।'

আমি কৃতজ্ঞভাবে বললাম, 'আপনি গুলিটা না ছুঁড়লে আর আমাদের আজ রেহাই ছিল না।'

'হয়তো খুব একটা ক্ষতি হবে না এতে। এই জঙ্গলে এমন অনেক শব্দই হয়। গাছের ডাল বা গাছ ভাঙার শব্দও প্রায় গুলির শব্দের মতই জোরাল–আর আমরা দেখেছি তা এই বনে বেশ ঘন ঘনই ঘটে।' চারদিক আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে জন আবার বললেন, 'একদিনের জন্যে আমাদের যথেষ্ট উত্তেজনা গেছে–আমার মতে এবার ক্যাম্পে ফিরে আমাদের ওষুধের সাহায্য নেয়াই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত হবে। কে বলতে পারে ওদের দাঁতে কোন বিষ আছে কিনা?'

পৃথিবীর কোন মানুষই এমন একটা উত্তেজনাময় দিন কাটিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। ক্যাম্পে ফিরে আমাদের প্রবেশ পথ যেমন রেখে গেছিলাম ঠিক তেমনি পেলাম। কিন্তু ভিতরে ঢুকে বোঝা গেল গেট বা দেয়াল ভেঙে কেউ ভিতরে ঢোকেনি বটে, কিন্তু আমাদের অবর্তমানে শক্তিশালী কোন জীব ঢুকেছিল ক্যাম্পে। পায়ের ছাপ বা অন্য কোন চিহ্ন থেকে বোঝা গেল না সেটা কি ধরনের প্রাণী হতে পারে। শুধু একটা জিংকো গাছের ভাঙা ডাল থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সে কোন্ পথে প্রবেশ করেছিল। আর তার অসীম শক্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে আমাদের খাবারের সাপ্লাই। ওগুলো সব ছড়ানো ছিটানো রয়েছে মাটির উপর–একটা টিনের

ভিতরের মাল মশলা বের করার জন্যে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে সেটা। এক বাক্স কার্তুজ টুকরো টুকরো অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। এমনকী একটা পিতলের গুলিও ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে পাশেই। আবার সেই অজানা ভয় আর শঙ্কা আমাদের ঘিরে ধরল। আলো ছায়ার মাঝে আমরা চেয়ে রইলাম ভাঙাচোরা জিনিসগুলোর দিকে।

জাম্বোর গলার স্বর আমাদের মনে নতুন সাহস আর উদ্দীপনার জোগান দিল। মালভূমির ধারে গিয়ে দেখলাম সে বসে আছে উল্টো দিকের চূড়ায়, আমাদের দেখে সব কয়টা দাঁত বের করে শিশুর হাসি হাসল সে।

'সব ভাল তো?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল জাম্বো ভাঙা ইংরেজীতে। 'কোন ভয় নেই আপনাদের সাহ্, আমি আপনাদের ছেড়ে যাব না। যখন দরকার আমাকে এখানেই পাবেন।'

ওর নিষ্পাপ কালো মুখ আর সামনের বিস্তৃত দৃশ্য দেখে আমরা কল্পনায় আমাজনের শাখানদী ধরে অর্ধেক পথ পিছনে ফিরে গেলাম। নতুন করে আবার উপলব্ধি করলাম যে আমরা সত্যিই বিংশ শতাব্দীর মানুষ–কোন যাদুমন্ত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যাইনি। বেগুনি রঙের ঝাপসা জায়গাটায় যেখানে বন গিয়ে দিগন্তের সাথে মিশেছে তার কাছেই বয়ে চলেছে বিশাল আমাজন। ওখানে স্টীমার চলে, সভ্য মানুষ বাস করে, তারা নিজেদের মধ্যে সুখ-দুঃখের কথা বলে। কিম্ভূতকিমাকার সব জন্তু জানোয়ারের সাথে মেপল হোয়াইট ল্যাণ্ডে আটকা পড়ে সভ্যতার কথা ভাবাও আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। এখন ওদিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাহুতাশ করা ছাড়া আর আমাদের কিছু করার নেই।

আহত হয়ে দুই প্রফেসরের মেজাজ এখন আরও চড়া। দু'জনে তর্কে লেগে গেছেন আমাদের আক্রমণকারীরা টেরাড্যাকটিলাস না ডাইমোরফোডন পরিবারের, তাই নিয়ে। দুর্বোধ্য সব কঠিন শব্দ আর নামের ভিড়ে টিকতে না পেরে একটু দূরে একটা পাথরে বসে সিগারেট ধরালাম আমি। একটু পরে জনও এসে যোগ দিলেন আমার সঙ্গে।

'আচ্ছা, ম্যালোন, টেরাড্যাকটিল আস্তানাটার কথা তোমার মনে আছে?'

'খুব পরিষ্কার মনে আছে–কেন?'

'ওটা একটা আগ্নেয়গিরির ছোট মুখ, তাই না?'

'ঠিক তাই।'

'মাটিটা লক্ষ করেছিলে?'

'মাটি কোথায়–পাথর বলুন।'

'না, ওখানে নয়, পানির ধারে–নলখাগড়াগুলোর পাশে।'

'হ্যাঁ, নীলচে মাটি–অনেকটা কাদার মত।'

'নীলচে মাটিওয়ালা আগ্নেয়গিরির ছোট মুখ,' নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন জন।

'তাতে কি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'নাহ্, কিছু না,' বলে ধীর পায়ে আবার ফিরে গেলেন তিনি প্রফেসরদের দিকে। সামারলী উচ্চৈস্বরে আর চ্যালেঞ্জার খাদে গমগমে গলায় তখনও তর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন।

সেই রাতে আবার শুনলাম নিজের মনেই স্বগতোক্তি করছেন জন। 'নীল কাদা–আগ্নেয়-শিলার মাঝে নীল মাটি।'

ক্লান্তিতে ঘুমের কোলে ঢুলে পড়ার আগে ওই কথা ক'টাই শেষ কানে গেল আমার।

দশ

জন ঠিকই বলেছিলেন যে ওদের দাঁতে কোনরকম বিষ থাকতে পারে। পর দিন সকালে সামারলী আর আমি দু'জনেই অসহ্য ব্যথা আর জ্বরে পড়ে রইলাম। চ্যালেঞ্জারের হাঁটুর অবস্থাও ভাল নয়–কোনমতে খুঁড়িয়ে সামান্য চলতে পারেন মাত্র। সারাদিন ক্যাম্পেই থাকলাম আমরা। জন দিনভর কাঁটা ঝোপের বেড়া আরও চওড়া আর উঁচু করার কাজে কাটালেন। সেদিন সারাটা দিন আমার কেবলই মনে হলো যে আমাদের প্রত্যেকের উপর কেউ আড়াল থেকে কড়া নজর রাখছে। কিন্তু কে বা কেমন করে নজর রাখছে তা কিছুতেই অনুমান করতে পারলাম না।

এই অনুভূতিটা আমার মনে এতই গভীর দাগ কাটল যে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে না জানিয়ে পারলাম না। তিনি এটাকে আমার জ্বরের ঘোরে মানসিক উত্তেজনা বলে উড়িয়ে দিলেন। বার বার আমি ঝট করে এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে তাকালাম। প্রতিবারই মনে হলো যেন কিছু একটা দেখতে পাব। কিন্তু না, আমাদের ঘন কালো কাঁটা ঝোপের বুনানি আর বড় গাছগুলোর ঘন পাতার ভিতরে অস্বাভাবিক কিছুই নজরে পড়ল না। কিন্তু তবু আমার মন থেকে চিন্তাটা গেল না, বরং আরও জোরাল হলো যেন হিংস্র একটা কিছু অলক্ষ্যে আমাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ইণ্ডিয়ান কুসংস্কারের কথাটা মনে পড়ল আমার–কুরুপুরি–বনের পিশাচ! যারা তার এলাকায় অনধিকারপ্রবেশ করে, তারা হয়তো এই ভাবেই মানসিক অশান্তি ভোগ করে।

মেপল হোয়াইট ল্যাণ্ডে আমাদের তৃতীয় রাত। নিভে আসা আগুনের চারপাশে সবাই আমরা ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ বিকট হুঙ্কার আর চিৎকারে আমরা একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। এমন ভয়ঙ্কর শব্দ এর আগে আর কোনদিন শুনিনি। আমাদের ক্যাম্পের কয়েকশো গজের ভিতর থেকেই আসছে শব্দটা। ট্রেনের

হুইসেলের মতই কান ফাটা জোরাল আওয়াজ। তবে অনেক গভীর আর কাঁপানো, অসহ্য ব্যথা আর ভয়ের আর্তনাদ। দু'হাতে কান বন্ধ করলাম, রীতিমত ঘামতে লেগেছি আমরা। ভয়ে কলজে শুকিয়ে আসছে সবার। সারা জীবনের সব ব্যথা, দুঃখ, প্রতিবাদ যেন ওই চিৎকারের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। ওই চিৎকারের মাঝেই আবার শোনা গেল একটা ভারী গমকের হাসি, গলার ভিতর থেকে আসা একটা আনন্দের গর্‌র্‌র্‌ শব্দ। তিন চার মিনিট চলল এই দ্বৈত ভীতিপ্রদ হুঙ্কার। গাছের পাতায় ভয়ার্ত পাখি উড়ে ঝটপট শব্দ তুলছে। তারপরে যেমন হঠাৎ করে আরম্ভ হয়েছিল, ঠিক তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল সব। অনেকক্ষণ সবাই নীরব উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে রইলাম। কিছু ডালপালা আগুনে ফেলে আগুনটাকে একটু উস্কে দিলেন জন। লকলকিয়ে জ্বলে উঠল আগুন, সেই লাল শিখায় সবার সন্ত্রস্ত মুখ ফুটে উঠল।

'আসলে ছিল কি ওটা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সকালেই জানা যাবে,' জবাব দিলেন জন, 'ঘটনাটা কাছেই কোথাও ঘটেছে।'

গম্ভীর থমথমে গলায় প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বললেন, 'জুরাসিক যুগে যে সব বিয়োগান্ত নাটক হত, লেগুনের ধারে নলখাগড়ার ভিতর, তারই একটা নিজের কানে শোনার সৌভাগ্য আজ আমাদের হলো।' তাঁর এত আবেগ ভরা গলা এর আগে কোনদিন শুনিনি। তিনি বলে উঠলেন, 'সেখানে বেশি শক্তিশালী ড্রাগন কমজোরীগুলোকে কাদায় ঠেসে ধরে মারত। মানুষ যে অনেক পরে এসেছে এটা তার জন্যে মঙ্গলজনকই হয়েছে। এই প্রচণ্ড শক্তির সামনে মানুষ তার লাঠি আর তীর ধনুক নিয়ে কি করতে পারত? এমনকী আজকের দিনের আধুনিক রাইফেল নিয়েও যে মানুষ ওদের সাথে পারবে তেমন আশা কম।'

'আমি আমার ছোট্ট বন্ধুর ওপরই আস্থা রাখি,' এক্সপ্রেস রাইফেলটাকে আদর করে হাত বুলিয়ে বললেন জন। 'কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পশুর জয়ী হবার সম্ভাবনাও নেহাত কম নয়।'

সামারলী হাত উঁচিয়ে বললেন, 'চুপ! কিসের যেন আওয়াজ পেলাম।'

অখণ্ড নীরবতার মাঝে ধুপ! ধুপ! একটা ভারী একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে কোন বড় জন্তুর পায়ের শব্দ। থপ থপ করে পা ফেলে পুরো ক্যাম্প ঘুরল জন্তুটা। তারপর ঠিক আমাদের গেটের কাছে এসে থামল। ওটার শ্বাস প্রশ্বাসের নিচু শব্দ কানে আসছে। মাত্র একটা দুর্বল বেড়ার ব্যবধান এখন রাতের বিভীষিকা আর আমাদের মাঝে। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ রাইফেল জাপটে ধরলাম। জন বেড়া থেকে একটা ছোট্ট ঝোপ সরিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করলেন।

ফিসফিস করে বললেন জন, 'ওই যে! দেখতে পাচ্ছি আমি।'

জনের পাশে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। আমিও দেখতে পেলাম, গাছের ছায়ার

পটভূমিতে খুব গাঢ় কালো একটা আকৃতি দেখা যাচ্ছে। উপুড় হয়ে বসে আছে জন্তুটা–বলিষ্ঠ, হিংস্র। আকারে একটা ঘোড়ার চেয়ে বড় হবে না, কিন্তু আবছা আকৃতিটা দেখেই বোঝা যায় যে অসীম শক্তি ওর। জন্তুটা একটু নড়ে উঠল আর মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হলো যেন ওর সবুজ দুটো চোখ অন্ধকারে জ্বলে উঠল। পরক্ষণে খসখস শব্দ এল কানে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে ওটা!

আমার রাইফেলটা কক্ করে নিয়ে বললাম, 'জন্তুটা এবার লাফ দেবে।'

'গুলি কোরো না, গুলি কোরো না,' নিচু গলায় বললেন জন। 'নিস্তব্ধ রাতে গুলির আওয়াজ বহুদূর যাবে। কেবল একান্ত নিরুপায় হলে তবেই শেষ তুরুপ হিসাবে ওটা ব্যবহার করবে।'

'ওটা বেড়া পার হলেই আমরা শেষ।' বলে একটা অপ্রস্তুত ভাবে কাষ্ঠ হাসি হাসলেন সামারলী।

'না, ওকে ভিতরে আসতে দেয়া যাবে না,' জন বললেন, 'কিন্তু আপনারা গুলি করার আগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। হয়তো আমি এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা করতে পারব। দেখি,' বলেই আগুনের কুণ্ড থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে প্রবেশ পথের দিকে এগুলেন তিনি। জন্তুটা একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে আরও সামনে বাড়ল। মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে গেট খুলে ছুটে এগিয়ে গেলেন জন। হাতের জ্বলন্ত কাঠটা দিয়ে সজোরে ওর মুখে একটা খোঁচা মারলেন তিনি।

জ্বলন্ত কাঠের আগুনে জন্তুটার মুখ দেখলাম মুহূর্তের জন্যে। ব্যাঙের মাথার মত দেখতে একটা বিরাট মাথা, আবে ভর্তি কুষ্ঠ রোগীর মত চামড়ার রঙ। মুখে তাজা রক্ত খাওয়ার চিহ্ন। পরক্ষণেই দুড়দাড় করে ঝোপঝাড় ভেঙে ভয়াল রাতের বিভীষিকা অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।

জন ফিরে এসে কাঠটা আবার আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন। প্রফেসর দু'জন সমস্বরে বলে উঠলেন, 'তোমার এমন ঝুঁকি নেয়া কোনমতেই উচিত হয়নি।'

হেসে সহজ ভাবেই বললেন জন, 'আমার ধারণা ছিল আগুনকে ভয় পাবে জন্তুটা। অবশ্য আমাদের করারও আর কিছু ছিল না, লাফিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লে ওটাকে মারতে গিয়ে আমরা নিজেদের গায়েই গুলি করতাম।' কথা শেষ করে একটা চুরুট বের করলেন জন। আশ্চর্য! এমন উত্তেজনাময় একটা কাজ করে আসার পরও আগুন ধরাতে বিন্দুমাত্র কাঁপল না তাঁর হাত।

জনের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে গেল আমার মন। মানুষের সাহসেরও একটা সীমা থাকে, চোখের সামনে এমন দুঃসাহসিক কাজ এর আগে কোনদিন কোন মানুষকে আমি করতে দেখিনি। আচ্ছন্ন, অভিভূত অবস্থায় আমার মুখ থেকে এতক্ষণ আর শব্দ বের হয়নি, এবার নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কি?'

প্রফেসর দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন। শেষে সামারলী বললেন, 'ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিশ্চিত হয়ে ওটাকে কোনো গোষ্ঠীতে ফেলতে পারছি না।' বলে আমাদের সাথে যাতে চোখাচোখি না হয় সেজন্যে

পাইপে তামাক ভরতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি।

চ্যালেঞ্জার মন্তব্য করলেন, 'কিছু বলতে অস্বীকার করে আপনি বিজ্ঞানকে যথার্থ সম্মান দেখিয়েছেন। আমিও ভাসাভাসা ভাবে বলব যে ওটা এক ধরনের মাংসাশী ডাইনোসর। এর বেশি কিছু বলতে আমি রাজি নই।'

'আমাদের মনে রাখতে হবে,' বললেন সামারলী, 'যে এমন অনেক প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী রয়েছে যাদের সঙ্গে আমরা মোটেও পরিচিত নই। এখানে আমরা যত কিছু দেখব তাদের প্রত্যেকটারই নাম আমাদের জানা থাকবে এমন ধরে নেয়া হঠকারিতা হবে।'

'ঠিক বলেছেন,' প্রসন্ন ভাবে বললেন চ্যালেঞ্জার, 'একটা আনুমানিক শ্রেণী বিভাগ করার চেয়ে বেশি কিছু করার চেষ্টা বেঠিক হবে। আগামীকাল আরও কিছু তথ্য হয়তো পাব যা আমাদের সনাক্ত করার কাজে আসবে। ততক্ষণ চলুন আমরা বিঘ্নিত ঘুম পুরো করে নিই!'

জন বলে উঠলেন, 'কিন্তু পাহারা ছাড়া আর নয়। এরকম জায়গায় আমরা আর ঝুঁকি নিতে পারি না, এরপর থেকে পালা করে এক-একজনকে দু'ঘণ্টা পাহারায় থাকতে হবে।'

'ঠিক আছে, বললেন সামারলী, পাইপটা শেষ করেই আমি প্রথম পাহারা আরম্ভ করব।'

ডিউটি ভাগাভাগি হয়ে গেল। এর পর থেকে মেপল হোয়াইট ল্যাণ্ডে আমরা আর পাহারা ছাড়া কোনো রাত কাটাইনি।

সকাল হলে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা খুঁজে পেলাম গত রাতের হত্যাযজ্ঞের জায়গাটা–ইগুয়েলোডন মাঠেই ঘটেছে ঘটনা। বিভিন্ন জায়গায় জমাট বাঁধা রক্ত আর সেই সাথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা বিরাট মাংসের টুকরোগুলো দেখে প্রথমে আমরা ধারণা করেছিলাম যে কয়েকটা প্রাণী মারা পড়েছে। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতেই দেখা গেল অনেক নয়, একটা জন্তুই বধ হয়েছে। বোঝা গেল যে ঘাতক আকৃতিতে ছোট হলেও নিহত জন্তুর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী।

আমাদের দুই প্রফেসর বসে গেলেন টুকরো টুকরো বিশ্লেষণে। প্রত্যেকটা টুকরোতেই ধারাল নির্দয় দাঁত আর দুর্দান্ত শক্তিশালী থাবার স্বাক্ষর রয়েছে।

সাদাটে রঙের এক চাক বিরাট মাংসের টুকরো নিজের দুই হাঁটুর উপর বিছিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন, 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এখনও যেতে পারি না আমরা। বাঁকা তলোয়ারের মতন দাঁতওয়ালা বাঘের পক্ষেও এই ধরনের জখমের চিহ্ন রাখা সম্ভব, ওদের এখনও গভীর গুহায় মাঝে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু রাতে যে জন্তুটা দেখেছি সেটা আকৃতিতে অনেক বড়, তা ছাড়া সেটা ছিল সরীসৃপ শ্রেণীর। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে ওটা খুব সম্ভব ছিল অ্যালোসরাস।'

'কিংবা মেগালোসরাস,' জোগান দিলেন সামারলী।

'ঠিক তাই–বড় মাংসাশী কোন ডায়নোসরেরই কাজ এটা। এই শ্রেণীতেই রয়েছে অনেক ভয়াবহ হিংস্র প্রাণী, এরা একসময়ে পৃথিবীর অভিশাপ ছিল–এখন যাদুঘরের শোভা।' নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। তাঁর রসবোধ বড় কম, তাই নিজের স্থূল রসিকতায় নিজেই হেসে লুটিয়ে পড়েন।

'শব্দ কম করাই ভাল,' সংক্ষিপ্ত ভাবে বললেন জন। 'আমরা জানি না কি রয়েছে আমাদের আশে পাশে। ওই ব্যাটা যদি সকালের নাস্তার জন্যে এখন ফিরে এসে আমাদের দেখতে পায়, তা হলে ব্যাপারটা মোটেই হাসির হবে না।' জন চারদিকে একবার তাঁর শিকারী চোখ বুলিয়ে নিলেন। 'ভাল কথা–ইগুয়েনোডনটার চামড়ায় এই দাগটা কিসের?'

পেট রঙের আঁশযুক্ত চামড়ার উপর পীচের গোল একটা ছাপ। আমরা কেউ কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। সামারলী জানালেন যে দু'দিন আগে তিনি এই রকম দাগ দেখেছেন একটা বাচ্চা ইগুয়েনোডনের গায়ে। চ্যালেঞ্জার কোন মন্তব্য করলেন না, কিন্তু তাঁর মধ্যে একটা প্রত্যয়ের ভাব প্রকাশ পেল যেন ইচ্ছা করলেই ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি আমাদের ধন্য করতে পারেন। জন সরাসরি তাঁর মতামত জানতে চাইলেন।

'উপরওয়ালা যদি আমাকে মুখ খোলার অনুমতি দেন আমি সানন্দে মতামত ব্যক্ত করব,' খোঁচা দিয়ে বললেন চ্যালেঞ্জার। 'আপনাদের উপরওয়ালার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আমি অন্যের নির্দেশ মেনে চলতে অভ্যস্ত নই। জানতাম না যে নির্মল একটা রসিকতায় হাসতে হলেও আবার অনুমতির প্রয়োজন হয়।

জনকে শেষ পর্যন্ত মাফ চাইতে হলো তাঁর ক্ষুব্ধ অভিমানী ছেলেমানুষীর কাছে। তাঁর ক্ষতে প্রলেপ পড়ার পর একটা ভাঙা ডালের উপর বসে আরম্ভ করলেন চ্যালেঞ্জার–যেন হাজার ছাত্রের একটা ক্লাশে শিক্ষকতা করছেন তিনি, এমনি একটা ভাব;

'ওই দাগ সম্বন্ধে আমি আমার সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে একমত। ওটা পীচেরই ছাপ। এই মালভূমি আগ্নেয়শিলায় তৈরি, আর অ্যাসফল্ট বা পীচ এমন একটা জিনিস যা আগ্নেয় শক্তির সাথে সংযুক্ত থাকে। এখানে কোনখানে সম্ভবত পীচ তরল অবস্থাতেই রয়েছে, আর এই জন্তুগুলো তার সংস্পর্শে এসেই ওই দাগ সংগ্রহ করেছে। কিন্তু এরচেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে এখানে মাংসাশী প্রাগৈতিহাসিক দানবের অস্তিত্ব। আমরা জানি মালভূমিটা একটা মাঝারি ইংলিশ কাউন্টির চেয়ে বড় হবে না। এখানে একটা সীমাবদ্ধ এলাকায় নীচের পৃথিবীতে লোপ পাওয়া নানা জীবজন্তু পরস্পর এক সাথে বাস করছে অগুণতি বছর ধরে। এটা খুবই পরিষ্কার যে এমন পরিস্থিতিতে মাংসাশী প্রাণীগুলো অবাধে বংশবৃদ্ধি করে এতদিনে তাদের খাবার ফুরিয়ে ফেলার কথা। হয় তাদের মাংস খাওয়ার অভ্যাস ছাড়তে হবে আর নয়তো ক্ষুধায় মরতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তা হয়নি এখানে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রয়েছে। যে কারণেই হোক এই ভয়ানক জন্তুর

বংশবৃদ্ধি সীমিত আছে। সেই পদ্ধতিটা কি এবং কীভাবে তা কাজ করছে এটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আশা করি ভবিষ্যতে আরও খুঁটিয়ে এদের নিরীক্ষণ করার সৌভাগ্য আর সুযোগ আমাদের হবে।'

'তেমন সুযোগ না এলেই খুশি হই,' আমি মন্তব্য করলাম।

স্কুলের মাস্টারসাহেব যেভাবে দুষ্টু ছেলের অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য এড়িয়ে যান, প্রফেসর ঠিক সেই ভাবে একটু ভুরু উঁচালেন আমার মন্তব্যে।

'প্রফেসর সামারলীর হয়তো এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে,' বললেন চ্যালেঞ্জার। অতঃপর দুই পণ্ডিত দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক আলোচনায় লিপ্ত হলেন।

সেদিন সকালে আমরা মেপল হোয়াইট ল্যাণ্ডের একটা ছোট অংশের ম্যাপ তৈরি করলাম। টেরোড্যাকটিলদের আস্তানাটা এড়িয়ে পানির ধারার পশ্চিম পাড়ে না থেকে পুবে থাকলাম আমরা। এদিকটায় জঙ্গল খুব ঘন, আমাদের অগ্রগতিও তাই খুব ধীর হলো।

মালভূমির বিপজ্জনক দিকটা নিয়েই বেশি ভেবেছি আমরা। সেদিন এর আর একটা রূপ আমাদের চোখে পড়ল। সারা সকাল অসংখ্য সুন্দর ফুলের ভিতর দিয়ে হাঁটলাম। বেশির ভাগ ফুলের রঙই সাদা বা হলুদ। প্রফেসর দু'জন ব্যাখ্যা করে বললেন, এ দুটোই ফুলের আদি রঙ। কোন কোন জায়গা একেবারে ফুলে বোঝাই, ফুলের গন্ধে অদ্ভুত মাদকতা। মৌমাছি গুনগুন করে বেড়াচ্ছে বনে। অনেক গাছের ডাল ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। কিছু চেনা কিছু অচেনা ফল। পাখি যেগুলো ঠুকরেছে আমরা কেবল সেগুলোই সংগ্রহ করলাম, অন্যগুলো বিষাক্ত হতে পারে মনে করে এড়িয়ে গেলাম। সুস্বাদু ফলে আমাদের সঞ্চিত খাবারের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল।

জঙ্গলে কয়েকটা পায়ে চলার পথ দেখলাম–ওগুলো জন্তু জানোয়ারের পায়ের চাপে তৈরি হয়েছে। জলা জায়গায় নানা ধরনের পায়ের ছাপ–ইগুয়েনোডনের ছাপও রয়েছে সেগুলোর মধ্যে। একটা ফাঁকা জায়গায় কতগুলোকে চরতে দেখা গেল। বিনোকিউলার দিয়ে ভাল করে দেখে জন জানালেন যে ওদের সব ক'টারই গায়ে আলকাতরার কালো দাগ রয়েছে। কিন্তু সকালে আমরা যেটাকে দেখেছি সেটার দাগ ভিন্ন জায়গায় ছিল। এর অর্থ কিছুই বুঝলাম না আমরা।

অনেক ছোট ছোট জন্তুও দেখলাম। যেমন শজারু, আঁশওয়ালা বনরুই, বাঁকাদেঁতো বিচিত্র রঙের বুনো শুয়োর, ইত্যাদি। দূরে একটা পাহাড়ের সবুজ ঢালে মেটে-খয়েরী রঙের একটা জন্তুকে অত্যন্ত দ্রুত ছুটতে দেখলাম। এত জলদি অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা যে আমরা কেউ সঠিক বলতে পারব না কি। জনের মতানুযায়ী ওটা যদি সত্যিই হরিণ হয়, তবে বলতেই হবে যে আইরিশ বিশাল এলকের সমান বড় ওটা।

আমাদের ক্যাম্প লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পাওয়ার পর থেকে যতবার আমরা ক্যাম্পে ঢুকি প্রতিবারই বুক দুরুদুরু করতে থাকে। যাই হোক আজ সব কিছু ঠিকঠাক

মতই পেলাম। সন্ধ্যায় আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থা আর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে বিতর্কে বসলাম। সামারলীই প্রথম শুরু করলেন। সারাদিনই মেজাজ একটু চড়া ছিল তাঁর, আগামীকালের করণীয় সম্পর্কে জনের মন্তব্য তাঁর মুখের বাঁধন খুলে দিল।

'আমাদের বর্তমানে যা করা উচিত তা হচ্ছে এই ফাঁদ থেকে বের হবার একটা উপায় বের করা,' তিক্তভাবে বললেন তিনি। 'আর আপনারা সবাই মাথা ঘামাচ্ছেন কি করে আরও ভিতরে ঢোকা যায়। আমি বলি আর ঢোকা নয়, এবার বের হবার পরিকল্পনা নিয়ে সবাইকে ভাবতে হবে।'

'অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি, জনাব,' চ্যালেঞ্জার তাঁর রাজকীয় দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে ভারী গলায় বললেন। 'একজন বিজ্ঞানের সাধক যে এমন একটা সস্তা মানসিকতার কাছে নতি স্বীকার করবেন এটা সত্যিই দুঃখজনক। আপনি এমন এক রাজ্যে আছেন, যেখানে পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোন মানুষ যা দেখার বা জানার সুযোগ পায়নি, অথচ আপনি কিনা এখান থেকে সামান্য একটু ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়েই ফিরে যেতে ইচ্ছুক! আপনার কাছ থেকে আমি এটা আশা করিনি, প্রফেসর সামারলী।'

জবাবে সামারলী বললেন, 'আপনার মনে রাখা উচিত যে আমার জন্যে লণ্ডনে একটা বিরাট ক্লাস পথ চেয়ে আছে। বর্তমানে তারা একেবারে অযোগ্য একজন লোকের হাতে রয়েছে। আপনার কথা ভিন্ন, কারণ যতদূর জানি আজ পর্যন্ত এই ধরনের দায়িত্বপূর্ণ কোন শিক্ষকতার কাজ আপনাকে দেয়া হয়নি।'

'ঠিকই বলেছেন,' একটু বাঁকা ভাবে বললেন চ্যালেঞ্জার। 'যে মাথা সর্বোচ্চ গবেষণার কাজ চালাবার ক্ষমতা রাখে তার জন্যে শিক্ষকতা করে সময় নষ্ট করা মূর্খতা, এইজন্যেই আমি ওই ধরনের কাজ কখনও গ্রহণ করিনি।'

'কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন আপনি?' ঠোঁট বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সামারলী।

জন তাড়াতাড়ি কথার মোড় অন্যদিকে ফেরাবার জন্যে বললেন, 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এমন একটা জায়গাকে ভালভাবে না দেখে না জেনে লণ্ডনে ফেরা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হবে।'

আমি বললাম, 'আমি তো কখনই অফিসে ঢুকে বুড়ো ম্যাকারডলের সামনে দাঁড়াতে পারব না। বিশদ, সম্পূর্ণ রিপোর্ট না দিতে পারলে তিনি কোনদিন আমাকে ক্ষমা করবেন না। তা ছাড়া আমরা ইচ্ছা করলেও যখন এখান থেকে নামতে পারছি না তখন তা নিয়ে আলাপ করে কি লাভ?'

'ছেলেটা নিজের বুদ্ধির ঘাটতি অনেকটা পুষিয়ে নিয়েছে স্বাভাবিক সাধারণ জ্ঞান দিয়ে,' মন্তব্য করলেন চ্যালেঞ্জার। 'ওর শোচনীয় পেশাগত আগ্রহ আমাদের কাছে অবান্তর, তবে একটা কথা ও ঠিকই বলেছে যে উপায় যখন নেই তখন আলাপ আলোচনা করে কোন ফল নেই।'

দাঁতের ফাঁকে পাইপটা কামড়ে ধরে সামারলী বললেন, 'আর কোন কিছু করতে যাওয়াই অনর্থক। লণ্ডনের জুওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই আমাদের এখানে পাঠিয়েছে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কথার সততা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে এবং সেই সাথে আমাদের কাজও শেষ হয়েছে। পুরো মালভূমির খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতে গেলে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি আর অনেক লোকজনের দরকার। আমরা নিজেরা যদি তা করতে যাই তা হলে ফল হবে হয়তো আমরা কেউই ফিরতে পারব না–বিজ্ঞান জগতের একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।

'আমরা সবাই যখন উপরে ওঠা অসম্ভব মনে করেছিলাম তখন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার অভিনব উপায়ে আমাদের উপরে আনেন। তিনিই তাঁর চাতুর্য আর কৌশল প্রয়োগ করে আবার আমাদের নীচে নামার পথ দেখাবেন।'

স্বীকার করতেই হবে যে সামারলীর বক্তব্য আমার কাছে খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হলো। এমনকী চ্যালেঞ্জারও একটু বিচলিত হলেন। যারা বিশ্বাস করেনি, খবরটা তাদের কাছে না পৌঁছলে তাদের দর্পচূর্ণ হবে না।

'নীচে নামার সমস্যাটা প্রথম দৃষ্টিতে ভীষণ মনে হলেও আমার বিশ্বাস যে বুদ্ধি খাটালে একটা উপায় নিশ্চয়ই বের করা যাবে,' দাম্ভিক ভাবে বললেন চ্যালেঞ্জার।

'আমার বন্ধু প্রফেসর সামারলীর কথা আমি সমর্থন করছি। মেপল হোয়াইট ল্যাণ্ডে আমাদের দীর্ঘ সময় কাটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তবে মোটামুটি ঘুরে না দেখে, আর জায়গাটার একটা ম্যাপ না নিয়ে এখান থেকে নড়তে আমি নারাজ।'

নাক থেকে ঘোঁত করে একটা শব্দ বের করে অস্থিরতা প্রকাশ করলেন সামারলী। 'আমরা দু'দিন কাটিয়েছি অনুসন্ধান করে কিন্তু এখানকার ভূগোল সম্বন্ধে মোটেও ধারণা হয়নি আমাদের। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে অনুসন্ধান করতে চাইলে মাসের পর মাস সময় লাগবে। যদি কোন চূড়া বা উঁচু জায়গা থেকে আমরা মালভূমিটা দেখার সুযোগ পেতাম তবে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেত।'

ঠিক এই সময়ে বুদ্ধিটা আমার মাথায় এল। জিঙ্কো গাছের গুঁড়িটাই যদি এত মোটা হয় তবে মাথায়ও নিশ্চয়ই ওটা আর সব গাছকে ছাড়িয়ে গেছে। আর মালভূমিটা ধারের দিকেই সবচেয়ে উঁচু। সুতরাং গাছের মাথায় উঠলে ওখান থেকে পুরো এলাকাটা দেখা যাবে। ছোটকাল থেকেই গাছে চড়ায় আমার জুড়ি ছিল না। কোনমতে একবার প্রথম ডালটাতে উঠতে পারলে বাকিটা সড়সড় করে উঠে যেতে পারব আমি। সঙ্গীরা সবাই আমার প্রস্তাব আনন্দের সাথে গ্রহণ করলেন।

লাল আপেলের মত গাল দুটো ফুলিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন, 'আমাদের এই

তরুণ ছেলেটা শক্ত আছে। আরও সুগঠিত লোকের পক্ষে যে সব কাজ সম্ভব নয় এ তা করতে পারে। আমি এ প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

জন পিঠ চাপড়ে দিলেন আমার, বললেন, 'একেবারে জায়গা মত হাত দিয়েছ হে, এই সোজা জিনিসটা আমাদের মাথায়ই আসেনি। আরও ঘণ্টাখানেক আলো থাকবে, তোমার নোট বইটা নিয়ে গাছে উঠলে হয়তো একটা খসড়া ম্যাপ আজই আঁকতে পারবে।'

তিনটে গুলির বাক্স গাছের নীচে একের উপর এক সাজিয়ে জন ধীরে ধীরে আমাকে উপরে তুলছিলেন, কোথা থেকে চ্যালেঞ্জার ছুটে এসে তাঁর বিশাল হাত দিয়ে এক ধাক্কা দিলেন আমাকে, আমার শরীর প্রায় উড়ে উপরের দিকে উঠে এল। মোটা ডালটা জড়িয়ে ধরে পায়ের সাহায্যে চড়ে বসলাম। বেশ ঘনঘনই ডাল বেরিয়েছে গাছটার। ঝটপট উপরে উঠতে লাগলাম আমি। অল্পক্ষণ পরেই লক্ষ করলাম, মাটি আর দেখা যাচ্ছে না। মাঝে একবার কেবল একটু বাধা এল, প্রায় দশ ফুট গুঁড়ি বেয়ে সোজা উঠতে হলো। গাছটা সত্যিই বিশাল। উপর দিকে চেয়ে গাছের পাতা পাতলা হবার কোন লক্ষণ দেখলাম না। যে ডালটা বেয়ে উঠছি তাতে ঘন পরগাছা জন্মেছে।

ওপাশে উঁকি দিতেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে এলো আমার, ঠিক দুই ফুট দূরেই আমার দিকে চেয়ে আছে একটা মুখ! সেই মুখের অধিকারী জন্তুটা পরগাছার পেছনে উপুড় হয়ে বসে ছিল এবং সে-ও একই সাথে উঁকি দিয়েছে। মুখটা যেন মানুষের–অর্থাৎ বানরের চেয়ে মানুষের মুখের সাথেই তার মিল বেশি। লম্বা সাদাটে মুখে ফুসকুড়ি ভরা, নাক থ্যাবড়া। থুতনিতে ঝাঁটার মত একটু দাড়ি, ভারি ভুরুর নীচে চোখ দুটো ভয়ঙ্কর। দাঁত বের করে আমার দিকে ভেঙচি কাটল সে, চোখে মুখে ঘৃণা আর বিদ্বেষ। হঠাৎ নিমেষের মধ্যে মুখের ভাব পালটে গেল ওর, ভীষণ ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল মুখে। কয়েক লাফে ডাল পালা ভেঙে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ওর লালচে শুয়োরের মত রোমশ দেহটা কেবল ক্ষণিকের জন্যে দেখলাম আমি।

জনের গলা শোনা গেল, 'কি হয়েছে–বিপদ হয়নি তো?'

দু'হাতে ডালটা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'দেখেছেন ওটাকে?' আমার হাত পা তখনও উত্তেজনায় কাঁপছে।

'শব্দ শুনে আমরা ভেবেছিলাম পা ফস্কে গেছে বুঝি তোমার, কি হয়েছিল?'

হঠাৎ অদ্ভুত জন্তুটার দেখা পেয়ে মনটা দুর্বল হয়ে গেছে আমার। একবার ভাবলাম নেমে যাই, কিন্তু এতদূর ওঠার পরে ভয়ে নেমে যাওয়ার অবমাননা মেনে নিতে পারলাম না।

বেশ কিছুক্ষণ বসে দম আর সাহস একত্র করে নিয়ে আবার উঠতে শুরু করলাম। ভুলে একটা পচা ডালে ভর দিয়ে কিছুক্ষণ হাতের উপর ঝুলতে হলো। কিন্তু মোটামুটি ভাবে বেশ সহজেই উপরে উঠে গেলাম আমি। মাথার উপর

গাছের পাতা এখন একটু পাতলা হয়ে এসেছে। মুখে বাতাসের ঝাপটা লাগছে, উপলব্ধি করলাম যে বনের অন্যান্য গাছ ছাড়িয়ে অনেক উপরে চলে এসেছি আমি। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম সবচেয়ে উঁচু ডালটিতে না উঠে আর আশেপাশে চাইব না। উঁচু ডালে চড়ে খুঁটি গেড়ে বসলাম, আমার সামনেই আশ্চর্য দেশের অপরূপ দৃশ্য।

সূর্য এখনও পশ্চিম দিগন্তের একটু উপরে রয়েছে। উজ্জ্বল পরিষ্কার বিকেল। আমার নীচে পুরো মালভূমিটাই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি। আকৃতি অনেকটা ডিমের মত, প্রায় তিরিশ মাইল লম্বা আর বিশ মাইল চওড়া হবে। চারদিক থেকে ঢালু হতে হতে মাঝের দিকে নেমে গেছে, ঠিক মধ্যখানে একটা বিরাট হ্রদ। প্রায় পনেরো মাইল হবে ওটার পরিধি। বিকেলের আলোয় হ্রদের ধারে সবুজ ঘন নলখাগড়ার ঝালর অপূর্ব দেখাচ্ছে। কয়েকটা হলুদ রঙের বালুচর জেগেছে পানিতে। লম্বা কালো কালো কতগুলো জিনিস দেখা যাচ্ছে চরে–কুমীরের চেয়ে অনেক বড়, সরু নৌকার চেয়েও লম্বা। বিনোকিউলার দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম, ওগুলো জীবন্ত।

আমরা মালভূমির যে ধারে সেদিক থেকে হ্রদ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ ছয় মাইল এগিয়ে গেছে জঙ্গল। মাঝে মধ্যে দু'একটা ফাঁকা জায়গা। আমার গাছের বেশ কাছে ইগুয়েনোডনের মাঠটা, আর একটু সামনে গাছের ফাঁকে গোল গর্তটাই হচ্ছে টেরাড্যাকটিলদের আস্তানা।

আমার উল্টো দিকের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাইরের দিকে বেসল্টের খাড়া ধার এদিকেও প্রসারিত হয়েছে। প্রায় দু'শো ফুট উঁচু হবে। নীচে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে জঙ্গল। বিনোকিউলারে লাল পাথরের গায়ে এক সারি কালো কালো গর্ত চোখে পড়ল। ওগুলো গুহার মুখ বলে ধরে নিলাম আমি। একটি গুহার মুখে কি যেন চকচক করতে দেখলাম, কিন্তু ওটা যে কি তা এতদূর থেকে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সূর্য ডুবে যাওয়ার পরেও আমি অনেকক্ষণ ব্যস্ত রইলাম ম্যাপ আঁকার কাজে। যখন দেখলাম অন্ধকারে আর খুঁটিনাটি চিনতে পারছি না তখন নেমে এলাম। একবারের জন্যে হলেও এই অভিযানের একক নায়ক ছিলাম আমি! বুদ্ধিটাও ছিল আমার আর কাজটাও আমিই সম্পূর্ণ করলাম। এই ম্যাপটা আমাদের মাসের পর মাস বিপদ মাথায় নিয়ে কানার মত জঙ্গলে হাতড়ে বেড়ানোর হাত থেকে বাঁচাল।

গাছ থেকে নেমে আসতেই সবাই আমার সাথে হাত মেলালেন। ম্যাপ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করার আগে বনমানুষের সাথে আমার সাক্ষাতের ঘটনাটা বর্ণনা করলাম।

'প্রথম থেকেই সে ছিল গাছে,' বললাম আমি।

জন জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কীভাবে তা জানলে?'

'কেউ আমাদের উপর অলক্ষ্যে নজর রাখছে এমন একটা অনুভূতি সব সময়েই আমার ছিল–প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকেও বলেছি আমি সে কথা।'

'হ্যাঁ, আমাদের তরুণ সঙ্গী ওই ধরনের কিছু একটা বলেছিল,' বললেন চ্যালেঞ্জার। 'আমাদের সবার চেয়ে তান্ত্রিক যোগাযোগটা সম্ভবত ওরই একটু বেশি প্রবল।'

'টেলিপ্যাথির সম্পূর্ণ ভিত্তি···' সামারলী তার পাইপে তামাক ভরতে ভরতে আরম্ভ করলেন।

'এত ব্যাপক একটা বিষয় আলাপ করার সময় এখন নেই,' বেশ জোর দিয়েই বললেন চ্যালেঞ্জার। 'আচ্ছা বলত, জন্তুটা কি তার বুড়ো আঙ্গুল ভাঁজ করতে পারে? লক্ষ করেছিলে?'

'দেখেছি, পারে না।'

'লেজ ছিল ওর?'

'না।'

'পা দিয়ে ডাল আঁকড়ে ধরতে পারে?'

'আমার মনে হয় তা পারে, নইলে এত দ্রুত অদৃশ্য হতে পারত না সে।'

চ্যালেঞ্জার বললেন 'আমার যতদূর মনে পড়ে দক্ষিণ আমেরিকায় ছত্রিশ রকম বিভিন্ন জাতের বানর আছে, কিন্তু বনমানুষের কথা মোটেও শোনা যায় না। যা হোক এখন বোঝা গেল যে এখানে তাদের অস্তিত্বও আছে। এটা রোমশ গরিলা জাতের নয়–রোমশগুলো কেবল আফ্রিকা বা প্রাচ্য দেশেই সীমাবদ্ধ।'

চ্যালেঞ্জারের মুখের দিকে চেয়ে আমি প্রায় বলেই ফেলেছিলাম যে লণ্ডনে বনমানুষের মাসতুত ভাইয়ের দেখা পেয়েছিলাম আমি কেনসিংটনে!

চ্যালেঞ্জার বলে চললেন, 'আমাদের সামনে এখন একটাই প্রশ্ন, তা হচ্ছে জন্তুটা কতটা মানুষের আর কতটা বনমানুষের সদৃশ তা বের করা। এমনও হতে পারে যে একেই মূর্খটা "মিসিং লিঙ্ক" বা হারানো সূত্র বলেছে। এই সমসার সমাধান আমাদের জরুরী দায়িত্ব।'

'মোটেও নয়,' আপত্তি করে উঠলেন সামারলী। 'মিস্টার ম্যালোনের বুদ্ধি আর চেষ্টায় ম্যাপ যখন আমরা পেয়ে গেছি, তখন আমাদের প্রথম কাজ হবে এই বিদঘুটে জায়গা ত্যাগ করা।'

'সভ্যতার বিলাস!' বলে গজরাতে লাগলেন চ্যালেঞ্জার।

'বিলাস নয়, সার,' যুক্তি দিলেন সামারলী, 'আমরা এখানে যা দেখেছি সেটা কাগজে কলমে পৃথিবীর সবার কাছে তুলে ধরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ম্যাপটা হাতে আসার আগে সে বিষয়ে আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম।'

'হুম!' বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার দিলেন চ্যালেঞ্জার। 'একথা সত্য যে আমি আমাদের অভিযানের ফলাফল বন্ধুদের হাতে না পৌঁছা পর্যন্ত স্বস্তি পাব না, কিন্তু কীভাবে যে এখান থেকে আমরা নামব সে বিষয়ে এখনও ভাবনা চিন্তা করিনি।

সমাধান করতে পারিনি এমন কোন সমস্যা আজ পর্যন্ত পাইনি আমি। কথা দিলাম, আগামীকাল থেকেই আমার উদ্ভাবনী মস্তিষ্ককে কাজে লাগাব। আমি নীচে নামার একটা উপায় খুঁজে বের করবই।'

আলোচনা এখানেই শেষ হলো। সেই রাতে আমি মোমবাতির আলোয় ম্যাপ নিয়ে বসলাম। গাছের উপর থেকে যা দেখেছি সব নিখুঁতভাবে জায়গা মত ম্যাপে বসিয়ে দিলাম। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তাঁর পেনসিল দিয়ে ম্যাপের মাঝখানের অংশ–যেখানে হ্রদটা আঁকা হয়েছে সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটার নাম কি দেব আমরা?'

'আপনার নামই জুড়ে দিন,' বিষ ছড়ালেন সামারলী, 'আমরা কেউ আপত্তি করব না।'

কঠিন স্বরে জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার, 'আমার নাম কেবলমাত্র বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যবহারের জন্যে। যে কোন অজ্ঞ মূর্খ তার নাম পাহাড় বা নদীর সাথে জড়াতে পারে। আমার দরকার নেই অমন স্মৃতি সৌধ।'

সামারলী বাঁকা হাসি হেসে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতেই জন চট করে বলে উঠলেন, 'তুমিই নাম রাখো হ্রদটার, তুমিই সবার আগে দেখেছ। তুমি যদি ওটার নাম "ম্যালোন হ্রদ" রাখতে চাও তাতে কারও কোন আপত্তি থাকতে পারে না।'

'অবশ্যই,' বললেন চ্যালেঞ্জার। 'আমাদের তরুণ বন্ধুই নামকরণ করুক ওটার।'

'তবে,' একটু লজ্জিত ভাবে বললাম আমি, 'ওটার নাম দেয়া হোক গ্লাডিস লেক।'

সামারলী বললেন, 'ওটাকে "সেন্ট্রাল লেক" নাম দিলেই কি বেশি অর্থবহ হত না?'

'গ্ল্যাডিস লেকই আমার পছন্দ।'

সমবেদনার সাথে আমার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে কপট আপত্তি জানিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন, 'ছেলেমানুষ সবসময়ে ছেলেমানুষই। গ্ল্যাডিস লেকই নাম হোক ওটার।'

এগারো

আমার বুকটা সেদিন সত্যিই গর্বে ফুলে উঠেছিল, যেদিন আমার তিনজন গুণী সঙ্গী আমাকে এই সাফল্যের জন্যে অভিনন্দন জানালেন। দলের প্রচুর সময় আর পরিশ্রম বেঁচে গেল। আমি দলের সবচেয়ে ছোট সদস্য। ছোট কেবল বয়সে

নয়–অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানে, আরও অন্যান্য দিক থেকে। সত্যিকারের মানুষ হতে যে সব যোগ্যতার দরকার হয়, সবদিক থেকেই আমি ওঁদের কনিষ্ঠ। শুরু থেকেই ওঁদের ছায়ায় ঢাকা পড়ে ছিলাম আমি, কিন্তু নিজের উদ্যোগে সেই ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি আজ।

সেই রাতে অহেতুক উত্তেজনায় কিছুতেই ঘুমাতে পারলাম না আমি। সামারলী পাহারায় ছিলেন। কুঁজো হয়ে আগুনের ধারে বসে আছেন, রাইফেলটা তাঁর হাঁটুর উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা। তাঁর ছাগলা দাড়ি নড়ছে ঝিমানির তালে তালে। দক্ষিণ আমেরিকার একটা 'পঞ্চো' জড়িয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছেন জন। চ্যালেঞ্জার শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে একটু একটু গড়াচ্ছেন আর তাঁর নাক ডাকছে বিকট শব্দ তুলে।

পূর্ণিমার বিরাট চাঁদটা চারদিক আলো করে রেখেছে–বাতাস নির্মল সতেজ, একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। হেঁটে বেড়িয়ে আসার জন্যে চমৎকার একটা রাত। হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল চিন্তাটা, 'অসুবিধা কি?' চুপিচুপি বেরিয়ে লেকের পাড় থেকে ঘুরে আসতে কোনো বাধা নেই। সকালের নাস্তার সময়ে এই জায়গাটা সম্পর্কে যদি আরও কিছু তথ্য নিয়ে ফিরতে পারি, সবাই আমাকে তাঁদের যোগ্য সহকর্মী মনে করবেন। যখন ফিরে যাবার উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে, আর আমরা লণ্ডনে ফিরব তখন আমিই থাকব মালভূমির কেন্দ্র এলাকার রহস্যের একমাত্র চাক্ষুষ দর্শক।

গ্ল্যাডিসের কথা মনে পড়ল আমার। 'আমাদের চারপাশেই রয়েছে নানান ধরনের নায়কোচিত কাজ।' পরিষ্কার তার গলা যেন শুনতে পেলাম আমি। আমাদের এডিটর ম্যাকারডলের কথাও একবার মনে হলো, কেমন জমজমাট একটা তিন কোলাম প্রবন্ধ যাবে কাগজে। পেশায় উন্নতি করার জন্যে অতি চমৎকার সুযোগ।

একটা রাইফেল তুলে নিয়ে পকেটে গুলি বোঝাই করে কাঁটা গাছের বেড়া সরিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেরুবার আগে একবার পিছন ফিরে দেখলাম সামারলী ঘুমে অচেতন। নিরর্থক প্রহরী–তখনও একই ভাবে একটা যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত পুতুলের মত নিয়মিত তালে ঝিমাচ্ছেন আগুনের ধারে।

একশো গজও যাইনি আমি তখনও, নিজের গোঁয়ার্তুমির জন্যে গভীর অনুশোচনা হলো। আগেই বলেছি আমি খুব একটা সাহসী লোক নই। কিন্তু ভয় পেয়েছি তা স্বীকার করার ভীতিই যেন আমাকে সামনে টেনে নিয়ে চলল। কিন্তু কিছু একটা না করে গোপনে ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারলাম না। ফিরে গেলে কেউ হয়তো আমার অনুপস্থিতি টেরই পাবে না–আমার দুর্বলতার কথাও জানবে না, কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে কি জবাব দেব আমি? আমার বর্তমান অবস্থাটা চিন্তা করে শিউরে উঠলাম। ওই অবস্থা থেকে মানেমানে রেহাই পাবার জন্যে আমি পার্থিব যে কোন কিছু হারাতে রাজি।

বনের মধ্যে ভয়াবহ অবস্থা। জঙ্গল, ঝোপ, লতা সবই আরও ঘন হয়েছে।

চাঁদের আলো পৌছাচ্ছে না নীচে। মাঝে মধ্যে পাতার ফাঁক দিয়ে একটু আলোর ঝিলিক দেখা যায় তারা ভরা আকাশের বুকে। আলোর স্বল্পতা চোখে এক রকম সয়ে এল, দেখলাম গাছের মাঝে মাঝে আঁধারের কালো সব জায়গায় এক রকম নয়। কিছু গাছ আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে আবার কিছু জায়গা একেবারে কয়লার মত কালো। ওগুলো দেখে গা ছমছম করে উঠছে আমার। ইগুয়েনোডনটার বিকট আর্তচিৎকারের কথা মনে পড়ল। জনের হাতের কাঠের আগুনে দেখা ফুসকুড়ি তোলা মুখটাও সেই সঙ্গে মনে পড়ল আমার। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি তার শিকারের জায়গায়। যে কোন সময়ে সে অন্ধকারের আড়াল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমার ওপর।

একটু থামলাম আমি। পকেট থেকে গুলি বের করে ভরার জন্যে রাইফেলটা খুললাম। লিভারের ওপর হাত পড়তেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। রাইফেল নয়, ভুলে ছর্‌রা গুলির বন্দুক নিয়ে এসেছি আমি!

ক্যাম্পে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল আমার। ফিরে যাবার জন্যে এই একটি যুক্তিই যথেষ্ট; কেউ আমাকে কাপুরুষ ভাববে না। কিন্তু আবার সেই মিথ্যা গর্ব আমাকে ঘিরে ধরল, ব্যর্থ হলে চলবে না, সফল আমাকে হতেই হবে। যে সব ভয়ানক বিপদের মধ্যে আমাকে পড়তে হতে পারে সে সব ক্ষেত্রে রাইফেলও হয়তো বন্দুকের সমানই কাজে আসবে। ক্যাম্পে ফিরে অস্ত্র বদলে রাইফেল নিয়ে আসতে গেলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। সে ক্ষেত্রে আমাকে অনেক কৈফিয়তও দিতে হবে এবং আমার একক প্রচেষ্টা তখন আর একক থাকবে না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করলাম, তারপর সাহসে বুক বেঁধে আবার সামনে এগুলাম।

জঙ্গলের অন্ধকার ভয়ঙ্কর। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল ইগুয়েনোডনের মাঠে চাঁদের আলো। ঝোপের পিছনে লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে আমি মাঠের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালাম। বড় কোনো প্রাণী নজরে পড়ল না। হয়তো সেই রাতে বিপর্যয় ঘটার পর থেকেই ওরা খাবারের জন্যে চরে বেড়াবার জায়গা বদল করেছে। সামান্য কুয়াশাচ্ছন্ন রূপালী চাঁদের আলোয় কোন প্রাণী আমার নজরে পড়ল না। সাহস সঞ্চয় করে মাঠটা খুব দ্রুত পার হলাম আমি। তারপর আবার স্রোতের ধারা ধরে এগিয়ে চললাম। ছোট্ট পানির ধারাটা আমার মনের জোর অনেকখানি বাড়িয়ে দিল। কুলকুল শব্দে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতই বয়ে চলেছে সে। ছেলেবেলায় ইংল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলে অনেক রাতই এমন ছোট্ট নদীতে ট্রাউট মাছ ধরেছি আমি। এই ধারাটা অনুসরণ করে গেলেই লেকে পৌছতে পারব–আর উল্টোদিকে গেলে পৌছব ক্যাম্পে।

চলার পথে মাঝেমাঝে আমাকে ধারাটা থেকে একটু দূরে সরে যেতে হচ্ছে, ঘন জঙ্গল এড়ানোর জন্যে, কিন্তু মিষ্টি কুলকুল আওয়াজ সব সময়েই কানে আসছে আমার।

ঢাল দিয়ে নীচে নামতে নামতে জঙ্গলটা পাতলা হয়ে এল। ফাঁকে ফাঁকে বড় গাছ আর এখন নেই। বেশ দ্রুত চলেছি আমি। নিজেকে দেখা না দিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি এগুতে পারছি। টেরাড্যাকটিলের আস্তানার খুব কাছ দিয়েই পার হলাম। পাশ দিয়ে যেতে ওদের একটা আকাশে উড়ল, চাঁদের আলোয় বিরাট ছায়া মাটিতে পড়েছে। আমি মাটির সাথে মিশে উপুড় হয়ে লুকিয়ে রইলাম। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমার ভালই জানা আছে যে ওদের কারও একটার ডাকে শ'য়ে শ'য়ে টেরাড্যাকটিল আকাশে উড়বে। ওটা আবার নীচে না নামা পর্যন্ত আর সাহস করে আগে বাড়লাম না আমি।

নিস্তব্ধ রাত। কিন্তু আগে বাড়ার সাথে সাথে আমি একটা গর্ গর্ শব্দ শুনে সচেতন হলাম। একটানা একটা শব্দ আসছে আমারই একটু সামনে থেকে। একটু আগে বাড়তেই শব্দটা আরও জোরদার হলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে শব্দটা আমার খুব কাছে থেকে আসছে। আমি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝলাম একটা আবদ্ধস্থান থেকে শব্দটা আসছে। অনেকটা টগ্‌বগ্ করে পানি ফোটার শব্দের মত। অল্পক্ষণের মধ্যেই শব্দের উৎপত্তি স্থলে পৌঁছলাম আমি। ছোট একটা ফাঁকা জায়গায় একটা ছোট্ট ডোবা। ট্রাফালগার স্কোয়ারের ঝর্নার চেয়ে বড় হবে না। কালো আলকাতরার মত জিনিস ফোস্কার মত ফুলে উঠে শব্দ তুলে ফেটে যাচ্ছে। আশেপাশের বাতাস গরম, মাটিও এমন গরম যে হাত রাখা যায় না। স্পষ্টতই বোঝা গেল যে আগ্নেয় শক্তিতে এই মালভূমির সৃষ্টি, দাপট কমলেও শক্তি এখন পর্যন্ত একেবারে ফুরিয়ে যায়নি।

আমার চারপাশে কেবল কালো হয়ে যাওয়া পাথর আর লাভার স্রোতের চিহ্ন। ঘন সবুজ গাছ গাছড়া ঘিরে রেখেছে সেগুলোকে। কিন্তু আর বেশি সময় নেই আমার হাতে, ভোরের আগে ফিরতে হলে এখনই লেকের পথে রওনা হতে হবে।

সুন্দর চাঁদের আলো ভরা রাতে আমি ফাঁকা জায়গায় গাছের ছায়ায় ছায়ায় লুকিয়ে এগুতে লাগলাম। পা টিপে টিপে চলেছি, একটু পরপরই ডালপালা ভেঙে কোনো জন্তুর চলার শব্দে থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে। মাঝে মাঝেই এক একটা বিরাট ছায়া অস্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠছে সামনে, আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে। ওরা যেন তুলোর পায়ের উপর ভর দিয়ে চলাফেরা করছে।

শেষ পর্যন্ত সামনে খোলা জায়গায় পানির উপর চাঁদের আলোর অস্পষ্ট ঝিলিক চোখে পড়ল। ঘড়িতে দেখলাম রাত একটা বাজে। দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম আমি লেকের ধারে নলখাগড়ার ভিতর।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার, ঝুঁকে পড়ে লেকের পানি খেলাম, তাজা ঠাণ্ডা পানি। মাটিতে চওড়া পথের উপর নানা রকম পায়ের ছাপ। নিশ্চয়ই জীবজন্তুর পানি খাবার জায়গা এটা।

পানির ধারে লাভার একটা বিরাট চাক পড়ে রয়েছে। সেটার উপরে উঠলাম

আমি। সেখানে শুয়ে চারদিক চমৎকার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল গুহার মুখগুলো। প্রত্যেকটাই লালচে আলোর চাক্কির মত দেখাচ্ছে–অনেকটা জাহাজের পোর্টহোলের মত। কিন্তু আলো কোত্থেকে আসছে? কোন আগ্নেয় প্রক্রিয়া? কিন্তু না, অত উপরে তো সেটা সম্ভব নয়। চিন্তার ঝড় বয়ে চলল মাথায়, তবে কি···? অবশ্যই, আগুন জ্বলছে গুহার ভিতরে। আগুন! মানুষ ছাড়া তো আর কারও পক্ষে আগুন জ্বালানো সম্ভব নয়! আমার অভিযান যথার্থই সার্থক হলো। লণ্ডনে নিয়ে যাবার মত একটা গরম খবর মিলল।

অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে আমি কাঁপা আলোগুলো লক্ষ করলাম। আমার থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে হবে, এতদূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে কেউ সামনে দিয়ে গেলেই আলোটা মিটমিট করে ওঠে!

ওখানে পৌঁছে চুপিচুপি উঁকি দিয়ে যদি একটু দেখতে পারতাম এই অদ্ভুত দেশে যে মানুষ বাস করে তারা দেখতে কেমন, বা কি স্বভাবের; কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়। ওদের সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু না জেনে আমাদের ফিরে যাওয়া কিছুতেই ঠিক হবে না।

আমার সামনে রূপালী পারার মত ঝিকমিক করছে 'গ্ল্যাডিস লেক'–আমার অতি আপন হ্রদ। প্রতিফলিত চাঁদটা ঠিক লেকের মাঝখানে ঝিক্‌মিক্ করছে। লেকটা খুব গভীর নয়। কয়েক জায়গাতেই আমি চর দেখতে পেলাম। স্থির পানিতে প্রাণের প্রাচুর্য চোখে পড়ল, ছোট ছোট গোলাকার ঢেউ, লাফিয়ে ওঠা মাছের চকচকে সাদা পেট, কখনও আবার কোন বিরাট জানোয়ারের কালো কুঁজো পিঠ। রাজহাঁস আকারের বিরাট একটা প্রাণী দেখলাম এক হলুদ চরের ধারে পানিতে নামল, কিছুদূর এগিয়েই ডুব দিল, তারপর আর দেখা গেল না।

দূর থেকে কাছে দৃষ্টি ফিরে এল আমার। দুটো আর্মাডিল্লোর মত প্রাণী, ছুঁচোর মত দেখতে, আকারে ছুঁচোর চেয়ে অনেক বড়, সারা গায়ে মাছের আঁশের মত শক্ত আবরণ। জলার ধারে পানি খেতে এসেছে। পাড়ে বসে লাল ফিতার মত লম্বা জিভ দ্রুত নেড়ে চপ্‌চপ্ করে পানি খাচ্ছে।

একটা বিরাট শিঙওয়ালা রাজকীয় চালের হরিণ দুটো বাচ্চা আর হরিণীর সাথে আর্মাডিল্লো দুটোর পাশে দাঁড়িয়ে পানি খেলো। এতবড় হরিণ আজ পৃথিবীর কোথাও নেই। সবচেয়ে বড় এল্‌কও এর কাঁধের সমান উঁচু হবে কিনা সন্দেহ। হঠাৎ সচকিত হয়ে সবাইকে নিয়ে নলখাগড়ার ভিতরে ঢুকে গেল ওরা। আর্মাডিল্লো দু'টাও ছুটল নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে। আর অল্প পরেই আগন্তুককে দেখা গেল। পথ ধরে এগিয়ে আসছে–ভীষণ আকৃতির এক জানোয়ার।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো কোথায় যেন দেখেছি আমি ওই আকৃতি। কুঁজো পিঠ, তার উপরে কালো ত্রিভুজের মত ঝালর। পাখির মাথার আকৃতির বিরাট মাথাটা মাটির সামান্য উপরে রয়েছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার। স্টিগেসরাস! এরই ছবি এঁকেছিলেন মেপল হোয়াইট; হয়তো একেই স্কেচ করেছিলেন শিল্পী।

পাঁচ মিনিট পর্যন্ত জন্তুটা আমার পাথরের চাকের এত কাছে ছিল যে আমি হাত বাড়ালেই ওর পিঠের ঢেউ খেলানো খাঁজ ছুঁতে পারতাম। তার প্রচণ্ড ভারে মাটি কাঁপছিল, পানি খাওয়া শেষ করে সে হেলেদুলে পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘড়ি দেখলাম, রাত আড়াইটা বাজছে। এখনই রওনা না হলে সময় মত ক্যাম্পে পৌঁছতে পারব না। দিক চিনতে কোন কষ্ট হলো না আমার, পানির ধারাটাকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চললাম। খুশি মনে চলেছি আমি, আজকের রাত সফল হয়েছে আমার। এখন শুধু সঙ্গীদের খবরগুলো দিয়ে চমকে দেবার অপেক্ষা। চলতে চলতে ভাবলাম পৃথিবীর কোন মানুষই বোধ হয় এর আগে আর এত ঘটনাবহুল একটা রাত কাটায়নি।

নানান কথা ভাবতে ভাবতে ঢাল বেয়ে উপরে উঠছি আমি। প্রায় অর্ধেক পথ চলে এসেছি, হঠাৎ আমার পিছন দিকে একটা অদ্ভুত শব্দ আমাকে স্বপ্নের রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। কুকুরের রাগে গোঁ গোঁ শব্দ আর নাক ডাকার শব্দের মাঝামাঝি একটা আওয়াজ, নিচু, গভীর স্বর। হিংস্র এবং আতঙ্কজনক।

অজানা কোন জন্তু রয়েছে আমার আশেপাশেই, কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পা চালিয়ে এগুলাম, আধমাইল মত পথ চলার পরেও একই শব্দ আঘাত আমার কানে এল। এবারও পিছন থেকেই আসছে আওয়াজ, কিন্তু আরও জোরে, আরও ভয়ঙ্কর। হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেল আমার, যে জন্তুই হোক না কেন সে যে আমার পিছু নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল, ভয়ে সমস্ত লোম দাঁড়িয়ে গেছে।

বাঁচার তাগিদে জন্তুগুলো নিজেরা মারামারি করে একে অন্যকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের পিছু লাগবে, পিছনে পিছনে অনুসরণ করে এসে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ শিকার করবে এটা ভীতিজনক। সেদিনকার রাতের বীভৎস জীবটার মুখ ভেসে উঠল আমার স্মৃতিপটে।

আবারও সেই শব্দ! এবার আরও জোরে, আরও কাছে। সন্দেহ নেই আমারই পিছু নিয়েছে সে। আমাদের মধ্যেকার দূরত্ব কমে আসছে প্রতি মিনিটে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকের মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, যে পথে এসেছি সেদিকে তাকাতে হঠাৎ দেখা গেল জন্তুটাকে। আমি যে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে এসেছি তারই উল্টো দিকের ঝোপ-ঝাড় নড়ে উঠল, তারপর অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা বিশাল কালো ছায়া ক্যাঙ্গারুর মত লাফাতে লাফাতে পরিষ্কার চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল। খাড়া হয়ে তার শক্তিশালী পিছনের পায়ের সাহায্যে লাফাচ্ছে, সামনের দুটো পা বাঁকা অবস্থায় শূন্যে ঝুলছে। হাতির মত বিরাট বড় আর শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও জন্তুটার চলা অত্যন্ত ক্ষিপ্র।

আশায় বুক বাঁধলাম যে ওটা হয়তো একটা ইগুয়েনোডন হবে; আমি জানি ওরা মানুষের কোন ক্ষতি করে না, নিরামিষাশী। কিন্তু পরক্ষণেই আমার ভুল

ভাঙল; এই রকমই একটা জন্তু হানা দিয়েছিল আমাদের ক্যাম্পে। ওরাই পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র ডাইনোসর। প্রত্যেক বিশগজ চলার পরেই ঝুঁকে পড়ে মাটি শুঁকতে লাগল ওটা। গন্ধ শুঁকে শুঁকে অনুসরণ করছে আমাকে। দুই একবার কিছুটা ভুল পথে চলে গেলেও ফের শুধরে নিতে ওর সময় লাগল না, আবার লাফাতে লাফাতে ঠিক আমার পিছু পিছু এগিয়ে এল জীবন্ত বিভীষিকা।

ভয়ে আমার হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে যাবার যোগাড় হলো। এই বিশাল দানবের বিরুদ্ধে একটা ছররা বন্দুক দিয়ে কি করব আমি? গুলিতে আঁচড়ও লাগবে না ওর গায়ে। পাথর বা কোন বড় গাছের খোঁজে চারপাশে চাইলাম আমি; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, ছোট ঝোপ আর লতা ছাড়া আশেপাশে আর কিছুই নজরে পড়ল না। গাছে উঠেও কোন ফল হবে না, জানোয়ারটা বড় বড় গাছ দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত মট করে ভেঙে ফেলতে পারবে। প্রাণপণে ঝেড়ে দৌড় দেয়া ছাড়া আর অন্য উপায় নেই এখন।

উঁচু নিচু ভাঙাচোরা জমির উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে পারছি না আমি। হতাশার মাঝে হঠাৎ পরিষ্কার চোখে পড়ল একটা পায়ে চলার পথ। আমরা আগেও মালভূমিতে ঘোরাফেরা করার সময়ে এই ধরনের পথ কয়েকটা দেখেছি। এই পথ ধরে ঝেড়ে দৌড় দিলে সম্ভবত ওটা আর আমাকে ধরতে পারবে না; খুব ভাল দৌড়াতে পারি আমি, শরীরও মজবুত আছে।

অনাবশ্যক বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটলাম আমি। জীবনে আর কোনদিন এত দ্রুত দৌড়াইনি, পরেও বোধহয় আর কোনদিন পারব না। ছুটতে ছুটতে এক সময় দুই পা ধরে এল, হাঁপরের মত হাঁপাচ্ছি। গলাটা বাতাসের অভাবে ফেটে যাবে মনে হচ্ছে। কিন্তু তবু থামলাম না আমি, ছুটতে লাগলাম, প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম, পিছনে আমার সাক্ষাৎ যম।

এক সময়ে পিছনে ফেলে আসা পথটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল, আর কোন শব্দ নেই। ভাবলাম, এযাত্রা বেঁচে গেছি। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙল, নিষ্ঠুর নিয়তির মত ধুপ্ ধুপ্ শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে জন্তুটা–ধরে ফেলল বলে আমাকে। হেরে গেছি আমি, বাঁচার আর কোন উপায় নেই।

আবার ছুটবার আগে বোকার মত অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছি আমি। এতক্ষণ জন্তুটা আমাকে অনুসরণ করছিল গন্ধ শুঁকে, কিন্তু এখন সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আমাকে। বিরাট বড় বড় লাফ দিয়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে। বাঁকটা ঘুরতেই চাঁদের আলো পড়ল তার উপর। ঠিকরে বেরিয়ে আসা বিরাট দুটো হিংস্র চোখ, হাঁ করা চোয়ালে দেখা যাচ্ছে দুই সারি তীক্ষ্ণ দাঁত, সামনের থাবার নখগুলো পর্যন্ত ঝকঝক করছে!

ভয়ে একটা চিৎকার দিয়ে ঘুরেই আবার ছুটলাম আমি। পিছনে পায়ের শব্দও এগিয়ে আসছে। যে কোন মুহূর্তে ওটার থাবা আমার কাঁধের ওপর পড়তে পারে।

হঠাৎ নীচে পড়ে জ্ঞান হারালাম আমি।

ধীরে ধীরে আবার জ্ঞান ফিরে এল আমার। মাত্র কয়েক মিনিট অজ্ঞান ছিলাম। একটা তীব্র বোটকা দুর্গন্ধ নাকে এল। অন্ধকারে একটু হাতড়াতেই একহাতে একটা বড় মাংসপিণ্ডের মত কি যেন ঠেকল, অন্য হাতে একটা বড় হাড়। মাথার ওপরে দেখলাম গোল খানিকটা আকাশ, তারায় ভরা। একটা গভীর গর্তে পড়ে গেছি আমি। টলতে টলতে আবার উঠে দাঁড়ালাম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিজেকে পরীক্ষা করে দেখলাম। সারা শরীরে ব্যথা, কিন্তু হাড় ভাঙেনি। একটু আগের ঘটনা মনে পড়তেই আবার উপরের দিকে চাইলাম, ভেবেছিলাম জন্তুর বিরাট আকৃতিটা দেখব, কিন্তু না, আশেপাশে কিছুই নজরে পড়ল না।

গর্তের চারপাশেই ঢালু দেয়াল। তলাটা সমান, প্রায় বিশ ফুট চওড়া হবে। জায়গাটা পচন ধরা মাংসের টুকরায় ভর্তি। বিষাক্ত পরিবেশ। পচা মাংসের দলায় হোঁচট খেয়ে শক্ত কিছু একটার সাথে বাড়ি খেলাম। মাটিতে মজবুত একটা খুঁটি পোঁতা রয়েছে। হাত উঁচিয়ে চর্বি মাখা খুঁটিটার মাথার নাগাল পেলাম না।

হঠাৎ মনে পড়ল, আমার পকেটে দিয়াশলাই, আর মোমমাখানো ফিতা আছে। একটা ফিতা জ্বেলে কিছুটা আন্দাজ পেলাম যে আমি কোথায় আছি। এটা একটা ফাঁদ, মানুষের হাতে তৈরি! খুঁটিটা প্রায় নয় ফুট লম্বা, উপরের দিকটা চোখা, রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। নীচে পড়ে থাকা মাংস ফাঁদে পড়া জন্তুরই দেহাবশেষ। খুঁটি থেকে কেটে নীচে ফেলা হয়েছে যাতে পরবর্তী শিকার ফাঁদের অবস্থান টের না পায়।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বলেছিলেন যে এইসব শক্তিশালী জানোয়ারের সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষের পক্ষে এখানে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এখন পরিষ্কার বোঝা গেল মানুষ কীভাবে টিকে আছে এইসব জীবজন্তুর মাঝে। সরু মুখের গুহা–যেখানে বড় কোন প্রাণী ঢুকতে পারবে না, এমন জায়গায় বাস করে তারা। আর এসব ফাঁদ পেতে শত্রু ধ্বংস করে। মানুষ সত্যিই সৃষ্টির সেরা।

ওই ঢালু দেয়াল বেয়ে উপরে ওঠা একজন কর্মক্ষম মানুষের পক্ষে কঠিন কাজ নয়। তবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমি জানোয়ারটার ভয়ে। আশেপাশের কোন ঝোপে সে যে আমার জন্যে ওঁৎ পেতে বসে নেই তা জানার উপায় নেই। সাহস করে শেষ পর্যন্ত ওপরে উঠলাম। প্রফেসার চ্যালেঞ্জার আর সামারলীর কথাবার্তাগুলো মনে করে সাহস পেলাম। তাদের মত সরিয়ান জন্তুদের মাথার মগজ এতই কম যে তারা কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। আমাকে হঠাৎ অদৃশ্য হতে দেখে নিশ্চয়ই এতক্ষণে সে অন্য কোন শিকারের সন্ধানে চলে গেছে।

গর্তের ধার পর্যন্ত উঠে বাইরে উঁকি দিলাম। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল আমার চোখে মুখে। তারাগুলো বিলীন হয়ে এসেছে, পরিষ্কার হয়ে আসছে আকাশ। ধীরে সন্তর্পণে উপরে উঠে গর্তের কিনারে কিছুক্ষণ বসে রইলাম, বিপদ

দেখলেই আবার ভিতরে নিরাপদ আশ্রয়ে লাফিয়ে পড়ব। দেখলাম একেবারে শান্ত স্থির পরিবেশ চারদিকে। প্রাণটা হাতের মুঠোয় নিয়ে সাহস করে আবার রওনা হলাম আমি ক্যাম্পের উদ্দেশে। কিছুদূর এগুতেই আমার বন্দুকটা পেলাম। ভয়ে চমকে বারবার পিছনে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চললাম আমি ফোর্ট চ্যালেঞ্জারের দিকে।

সকালের নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা রাইফেলের আওয়াজ আমাকে সঙ্গীদের কথা মনে করিয়ে দিল। থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু না, আর কোন শব্দ হলো না। ওদের কোন বিপদ হয়েছে ভেবে বিব্রত আর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। কিন্তু পরক্ষণেই একটা অতি সরল আর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম আমি। সকাল হয়ে গেছে, অথচ আমাকে ক্যাম্পে না দেখে জঙ্গলে পথ হারিয়েছি ধারণা করেই পথ নির্দেশ করতে গুলি ছুঁড়েছে ওরা। যদিও গুলি ছোঁড়ার বিষয়ে কঠিন হুঁশিয়ারি রয়েছে, তবু আমি বিপদে পড়েছি মনে করলে তাঁরা গুলি করতে মোটেও দ্বিধা করবেন না। পা চালিয়ে ফিরে চললাম।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আমি, শত চেষ্টা করেও আমার অগ্রগতি তেমন দ্রুত করতে পারছি না। এখন চেনা জায়গায় পৌঁছে গেছি, বামে টেরাড্যাকটিলের আস্তানা–সামনে ইগুয়েনোডন মাঠ। একসারি গাছ তার পরেই আমাদের ঘাঁটি। ওদের ভয় কাটানোর উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে উল্লাসের সঙ্গে চিৎকার করলাম আমি। কোন জবাব পেলাম না, অশুভ নীরবতায় বুকটা ধড়াস করে উঠল আমার। তাড়াহুড়া করে দৌড়াতে আরম্ভ করলাম, বেড়াটা যেমন দেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনি আছে–কিন্তু গেট খোলা! ভিতরে ঢুকে দেখলাম লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পড়ে আছে আমাদের সব জিনিস, আমার কমরেডরা কেউই নেই। নিভু নিভু আগুনের পাশে লাল রক্তে ভেসে রয়েছে কিছুটা ঘাস।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমার বুদ্ধি একেবারে লোপ পেল। পাগলের মত ক্যাম্পের আশেপাশে জঙ্গলে ছুটোছুটি করে খুঁজতে লাগলাম আমি। চিৎকার করে ডাকলাম কিন্তু কোন সাড়া এল না। হয়তো কোনদিনই আর তাঁদের দেখা পাব না। এই ভয়াবহ বিপজ্জনক জায়গায় সম্পূর্ণ একা আটকা পড়ে গেছি আমি ; নীচে নামার কোন পথ নেই। নানান চিন্তা আমাকে উন্মত্ত করে তুলল। নৈরাশ্যে মাথার চুল ছিঁড়ে মাথা ঠুকতে ইচ্ছা করছে। আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর চ্যালেঞ্জার, নিপুণ আর হাসিখুশি লর্ড রক্সটন–এঁদের উপর আমি যে কতখানি নির্ভরশীল ছিলাম তা নতুন করে উপলব্ধি করলাম এই মুহূর্তে। তাঁদের ছাড়া আমি অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া একটি শিশু–উপায়হীন, শক্তিহীন। কোন দিশা নেই কোথায় যাব, কি করব।

কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত হয়ে বসে থেকে আমার সঙ্গীদের হঠাৎ কি বিপদ হয়ে থাকতে পারে তা ভাবতে লাগলাম। লণ্ডভণ্ড অবস্থা দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে কোন ভয়াবহ আক্রমণ এসেছিল তাঁদের ওপর। আর তা এসেছিল সম্ভবত রাইফেলের শব্দ যে সময়ে শোনা গিয়েছে তখনই। মাত্র একটা গুলির শব্দ থেকে

প্রমাণিত হয় যে মুহূর্তেই হয়তো শেষ হয়ে গেছে সব ঘটনা। রাইফেলগুলো মাটিতে পড়ে আছে–জনের রাইফেলেই কেবল একটা খালি কার্তুজ পাওয়া গেল। সামারলী আর চ্যালেঞ্জারের কম্বল আগুনের পাশে, আক্রমণের সময়ে তাঁরা নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছিলেন। খাবারের প্যাকেট আর গুলির বাক্সগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে ক্যামেরা আর ক্যামেরার প্লেটের বাক্সের কাছে। এগুলো খোয়া না গেলেও খাবার যা বাইরে ছিল–বেশ কিছু পরিমাণ খাবার, সেগুলো সবই অদৃশ্য হয়েছে। তা হলে জন্তুর আক্রমণই হয়েছিল, স্থানীয় মানুষ হলে কিছুই রেখে যেত না।

কিন্তু জন্তুই যদি হবে তবে নিশ্চয়ই সবাইকে মেরে রেখে যেত, তা হলে আমার সঙ্গীদের কোন চিহ্ন নেই কেন? আগুনের ধারে জমাট বাঁধা রক্ত রক্তপাতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। রাতে আমাকে যেটা তাড়া করেছিল তেমন বিশাল জন্তুর পক্ষে মানুষকে মুখে করে টেনে নিয়ে যাওয়া বিড়ালের ইঁদুর নেয়ার মতই সোজা। তেমন কিছু ঘটে থাকলে অন্যান্য সঙ্গীরা পিছু নিত, কিন্তু রাইফেল নেয়নি কেন সাথে? যতই চিন্তা করছি ততই বেশি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই জট ছাড়াতে পারছি না।

ওদের সবাইকে খুঁজতে বেরিয়ে পথ হারিয়ে ফেললাম আমি। এক ঘণ্টা বিভিন্ন দিকে ঘুরে ভাগ্যের জোরে আবার পথ খুঁজে পেলাম। হঠাৎ জাম্বোর কথা মনে পড়তেই কিছুটা সান্ত্বনা পেলাম মনে, একেবারে একা নই আমি। পাহাড়ের গোড়াতেই বিশ্বস্ত জাম্বো অপেক্ষা করছে। পাহাড়ের ধারে গিয়ে নীচে -ঝুঁকে দেখলাম, আগুন জ্বেলে কম্বল বিছিয়ে ঠিকই বসে আগুন পোহাচ্ছে জাম্বো। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম ওর পাশে আরও একজন লোক বসে আছে। আমার সঙ্গীরা নীচে নামার পথ খুঁজে পেয়েছেন মনে করে খুশি হয়ে উঠলাম–কিন্তু ভাল করে লক্ষ করতে ভুল ভাঙল আমার; লোকটা ইণ্ডিয়ান। চিৎকার করে ডেকে রুমাল নাড়লাম আমি। সাথে সাথেই উপরের দিকে চাইল জাম্বো। অল্পক্ষণ পরেই ওদিকের পাহাড়ের মাথায় দেখা গেল ওকে। একেবারে কিনারে দাঁড়িয়ে গভীর বেদনার সাথে পুরো ঘটনা শুনল সে।

'মাসসা (মিস্টার) মালোন, জিন-ভূতের পাল্লায় পড়েছেন আপনারা সবাই,' জাম্বো গম্ভীর মুখে বলল। 'অভিশপ্ত দেশে গিয়ে পড়েছেন আপনি, সাহ্ (সার), এখনও আমার কথা শুনুন, জলদি নেমে আসুন, নইলে আপনিও শেষ হবেন।'

'কিন্তু কি করে নামব, জাম্বো?'

'লতা জোগাড় করে এপারে ছুঁড়ে দেন, আমি গুঁড়ির সাথে বেঁধে দেব, মাস্‌সা মালোন। আপনার পুল হয়ে যাবে।'

'সে কথা আমরাও ভেবেছি, কিন্তু এদিকে তেমন কোন শক্ত লতা নেই যে আমাদের ভার বইতে পারবে।'

'তা হলে দড়ির জন্যে লোক পাঠান, মাস্‌সা মালোন।'

'কাকে পাঠাব, আর কোথায়ই বা পাঠাব?'

'ইণ্ডিয়ান গ্রামে পাঠান, সাহ্। অনেক চামড়ার দড়ি আছে ওখানে। নীচের ইণ্ডিয়ানকে পাঠান।'

'কে ও?'

'আমাদের দলেরই একজন। অন্যেরা ওকে মেরে পিটিয়ে ওর টাকা পয়সা সব কেড়ে নিয়েছে, তাই আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছে ও। চিঠি নিতে, দড়ি আনতে বা যে কোন কিছু করতেই সে প্রস্তুত।'

চিঠি–অবশ্যই! হয়তো সে সাহায্য নিয়ে আসতে পারবে। যাই হোক, অন্তত চিঠিটা পৌঁছলেও বিজ্ঞানের খাতিরে মৃত্যু বরণ সার্থক হবে আমাদের। চিঠিটা যেভাবেই হোক পৌঁছানো দরকার লণ্ডনে। বেশ কিছু আমার লেখাই আছে, আজ সারাদিনে আমার বাকি অভিজ্ঞতা লিখে শেষ করতে পারব। সন্ধ্যায় জাম্বোকে আবার উপরে আসার আদেশ দিলাম।

সারাদিন একা একা চিঠি লেখার কাজেই কাটল আমার। যে কোন সাধারণ ব্যবসায়ী বা একজন ক্যাপ্টেনকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আরও একটা চিঠি লিখলাম আমি। তাতে রইল দড়ি আর সাহায্য পাঠানোর অনুরোধ। সন্ধ্যায় সব কাগজ পত্র ছুঁড়ে পৌঁছে দিলাম জাম্বোর কাছে, সেই সাথে আমার টাকার থলিটাও। তিনটা মোহর ছিল ওতে, ওগুলো ইণ্ডিয়ান লোকটার পারিশ্রমিক। বলা হলো দড়ি নিয়ে ফিরতে পারলে এর দুই গুণ টাকা ওকে দেয়া হবে।

বারো

ঠিক সূর্যাস্তের সময়ে সেই বিষাদময় সন্ধ্যায় ইণ্ডিয়ান লোকটার আকৃতি দেখা গেল ওই বিশাল সমভূমিটার উপর। চেয়ে চেয়ে দেখলাম ওকে যতক্ষণ দেখা যায়। আমার উদ্ধার পাবার শেষ ভরসা হচ্ছে ওই লোকটা।

বিধ্বস্ত ক্যাম্পে ফিরতে বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। ফেরার আগে জাম্বোর জ্বালানো লাল আগুনটা শেষবারের মত আর একবার দেখে নিলাম। নীচের জগতে ওই একটাই মাত্র আলো–জাম্বোর বিশ্বস্ত উপস্থিতি, ঠিক ওই আলোর মতই আমার মনের বিষণ্ন ছায়া বিতাড়িত করেছে।

এতবড় একটা শোকার্ত দুর্ঘটনার আঘাতের পরেও এইটুকুই আমার সান্ত্বনা যে পৃথিবী জানবে আমরা কি করেছি। আমাদের দেহের সাথে নামটাও মুছে যাবে না, উজ্জ্বল অক্ষরে ইতিহাসে লেখা থাকবে আমাদের সংগ্রামের কথা।

একা একা ক্যাম্পে ঘুমানো সত্যিই দুঃসাহসিক কাজ–ভাবাই যায় না। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটানো তার চেয়েও ভয়ানক। আমার সহজাত বুদ্ধি বলছে

সজাগ পাহারায় থাকা উচিত কিন্তু ক্লান্ত শরীরে কুলাচ্ছে না। বিশাল জিঙ্কো গাছে চড়ে বসলাম আমি। কিন্তু মসৃণ গোল ডালপালার মাঝে নিরাপদ কোন জায়গা খুঁজে পেলাম না। একটু ঝিমানি এলেই নির্ঘাত পড়ে গিয়ে ঘাড় ভাঙবে। নেমে ভাবতে লাগলাম এখন আমার কি করা উচিত। শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পের গেট বন্ধ করে ত্রিভুজের আকারে তিনটা আলাদা আগুন জ্বেলে, পেট পুরে খেয়ে নিয়ে, গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙল কারও হাতের ছোঁয়ায়। চোখ মেলে আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম আমি, হাঁটু গেড়ে লর্ড জন বসে আছেন আমার পাশে!

জনই–তবে জন বলে চেনা যায় না। সেই ফিটফাট বাবু আর নেই তিনি। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখ উদভ্রান্ত। মুখে আঁচড়ের দাগ, বেশ হাঁপাচ্ছেন, কাপড় শতচ্ছিন্ন, টুপি নেই মাথায়। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম আমি। আমাকে প্রশ্ন করার কোন সুযোগ দিলেন না জন, কথা বলতে বলতেই দরকারী জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন তিনি।

'জলদি করো,' বললেন জন, 'সময় নেই, প্রত্যেকটা মুহূর্ত এখন অত্যন্ত মূল্যবান। দুটো রাইফেল নাও তুমি, বাকি দুটো আমি নিচ্ছি। কয়েক টিন খাবার আর পকেট বোঝাই করে গুলি নাও। কথা বলে বা মিছে ভেবে সময় নষ্ট কোরো না, একটু দেরি হলেই আমরা শেষ।'

কোন কিছু না বুঝেই তাড়াহুড়া করে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে জনের পিছনে পিছনে ছুটলাম আমি। দুই বগলে দুটো রাইফেল আর দু'হাতে বিভিন্ন ধরনের খাবার। ঘন লতাপাতার ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা ঝাঁকড়া ঝোপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে টেনে পাশে শুইয়ে দিলেন জন।

'এইবার মনে হয় আমরা নিরাপদ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন জন। 'ওরা অবধারিত ভাবে সোজা ক্যাম্পেই খুঁজতে যাবে আমাদের।'

একটু দম ফিরে পেতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘটনা কি? প্রফেসররাই বা কোথায় আর কারাই বা ধাওয়া করছে আমাদের?'

'বনমানুষ,' বললেন জন, 'খোদা জানেন কি নিষ্ঠুর জানোয়ার ওরা। সাবধান, ভুলেও চড়া গলায় কথা বোলো না, ওরা অনেক দূর থেকে দেখতে আর শুনতে পায়। তবে ওদের নাক তেমন তীক্ষ্ণ নয়, ঘ্রাণ শুঁকে খুঁজে বের করতে পারবে বলে মনে হয় না। তা তুমি ছিলে কোথায়?'

সংক্ষেপে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম।

'খুব খারাপ,' ডাইনোসরের আর গর্তের বর্ণনা শুনে মন্তব্য করলেন জন। 'এই জায়গাটা ঠিক অবসর বিনোদনের উপযোগী নয়–কি বলো? এদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। একবার মানুষখেকো পাপুয়ানদের হাতে পড়েছিলাম আমি কিন্তু এদের কাছে ওরা নস্যি।'

'কি হয়েছিল?' জানতে চাইলাম আমি।

'প্রায় ভোর বেলা, প্রফেসর দু'জন মাত্র ওঠার প্রস্তুতিতে এপাশ ওপাশ করছেন, হঠাৎ বৃষ্টির মত পাতার ভিতর থেকে আবির্ভাব হলো বনমানুষের। ঝাঁকে ঝাঁকে গাছ থেকে নামতে লাগল ওরা। একটাকে পেটে গুলি করলাম আমি, কিন্তু আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের চিৎ করে ফেলে লতা দিয়ে বেঁধে ফেলল ওরা। বনমানুষ বলছি বটে কিন্তু ওদের হাতে ছিল মুগুর আর পাথর। নিজেদের মধ্যে কিচিরমিচির করে কথা বলতে বলতে শক্ত করে বাঁধল আমাদের। আহত সঙ্গীকে তুলে নিয়ে গেল ওরা। শুয়োরের মত গলগল করে রক্ত পড়ছিল ওর পেট থেকে। ওরা এরপর আমাদের সবাইকে ঘিরে বসল, ওদের সবার মুখে হত্যার ছাপ। মানুষেরই সমান উঁচু হবে আকারে, কিন্তু দেহে অসুরের শক্তি।'

একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন জন, 'ওরা আমাদের চারপাশে ঘিরে বসে আগ্রহ ভরে কেবল চেয়ে রইল আমাদের দিকে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার পর্যন্ত চুপসে গেলেন। কোনমতে ধস্তাধস্তি করে উঠে দাঁড়িয়ে বকাবকি গালাগালি আরম্ভ করলেন তিনি। চিৎকার করে জলদি কাজ সারতে বললেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হয়তো মাথা বিগড়ে গেছিল তাঁর, অকথ্য ভাষায় পাগলের মত বকাবাজি করলেন।'

'তা ওরা কি করল?' অবাক বিস্ময়ে জনের কথা শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করলাম আমি। ফিসফিস করে আমাকে কানে কানে গল্প শোনাতে শোনাতেও চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন জন। শক্ত হাতে তাঁর রাইফেলটা ধরা রয়েছে।

'আমি ভেবেছিলাম বুঝি আমাদের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। কিন্তু ওদের মতলব দেখা গেল অন্য রকম। শুনলে না হেসে থাকতে পারবে না তুমি, কিন্তু বিশ্বাস করো ওরা নিকটাত্মীয়ও হতে পারত। নিজের চোখে না দেখলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না। ওদের যে বুড়ো নেতা সে দেখতে হুবহু চ্যালেঞ্জারের লাল সংস্করণ। খাটো শরীর, চওড়া কাঁধ, গোল বুক-গলা নেই। লালচে একগুচ্ছ দাড়ি। ঘন ভুরু, আর "ব্যাটা-কি-চাস?" এমন একটা ভাব তার চোখে। চ্যালেঞ্জারের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধে থাবা রাখল চীফ। সামারলী হিস্ট্রিরিয়াগ্রস্ত হয়ে হাসতে হাসতে কেঁদে ফেললেন। চীফও খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল। এরপরেই কাজে লেগে গেল ওরা। আমাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। আমাদের রাইফেল ওরা ছুঁয়েও দেখল না, কেবল যা খাবার বাইরে বের করা ছিল তা সবটাই নিয়ে গেল। পথে সামারলীকে আর আমাকে খুব রুক্ষভাবেই পরিচালিত করল ওরা। আমার ছেঁড়া জামা কাপড় তারই সাক্ষী। চ্যালেঞ্জার বেশ ভালই ছিলেন-চারজনে তাঁকে কাঁধে তুলে রোমান রাজার মত সসম্মানে বয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু ওটা কি?'

করতালের মত অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল বেশ দূর থেকে।

'ওই যে যাচ্ছে ওরা,' ডাবল ব্যারেলে এক্সপ্রেসে কার্তুজ ভরতে ভরতে বললেন জন। 'সব ক'টা রাইফেল ভরে ফেল, জীবিত অবস্থায় আমরা ধরা দেব না কিছুতেই। খুব উত্তেজিত হলে ওরা ওই শব্দ করে। এখনও শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, অনেক দূরে।'

'ওই কয়জনে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না। অমন অনেক কয়টা দলই আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে জঙ্গলের চারদিকে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ওরা আমাদের নিয়ে গেল ওদের মহল্লায়। প্রায় হাজার খানেক ঘর, চূড়ার ধারে বড় বড় গাছের সারির মধ্যে ডাল পাতা দিয়ে তৈরি। জংলী জানোয়ারগুলো আমার সারা শরীর আঙুল দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছে। মনে হচ্ছে আমার চামড়া আর কোনদিনও পরিচ্ছন্ন হবে না। আমাকে যে বেঁধেছিল সে ব্যাটা বাঁধতে জানে। গাছের তলায় চিৎ হয়ে পড়ে রইলাম আমরা, একজন মুগুর হাতে পাহারায় রইল। আমরা মানে সামারলী আর আমি, কেননা চ্যালেঞ্জার একটা গাছের উপরে বসে খাওয়া দাওয়া আর আনন্দে ব্যস্ত। তবে কিছু ফল আমাদের কাছেও পৌছাতে পেরেছিলেন তিনি। নিজের হাতে আমাদের বাঁধনও একটু ঢিলা করেছিলেন এক ফাঁকে। তুমি যদি তখন দেখতে তাঁকে, গাছের উপর জমজ ভাইয়ের সাথে যে সে কি হাসাহাসি আর গলা ছেড়ে গান। যে কোনরকম গানই বনমানুষদের খোশ মেজাজে রাখে বোঝা গেল। কিন্তু চ্যালেঞ্জারকে খেয়াল খুশিমত অনেক কিছু করতে দিলেও আমাদের ব্যাপারে কোন খাতির করল না ওরা।'

'তারপর কি হলো?'

'বলছি, এবার তোমাকে যা বলব তা শুনে সত্যিই অবাক হবে। তুমি না বলছিলে এখানে মানুষের অস্তিত্বের কিছু কিছু প্রমাণ পেয়েছ?'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম।

'বেচারারা গড়নে বেশ খাট। যতদূর বোঝা গেল মালভূমিটার একদিক মানুষের আর অন্যদিক বনমানুষের দখলে আছে। ওদের মধ্যে সবসময়ে যুদ্ধ লেগে রয়েছে। গতকাল বনমানুষেরা ডজন খানেক মানুষ বন্দী করে এনেছিল। কামড়ে খামচে এমন অবস্থা করেছে ঠিক মত দাঁড়াতেও পারছিল না ওরা। দু'জনকে বনমানুষেরা ওখানেই হত্যা করল, একটা চিৎকার করারও সুযোগ পায়নি তারা। ঘটনা দেখে আমরা অসুস্থ বোধ করলাম, সামারলী জ্ঞান হারালেন। চ্যালেঞ্জারও সহ্যের একেবারে শেষ সীমায় পৌছলেন।—মনে হয় ওরা চলে গেছে, কি বলো?'

বেশ মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করলাম আমরা। পাখির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ জঙ্গলের শান্তি ভঙ্গ করছে না। জন আবার তাঁর গল্প বলে চললেন;

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছ তুমি। ওই মানুষগুলো ধরা পড়ায় তোমার কথা ওরা একদম ভুলে গেছে। নইলে অবশ্যই তোমার জন্যে আবার ক্যাম্পে আসত ওরা। গাছ থেকে ঠিকই আমাদের উপর নজর রেখেছিল ওরা প্রথম থেকেই। আর ভাল করেই জানত যে সংখ্যায় আমরা একজন কম। পাহাড়ের নীচে ওই বেতগুলোর কথা মনে আছে তোমার, যেখানে আমেরিকান লোকটির কঙ্কাল পেয়েছিলাম আমরা? বনমানুষদের শহরের ঠিক নীচেই ওটা। সবকিছুই যেন একটা দুঃস্বপ্নের

মত লাগছে, খুঁজলে আরও অনেক কঙ্কাল পাওয়া যাবে ওখানে। চূড়ার ধারে ফাঁকা জায়গাটা থেকে বন্দীদের এক এক করে নীচে লাফিয়ে পড়তে হয়। সবই করা হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। কে সরাসরি নীচে পড়ে ছাতু হলো আর কে বেতে বিঁধে মরল এটা দেখাই তাদের আসল মজা। আমাদেরও দেখাতে নিয়ে গেছিল ওরা। পুরো বনমানুষের দল সারি বেঁধে ধারের কাছে দাঁড়াল, মহা উত্তেজনা। চারজন মানুষকে লাফিয়ে পড়তে হলো নীচে। উল বোনার কাঁটা যেমন সহজে মাখনের মধ্যে ঢুকে যায় ঠিক তেমনি বেতের কাঁটায় বিঁধে গেল ওরা। অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য, অবাক বিস্ময়ে শুধু চেয়ে দেখলাম ওদের ঝাঁপিয়ে পড়া। অবশ্য এটাও জানা কথা যে আমাদের কপালে ওই একই দুর্ভোগ আছে।

'ওরা ছয়জন ইণ্ডিয়ানকে আজকের জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছে বলেই আমার ধারণা। আমাদের রেখেছে ওরা ওদের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শিল্পী হিসাবে–সবার শেষে বলি দেবে আমাদের। চ্যালেঞ্জার হয়তো মাফ পেতেও পারেন, কিন্তু সামারলী আর আমার রেহাই নেই। ওদের ভাষা অঙ্গভঙ্গী প্রধান, তাই ওদের ইঙ্গিত বুঝে নিতে খুব অসুবিধা হয়নি আমার। যে কোন উপায়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতে হবে এবার। চিন্তা করে দেখলাম সবটা নির্ভর করছে আমারই উপর, সামারলী ধরতে গেলে অকেজো আর চ্যালেঞ্জারও খুব একটা সাহায্যে আসবেন না। দুই প্রফেসর একবারই একত্র হয়েছিলেন, তখন তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, যে বনমানুষগুলো আমাদের ধরে এনেছে তারা কোন্ শ্রেণীর? একজন বলেন যে ওরা জাভার ড্রাইওপিথেকাস আর অন্যজনের মতে ওরা পিথেক্যানথ্রোপাস। বলো তো পাগলামি ছাড়া আর কি? বদ্ধ পাগল–দু'জনেই।

'এদের বিষয়ে দু'একটা ব্যাপার বেশ খুঁটিয়ে লক্ষ করেছি আমি। একটা হচ্ছে এরা খোলা জায়গায় মানুষের মত জোরে ছুটতে পারে না। ছোট ছোট বাঁকা পা ওদের, সেই সাথে ভারী শরীর। এমনকী চ্যালেঞ্জারও প্রতি একশো গজে ওদের কয়েক গজ পিছিয়ে ফেলতে পারবেন।

'আর একটা ব্যাপার, ওরা আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। ওরা বুঝতেই পারেনি আমি যাকে গুলি করেছি সে কীভাবে আহত হলো। ভাবলাম, আমি যদি কোনমতে রাইফেলগুলো হাতে পাই হয়তো কিছু করতে পারব।

'আজ ভোরে আমার প্রহরীর পেটে লাথি মেরে চিৎ করে ফেলেই পালাই আমি। ছুটে চলে এসেছি ক্যাম্পে। ওখানে তোমার দেখা পেলাম–এইবার আমাদের হাতে আছে রাইফেল।'

'কিন্তু প্রফেসরদের কি হবে?' আমি উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

'তাঁদের উদ্ধার করে আনতে হবে আমাদের। আমার পক্ষে প্রফেসরদের সাথে নিয়ে আসা অসম্ভব ছিল। চ্যালেঞ্জার ছিলেন গাছের উপরে আর সামারলীর পক্ষে এতদূর ছুটে পালানো সম্ভব নয়। আমাদের একমাত্র উপায় রাইফেল নিয়ে

উদ্ধারের চেষ্টা করা। অবশ্য প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ওরা প্রফেসর দু'জনকে সাথে সাথেই মেরে থাকতে পারে। চ্যালেঞ্জারকে কিছু না করলেও সামারলীর বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। তাঁকে এমনিতেও মারতই ওরা, কাজেই আমি পালিয়ে এমন বিশেষ কোনো বিপদ ডেকে আনিনি। কিন্তু তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টায় ফিরে যাওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। যদি না পারি তাঁদের সাথেই একত্রে মৃত্যুবরণ করব। সুতরাং মনস্থির করে নাও, সন্ধ্যার আগেই ভাগ্য নির্ধারিত হবে আমাদের।'

উপরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লর্ড রক্সটনের ছোট ছোট জোরাল বাক্যে কথা বলার ভঙ্গি নকল করার চেষ্টা করেছি। তাঁর আধা রসাত্মক বেপরোয়া ধরনের স্বরের পুরোপুরি প্রভাব রয়েছে তাঁর সংলাপে। একটা আজন্ম নেতা তিনি। বিপদ যতই ঘনীভূত হতে থাকে তাঁর কথাও তত দ্রুত হয়। স্থির, অচঞ্চল চোখ দুটোতে অস্বাভাবিক জ্যোতি দেখা দেয়, আর তাঁর ডন কুয়োতের মত গোঁফ উত্তেজনার আনন্দে খাড়া হয়ে ওঠে। বিপজ্জনক কাজে তাঁর আসক্তি, তাঁর অভিযানের নাটকীয়তা, তাঁর উদ্যম এ ধরনের কঠিন মুহূর্তে তাঁকে একজন কাম্য সঙ্গী করে তোলে। আমরা গোপন আশ্রয় থেকে মাত্র বের হতে যাব এমন সময় জন হাত দিয়ে আমার কনুই চেপে ধরলেন।

'সর্বনাশ,' ফিসফিস করে বললেন জন, 'ওরা ফিরে আসছে!'

আমরা যেখানে লুকিয়ে ছিলাম সেখান থেকে একটা পিঙ্গল উঠানের মত জমি দেখা যাচ্ছে। সবুজ পাতায় ছাওয়া গাছের গুঁড়ির সারি একটার পর একটা। ওই পথ ধরে বনমানুষের একটা দল পার হচ্ছে। এক সারিতে এগুচ্ছে ওরা। বাঁকা পা আর কুঁজো কাঁধ, মাঝে মাঝে হাত মাটিতে ঠেকছে। কুঁজো হয়ে চলার কারণে যদিও ছোট দেখাচ্ছে ওদের, তবু লম্বায় ওরা পাঁচ ফুটের কম হবে না আন্দাজ করলাম আমি। অধিকাংশের হাতেই লাঠি বা মুগুর। দূর থেকে রোমশ বিকৃত মানুষের মত লাগছে দেখতে। মুহূর্তের জন্যে পরিষ্কার দেখলাম, কিন্তু তার পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

'এখনও সময় হয়নি,' বললেন জন, 'ওদের খোঁজাখুঁজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ঘাপটি মেরে বসে থাকতে হবে। ঘণ্টা খানেক পরে আমরা রওনা হব ওদের শহরের দিকে।'

একটা খাবারের টিন খুলে সকালের নাস্তা সারতে কিছুটা সময় কাটল আমাদের। জন গতকাল সকাল থেকে এ পর্যন্ত কয়েকটা ফল ছাড়া আর কিছুই খাননি। বুভুক্ষের মত খেলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত পকেট ভর্তি গুলি আর দু'হাতে দুটো করে রাইফেল নিয়ে রওনা হলাম আমরা। যাবার আগে আমাদের আস্তানা চিহ্নিত করে গেলাম, দরকার বোধে ভবিষ্যতে ব্যবহার করব। চলতে চলতে আমাদের পুরানো ক্যাম্পের খুব কাছে হাজির হলাম। এখানে একটু থামলাম আমরা, জন তাঁর মতলব কিছুটা খুলে বললেন আমার কাছে।

'যতক্ষণ আমরা বড় বড় মোটা গাছের জঙ্গলে আছি ততক্ষণ ওরা আমাদের কর্তা, আমরা ওদের দেখতে না পেলেও ওরা আমাদের ঠিকই দেখবে। কিন্তু খোলা জায়গায় তা নয়; সেখানে ওদের আমরা দেখতেও পাব আর ওদের চেয়ে জোরে ছুটতেও পারব। তাই যতদূর সম্ভব খোলা জায়গা দিয়ে এগুতে হবে আমাদের। চূড়ার ধার ধরেই যাব আমরা, যেদিকে বড় গাছের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। চোখ কান খোলা, আর রাইফেল তৈরি রেখে ধীরে ধীরে এগুতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা–রাইফেলে একটা গুলি থাকতেও আমাদের ধরা দেয়া চলবে না।'

ধারের কাছে পৌঁছে নীচে উঁকি দিয়ে দেখলাম একটা পাথরের উপর বসে তামাক খাচ্ছে জাম্বো। খুব ইচ্ছা করল ওকে ডেকে আমাদের বর্তমান অবস্থার কথা খুলে বলি। কিন্তু অতি বিপজ্জনক কাজ হবে সেটা। জঙ্গলে গিজগিজ করছে বনমানুষ। বারবার আমরা ওদের ক্ল্যাপস্টিকের শব্দ শুনছি আর লাফিয়ে পড়ছি ঘন ঝোপের ভিতরে। শব্দ না মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত চুপচাপ পড়ে থাকছি। খুবই ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম আমরা। প্রায় দু'ঘণ্টা চলার পরে লর্ড জনের খুব বেশি সতর্ক চলাফেরায় বুঝলাম যে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা। হাতের ইশারায় আমাকে চুপ করে শুয়ে থাকতে বলে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন জন। কিন্তু মাত্র এক মিনিট পরেই ফিরে এলেন আবার, তাঁর চোখে মুখে উত্তেজনা।

'শিগ্‌গির এসো,' জন ফিসফিস করে বললেন, 'আমাদের বেশি দেরি না হয়ে থাকলেই রক্ষা।'

উত্তেজনায় সারা দেহ থরথর করে কাঁপছে আমার। কনুইয়ে ভর করে এগিয়ে জনের পাশে চলে এলাম আমি। ঝোপের ফাঁক দিয়ে সামনের খোলা জায়গাটা চোখে পড়ল।

এমন অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য দৃশ্য আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আর কেউ না হোক, অন্তত আমার পাশে শোয়া লোকটি জানেন যে আমি মিথ্যা বলছি না। যদি বেঁচে থাকি তা হলে কোনদিন স্যাভেজ ক্লাবের ভিন্ন পরিবেশে বসে একদিন হয়তো এই দুঃস্বপ্নের মত ঘটনা বিশ্বাস করা আমার নিজের পক্ষেই কঠিন হবে।

চওড়া একটা খোলা জায়গা আমাদের সামনে, পাশে কয়েকশো ফুট হবে। সবুজ ঘাস আর ছোট ছোট গুল্মলতা দেখা যাচ্ছে চূড়ার ধারে। ফাঁকা জায়গাটার শেষে অর্ধবৃত্তাকার বড় বড় গাছের সারি। সেগুলোর মোটা ডালের থাকে থাকে লতাপাতার ঘর–ঘর না বলে খোপ বললেই হয়তো বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। প্রতিটি ঝুপড়ি এক একটা ছোট্ট বাসা। গাছে বোঝাই বনমানুষ, সবারই মনোযোগ একই দিকে, সেদিকে চেয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

খোলা জায়গায় চূড়ার কিনার ঘেঁষে কয়েকশো লাল চুলওয়ালা বনমানুষ জড়

হয়েছে। ওদের মধ্যে কয়েকটা সত্যিই বিশাল, আর প্রত্যেকেই বীভৎস দেখতে। এক ধরনের শৃঙ্খলা রয়েছে ওদের মধ্যে, সারি ভাঙছে না কেউ। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইণ্ডিয়ানদের একটা ছোট দল; ছোটখাট, পরিচ্ছন্ন, লাল মানুষগুলো। উজ্জ্বল সূর্যের আলো ওদের গায়ে পড়ে পালিশ করা ব্রোঞ্জের মত ঝকঝক করছে। একজন লম্বা চিকন সাদা চামড়ার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ওদের পাশে, মাথা নিচু, হাত ভাঁজ করা। তার ভঙ্গিতে হতাশা ভীতি, আর বিষণ্নতা ফুটে উঠেছে। নিঃসন্দেহে, চোখা চেহারার লোকটিই হচ্ছেন প্রফেসর সামারলী।

বিধ্বস্ত বন্দী দলটার আশেপাশে কয়েকজন বনমানুষ পাহারায় রয়েছে। কারও পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সবার থেকে একটু দূরে ডান দিকে একেবারে কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে দুটো অদ্ভুত আকৃতি, এতই অস্বাভাবিক যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারল না। একজন আমাদের সঙ্গী প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। তাঁর কোটের কিছুটা অংশ তখনও কাঁধে ঝুলছে, কিন্তু ভিতরের শার্ট পুরোটাই ছিঁড়ে নামানো হয়েছে। তাঁর কালো দাড়ি আর বুকের কালো লোম মিশে একাকার হয়ে গেছে। মাথায় হ্যাটটা নেই, গত কয় মাসে তাঁর চুলও বেশ বড় হয়েছে, হাওয়ায় উড়ছে তা। একদিনের বিশৃঙ্খলাই তাঁকে শ্রেষ্ঠ সভ্য মানুষ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার বেপরোয়া জংলী মানুষে পরিণত করেছে। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বনমানুষদের রাজা এবং চীফ।

লর্ড জন ভুল বলেননি, দু'জন হুবহু একই রকমের দেখতে, কেবল চামড়ার রঙের একটু যা তফাৎ। একই রকম খাটো ভারী চেহারা, চওড়া কাঁধ, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হাত। এমনকী দাড়িও একই ভাবে বুকের লোমের সাথে মিশেছে। ভুরু আর বনমানুষটার চ্যাপটা মাথাই কেবল আর একটু বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

বলতে এত সময় লাগলেও কয়েক সেকেণ্ডের ঘটনা এটা। আমাদের মাথায় এখন একটাই চিন্তা–যুদ্ধে নামতে হবে। দুটো বনমানুষ একজন ইণ্ডিয়ানকে ধরে টেনে নিয়ে গেল ক্লিফের ধারে। ওদের রাজা হাত উঠিয়ে সম্মতি জানাল। লোকটার হাত আর পা ধরে চ্যাংদোলা করে তিনবার সামনে পিছনে দুলিয়ে ছুঁড়ে দিল ওরা সামনের দিকে। এত জোরে ছুঁড়ল যে নীচে নামতে আরম্ভ করার আগে প্রথমে তার দেহটা উপরে উঠে গেল। মানুষটা অদৃশ্য হবার সাথে সাথেই প্রহরী ছাড়া আর সবাই চূড়ার ধারে ছুটে গেল। কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপরই বনমানুষদের উল্লসিত সমবেত চিৎকার। রোমশ হাত শূন্যে তুলে খুশিতে উন্মত্ত হয়ে নাচল কিছুক্ষণ, তারপর আবার পিছিয়ে এল চূড়ার ধার থেকে। এখন দ্বিতীয় বলির অপেক্ষা।

এইবার সামারলী! দু'জন প্রহরী তাঁকে কব্জি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল সামনে। তাঁর ক্ষীণ দেহ প্রতিবাদে কেবল অসহায় মুরগীর মত ঝাপটাল কিছুক্ষণ। চ্যালেঞ্জার হাত নেড়ে রাজার কাছে অনেক অনুরোধ, অনেক অনুনয় বিনয় করলেন সঙ্গীর প্রাণ রক্ষার জন্যে, কিন্তু সবই বৃথা হলো। ধাক্কা মেরে চ্যালেঞ্জারকে সরিয়ে

দিয়ে মাথা নাড়ল সে; অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত।

লর্ড জনের রাইফেল গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জারের পাশে বনমানুষের চীফ লাল রক্তে ভেসে লুটিয়ে পড়ল। 'গুলি চালাও, ওই ঝাঁকের মধ্যে গুলি চালাও!' চিৎকার করে বললেন জন।

অনেকের মনেই একটা দুর্বল জায়গা থাকে, আহত খরগোশের আর্ত চিৎকারে অনেকবার আমার চোখে পানি এসেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে রক্ত পিপাসা যেন আমাকে পেয়ে বসেছে। যন্ত্রচালিতের মত একের পর এক ম্যাগাজিন খালি করতে লাগলাম আমি। খুনের নেশায় রক্ত টগবগ করে ফুটছে আমার। দু'জনের চারটা রাইফেল দিয়ে ওদের উপর বিপর্যয় ঘনিয়ে আনলাম। সামারলীকে যে দু'জন ধরেছিল তারা ভূপাতিত হলো; সামারলী মাতালের মত টলতে টলতে ঘুরতে লাগলেন বিস্ময়ে। এখনও ভাবতেই পারছেন না যে তিনি সত্যিই মুক্ত। বনমানুষেরা বিশৃঙ্খল ভাবে ছুটোছুটি করছে। তারা বুঝতেই পারছে না এত শব্দ কোথা থেকে আসছে, আর তারা মরেই বা যাচ্ছে কেন। বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি আরম্ভ করল ওরা। হঠাৎ সহজাত প্রবৃত্তির বশেই বাকি সবাই গাছের আড়ালে আশ্রয়ের জন্যে ছুটল। বন্দী সবাই ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে, এখন আর কোন প্রহরী নেই।

প্রথমে চ্যালেঞ্জারই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি সামারলীকে কনুই ধরে টেনে নিয়ে ছুটে এলেন আমাদের দিকে। দু'জন প্রহরী তাঁদের পিছনে ধাওয়া করল, কিন্তু জনের দুই বুলেট দু'টোকেই ধরাশায়ী করল। আমরা একটু এগিয়ে আমাদের সঙ্গীদের সম্বর্ধনা জানালাম; সেই সাথে একটা করে গুলি ভরা রাইফেল তাঁদের হাতে ধরিয়ে দিলাম। সামারলীকে অত্যন্ত ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত মনে হলো, ভাল করে হাঁটতেও পারছেন না তিনি।

ওদিকে বনমানুষগুলো কিছুটা ভয় কাটিয়ে উঠে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমাদের ফিরতে বাধা দেবার চেষ্টা করল ওরা। চ্যালেঞ্জার আর আমি সামারলীকে ধরে নিয়ে ছুটলাম। জন রাইফেল দিয়ে একের পর এক অব্যর্থ গুলি চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রায় একমাইল পর্যন্ত ওরা আমাদের পিছু পিছু এসেছিল, পরে ক্রমে ওদের চাপ হালকা হয়ে এল; আমাদের রাইফেলের নির্ভুল নিশানা ওরা উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই মনে হলো। ক্যাম্পে পৌঁছানোর পরে নিশ্চিন্ত হলাম আর কেউ তাড়া করছে না আমাদের।

সবাই তাই মনে করেছিলাম, কিন্তু একটু পরেই বুঝলাম যে আমরা ভুল করেছি। ক্যাম্পের গেট বন্ধ করে আমরা নিজেদের মধ্যে হাত মিলিয়েও সারতে পারিনি, হঠাৎ শুনলাম বাইরে পায়ের শব্দ, সেই সাথে মৃদু কান্নার ধ্বনি।

রাইফেল হাতে লর্ড জন এগিয়ে গেলেন সামনে, একটানে গেটটা খুলে ফেললেন। চারজন ইণ্ডিয়ান বন্দীকে দেখা গেল বাইরে মাটিতে লুটাচ্ছে। আমাদের শক্তি দেখে ভীত, কিন্তু সাহায্যপ্রার্থী। হাতের ইশারায় একজন বুঝিয়ে

দিল যে চতুর্দিকে বিপদ। তারপর সামনে এগিয়ে এসে সে লর্ড জনের পা চেপে ধরল, তার মাথা জনের পায়ের উপর।

'হায় খোদা,' বলে উঠলেন জন, 'এদের নিয়ে এখন কি করি? উঠে দাঁড়াও পা ছাড়ো।'

সামারলী তাঁর পাইপে তামাক ভরায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বললেন, 'ওদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের সবাইকেই তোমরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছ। ঘটনাটা এখনও ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না, তবে তোমরা খেলা একটা দেখিয়েছ বটে!'

'প্রশংসনীয়,' বললেন চ্যালেঞ্জার, 'সত্যিই প্রশংসনীয়। শুধু আমরাই নই, বিজ্ঞান জগৎ তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আমার আর প্রফেসর সামারলীর অন্তর্ধানে নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় প্রাণী বিজ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হত। জন আর আমাদের তরুণ সঙ্গী চমৎকার কাজ করেছে, অস্বীকার করব না।'

পিতৃসুলভ প্রশান্ত হাসিতে আমাদের উদ্ভাসিত করলেন তিনি। কিন্তু তাঁর ছেঁড়া কাপড়, বিপর্যস্ত অবস্থা আর সেই সাথে অবিন্যস্ত চুল দেখে এই মুহূর্তে সমাজ তাঁকে গ্রহণ করত কিনা সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। চ্যালেঞ্জার একটা অস্ট্রেলিয়ান মাংসের টিন তাঁর দুই হাঁটুর ফাঁকে ধরলেন, ইণ্ডিয়ানটা তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই আবার গিয়ে জনের পায়ে পড়ল।

'আপনার আকৃতি ঠিক স্বীকার করে নিতে পারছে না বেচারা, অহেতুক ভয় পাচ্ছে। এজন্যে অবশ্য দোষ দেয়া যায় না ওকে, বেচারা তো আমাদের মতই একজন মানুষ–ছোট্ট মানুষ!'

'বটে!' রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। 'বটে!'

'আপনার চেহারাটা ওই চীফের মত না হলে ভিন্ন কথা ছিল। আপনাকে ভয় পেলে ওদের ঠিক দোষ দেয়া যায় না।'

'একটু বেশি বলে ফেলছেন না কি, লর্ড রক্সটন?' প্রশ্ন করলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

'আমি যথার্থই বলেছি।'

'আপনার বর্ণনা নিতান্ত অযৌক্তিক আর অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এদের নিয়ে কি করব সেটাই আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন এখন। ওদের বাড়ি পৌঁছে দেয়া দরকার, কিন্তু ওদের বাড়ি কোথায় তা কে জানে?'

'আমি চিনি,' বললাম আমি, 'ওরা লেকের ওপারেই থাকে।'

'আমাদের তরুণ বন্ধু জানে ওরা কোথায় থাকে, কিন্তু সে জায়গাটা বেশ কিছুটা দূরে বলেই আমার ধারণা।'

'প্রায় বিশ মাইল হবে এখান থেকে।'

সামারলী গলার ভিতর থেকে একটা আওয়াজ করে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

'ওই বনমানুষের প্রাচীর ভেদ করে আমরা এতদূর পৌঁছানোর কোন আশাই করতে পারি না।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই দূর থেকে বনমানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ভয়ে ইণ্ডিয়ানরা বিলাপের সুরে ককিয়ে উঠল।

লর্ড জন বললেন, 'শিগগির আমাদের সরে যেতে হবে এখান থেকে, ধরা পড়ার আগেই সরে যেতে হবে। প্রফেসর সামারলীকে তুমি সামলাবে, মালমসলা ইণ্ডিয়ানরা নিতে পারবে। ওরা আমাদের দেখে ফেলার আগেই চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আমাদের গুপ্ত আস্তানায় আশ্রয় নিলাম। সারাদিন ধরেই চারপাশে উত্তেজিত বনমানুষের সাড়া পেলাম। বেশির ভাগই আমাদের পুরানো ক্যাম্পের দিক থেকে। আমাদের এদিকে বিশেষ কোন সাড়া পেলাম না। সবাই কমবেশি ঘুমিয়ে নিলাম, আমিও ঘুমালাম। সন্ধ্যার সময়ে হাতায় কিসের টান পড়তে আমার ঘুম ভেঙে গেল, দেখি চ্যালেঞ্জার আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন।

'তুমি এইসব ঘটনা ছাপাবার জন্যে একটা ডায়েরী রাখো তাই না, মিস্টার ম্যালোন?' বিষণ্ন মুখে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন চ্যালেঞ্জার।

'এখানে আমি এসেছি কাগজের রিপোর্টার হিসাবে,' জবাব দিলাম আমি।

'ঠিক তাই, তুমি হয়তো শুনে থাকবে লর্ড রক্সটন আমার সম্বন্ধে কিছু উদ্দেশ্যবিহীন মন্তব্য করেছেন। উনি বলতে চান যে আমার আর ওই বনমানুষের চীফের সাথে···মানে···একটা···'

'হ্যাঁ, শুনেছি আমি।'

'কিন্তু এমন একটা কথা ছাপা হলে সেটা আমার পক্ষে খুব অসম্মানজনক আর হৃদয়বিদারক হবে।'

'সত্যি ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু ছাপব না আমি,' তাঁর মনে আঘাত না দিয়ে সান্ত্বনা দিলাম আমি।

'জনের মন্তব্য আর যুক্তি বেশির ভাগই অবান্তর আর নিচু শ্রেণীর, ওগুলো কেবলমাত্র মানুষের সম্মান আর চরিত্রের প্রতি অহেতুক কটাক্ষ। আমি কি বলছি বুঝতে পারছ তো?'

'অবশ্যই।'

'পুরোটাই তোমার বিচারের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি আমি।' এরপর অনেকক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন, 'অবশ্য এটা ঠিক যে বনমানুষের চীফ সত্যিই অত্যন্ত অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যেমন সুদর্শন তেমনি বুদ্ধিমান, তোমারও কি তাই মনে হয় না?'

'বিশিষ্ট প্রাণী সন্দেহ নেই,' জবাব দিলাম আমি।

প্রফেসর ফিরে গেলেন তাঁর জায়গায়, তাঁকে এখন অনেকটা আশ্বস্ত মনে হলো।

তেরো

আমরা সবাই জেগে উঠলাম সকালে। সকলেই গতদিনের উত্তেজনা আর স্বল্প খাবারের পরে বিপর্যস্ত, ক্লান্ত। সামারলী এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে উঠে দাঁড়ানোও তাঁর জন্যে কষ্টকর। কিন্তু বুড়ো সত্যিই বাপের ব্যাটা, আশ্চর্য মনোবল দিয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। হার স্বীকার করা তাঁর চরিত্রে নেই।

সবাই মিলে ঠিক করা হলো অন্তত ঘণ্টা দু'য়েক আমরা যেখানে আছি সেখানেই থেকে সকালের নাস্তা সেরে নেব। এরপর আমরা লেকের পাশ দিয়ে ঘুরে ইণ্ডিয়ানদের পৌঁছে দিতে যাব ওদের শহরে। ধরে নিলাম উপকারের পরিবর্তে অপকার করবে না ওরা। এর পরেই আমাদের প্রধান কাজ হবে এখান থেকে বের হবার একটা রাস্তা খুঁজে বের করা। এমনকী প্রফেসর চ্যালেঞ্জারও স্বীকার করলেন যে এখানে আমাদের যতটুকু করার ছিল তা আমরা করেছি–এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমরা যা জেনেছি সেই জ্ঞান সভ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া।

ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগ অনেকটা কমে এসেছে। শক্ত সমর্থ তবে আকৃতিতে ওরা অনেক ছোট। ওদের চুল মাথার পিছনে চামড়ার ফিতে দিয়ে গোছা করে বাঁধা, পরনের সামান্য যে কাপড় তাও চামড়ার, মুখে দাড়ি গোঁফ নেই, সুদর্শন, স্বভাবও ভাল। কানের লতিগুলো রক্তাক্ত, ঝুলছে; কানের ফুটোয় কোন গয়না সম্ভবত ছিল, কিন্তু বনমানুষরা তা ছিঁড়ে নিয়েছে। ওদের কথা যদিও বুঝতে পারলাম না তবু মনে হলো ভাষা বেশ উন্নত। 'আক্কালা' শব্দটা অনেকবার উচ্চারণ করল ওরা। বুঝলাম ওটা ওদের জাতির নাম। মাঝে মাঝে হাত মুঠো করে বনের দিকে দেখিয়ে উচ্চারণ করল, 'ডোডা! ডোডা!' অর্থাৎ শত্রু।

জন জিজ্ঞেস করলেন, 'এদের সম্পর্কে আপনার কি ধারণা, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার? আমার তো ধারণা ওই বেলমুণ্ডা লোকটাই সর্দার গোছের কেউ হবে।'

সেটা অবশ্য তাদের ব্যবহারেও স্পষ্ট ফুটে উঠছিল। তার সাথে কথা বলার সময়ে প্রত্যেকেই আগে সম্মানসূচক সঙ্কেত করে পরে কথা বলছিল। বয়সে সবচেয়ে ছোট দেখালেও একটা আভিজাত্য আছে তার চলাফেরায়। প্রফেসর তার মাথায় হাত রাখতেই সে প্রথমে আহত ঘোড়ার মত ছিটকে দূরে সরে গেল। পরে নিজের বুকে হাত রেখে কয়েকবার 'মারিটাস' শব্দটা উচ্চারণ করল। একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে চ্যালেঞ্জার পাশের ইণ্ডিয়ানটার কাঁধ ধরে লেকচার দেয়া আরম্ভ করলেন, যেন তাঁর ক্লাসেরই একটা প্রদর্শনীর নমুনা সে।

'এই প্রকার মানুষ,' চ্যালেঞ্জার তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে আরম্ভ করলেন, 'এদের

যেভাবে বা যে দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার করা যাক না কেন, বলা যাবে না যে এরা নিম্ন শ্রেণীর। পক্ষান্তরে বলা যায় যে এরা দক্ষিণ আমেরিকার বহু উপজাতীয়দের চেয়ে অনেক উন্নত। এবং ক্রমবিকাশে এরা বনমানুষ থেকে এতই ভিন্ন যে এরা এই মালভূমির অন্যান্য জীবজন্তুর সমসাময়িক হতেই পারে না।'

'তবে কি ওরা আকাশ থেকে পড়েছে?' একটু ফোঁড়ন কাটলেন লর্ড জন।

'খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন,' শান্ত ভাবেই জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার। 'এ নিয়ে ইউরোপ আমেরিকায় বিতর্কের ঝড় উঠবে একদিন। তবে আমার মতামত যদি জিজ্ঞেস করো,' বুকভরে শ্বাস নিয়ে শিষ্যদের দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন চ্যালেঞ্জার, 'তবে আমি বলব যে এরা বাইরে থেকেই এসেছে। এমনও হতে পারে যে দক্ষিণ আমেরিকায়, এক জাতের এনথ্রোপয়েড যে বনমানুষ ছিল তারাই বহু যুগ আগে কোন এক সময়ে এখানে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু তাদের প্রবল সংগ্রাম করতে হচ্ছে বিভিন্ন জীবজন্তুর সাথে–বিশেষ করে বনমানুষের সাথে। বনমানুষরা এদেরকে অনাহূত মনে করে নির্মম আঘাত হানতে চেষ্টা করছে সব সময়েই। এই কারণেই এদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ধাঁধাটার উত্তর কি সবার কাছে পরিষ্কার হয়েছে নাকি কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

সামারলীর মনের অবস্থা তখন এমন যে তিনি আর তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে বিতর্কে নামলেন না। প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন কেবল। জন মাথা চুলকে জানালেন যে দু'জন সম-ওজনের না হওয়ায় তিনিও আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন না। পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলাচনার মাঝে ছন্দ পতন ঘটিয়ে আমি আমার স্বাভাবিক সরল পদ্ধতিতেই সবাইকে মনে করিয়ে দিলাম যে চারজনের মধ্যে মাত্র তিনজন ইণ্ডিয়ান এখন আমাদের মাঝে আছে, আরেকজন নেই।

'একটা খালি মাংসের টিনে করে পানি আনতে গেছে সে,' জবাব দিলেন জন।

'পুরানো ক্যাম্পে গেছে?'

'না ঝর্নায়, ওই গাছগুলোর পিছনে, দুশো গজও হবে না এখান থেকে।'

'আমি দেখছি ও কোথায় গেল,' রাইফেলটা তুলে নিয়ে পানির ধারার দিকে এগুলাম আমি। সঙ্গীরা ব্যস্ত রইলেন নাস্তা তৈরির কাজে।

সাহস করে একাই এগুলাম আমি। বনমানুষের আস্তানা থেকে আমরা এখন অনেক মাইল দূরে, তাই খুব একটা ভয়ের কারণ নেই। পানির ধারা বয়ে যাওয়ার শব্দ কানে আসছে আমার। কতগুলো গাছ আর ঝোপের ওপাশেই ধারাটা। ক্যাম্পের সবার চোখের আড়ালে চলে এসেছি আমি। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা গাছের তলায় ঝোপের ভিতর লালচে কি যেন দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। সামনে গিয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল আমার–ইণ্ডিয়ান লোকটার মৃতদেহ পড়ে আছে!

কাত হয়ে পড়ে রয়েছে দেহটা, হাত পা দুমড়ানো। ঘাড় মটকে ভেঙে মাথাটা উল্টো দিকে ঘুরে রয়েছে। চিৎকার করে আমার সঙ্গীদের সাবধান করে দিলাম,

কোথাও গোলযোগ আছে। ছুটে দেহটার কাছে গেলাম–হঠাৎ এক অজানা কারণে ভয়ে চুপসে গেলাম আমি। পাতার শব্দে উপরের দিকে চেয়েই চক্ষু স্থির হয়ে গেল; আমার মাথার কাছে সবুজ লতা পাতার ভিতর থেকে লালচে লোমে ভরা দুটো হাত নীচে নেমে আসছে। আর একটু হলেই হাত দুটো গলা চেপে ধরত আমার। লাফিয়ে পিছনে সরে গেলাম, কিন্তু আরও দ্রুত নামল সেই হাত দুটো। হঠাৎ সরে যাওয়ায় ঠিক মত ধরতে পারল না আমাকে, একটা হাত পড়ল আমার মুখের উপর, আরেকটা হাত ঘাড়ে। গলা বাঁচাতে দু'হাত উপরে ছুঁড়ে দিলাম কিন্তু তার আগেই আমার মুখ থেকে থাবাটা নীচে নেমে গলা চেপে ধরল। আমাকে শূন্যে তুলে ফেলেছে জানোয়ারটা–প্রচণ্ড শক্তিতে আমার মাথা পিছন দিকে ঠেলছে সে। ঘাড়ে মারাত্মক চাপ অনুভব করছি আমি–অসহ্য যন্ত্রণা, জ্ঞান হারানোর অবস্থা হলো আমার। সর্বশক্তি দিয়ে আমার থুতনির উপর থেকে ওর হাতটা কোনমতে সরালাম। চেয়ে দেখলাম ভয়ঙ্কর একটা মুখের দুটো কঠিন নির্দয় হাল্কা নীল চোখ চেয়ে আছে আমার দিকে। অদ্ভুত সম্মোহনী ক্ষমতা ওই চোখের। শক্তি পাচ্ছি না আর আমি, আমাকে শিথিল হয়ে আসতে দেখে ওর বীভৎস মুখের দু'ধারে দুটো সাদা কুকুরে দাঁত ঝিক করে বেরিয়ে এল; এবার আরও জোরে চেপে ধরল সে আমার চিবুক–পিছন দিকে ঠেলছে ক্রমাগত। সাদাটে কুয়াশার মত ঝাপসা হয়ে এল আমার চোখ, অসংখ্য ঘণ্টা বাজতে লাগল কানে। দূর থেকে একটা রাইফেলের শব্দ যেন আমার কানে এল। মাটিতে পড়ার একটা ঝাঁকি কতকটা অবচেতন ভাবে অনুভব করলাম।

জ্ঞান ফিরতে দেখলাম, আমি আমাদের গোপন আস্তানায় ঘাসের উপর চিত হয়ে শুয়ে আছি। কে একজন পানি নিয়ে এসেছে ঝর্না থেকে, জন আমার মাথায়, চোখে মুখে পানি ছিটাচ্ছেন। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আর সামারলী হুমড়ি খেয়ে উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে আছেন আমার দিকে। এই প্রথম একটু আভাস পেলাম যে তাঁদের বিজ্ঞানের মুখোশের অন্তরালেও কোমল একটা মানুষের মন বিরাজ করছে।

'এ যাত্রা জোর বেঁচে গেছ হে,' বললেন জন, 'তোমার চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে তোমাকে কাটা মুরগীর মত শূন্যে দাপাতে দেখে ধরে নিয়েছিলাম বুঝি একজন সঙ্গী হারালাম আমরা। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে সই ঠিক না হলেও কাজ হয়েছে। গুলির শব্দ শুনেই তোমাকে ফেলে ছুটে পালিয়েছে ও। খোদার কসম বলছি পঞ্চাশজন রাইফেলধারী লোক যদি পেতাম তবে ওগুলোকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে জায়গাটাকে কলুষমুক্ত করে যেতাম।'

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কোন ভাবেই হোক বনমানুষগুলো আমাদের অবস্থান জেনে গেছে। দিনে অবশ্য খুব একটা ভয় নেই আমাদের, ওরা আক্রমণ করলে করবে রাতের অন্ধকারেই। সুতরাং ওদের থেকে যতদূরে সরে যেতে পারি ততই মঙ্গল। আমাদের তিন দিকেই বেশ ঘন জঙ্গল, ওখানে ওত পেতে আমাদের ফাঁদে ফেলা বনমানুষের পক্ষে খুবই সহজ। বাকি দিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে

লেকের দিকে। এদিকটায় কেবল ছোট ছোট ঝোপঝাড়, বড় গাছ কম, মাঝে মাঝে ফাঁকা মাঠও আছে। এই পথেই সেই রাতে আমি লেকের পাড়ে পৌঁছেছিলাম। এই পথেই আমরা এখানকার স্থানীয় লোকদেরকে তাদের গুহায় পৌঁছে দেব।

আমাদের ক্যাম্প ফোর্ট চ্যালেঞ্জার থেকে আরও দূরে সরে যেতে হচ্ছে বলে মন খারাপ লাগছে। কেবল যে খাবার আর ফেলে আসা জিনিসপত্রের জন্যেই দুঃখ হচ্ছে তাই নয়, জাম্বোর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে খারাপ লাগছে আরও বেশি। যা হোক, যথেষ্ট গোলাগুলি সাথে করে নিয়ে এসেছি—আপাতত আমরা নিশ্চিন্ত। সুযোগ পেলেই আমরা ওখানে ফিরে যাব আশা রাখি। বিশ্বস্ত জাম্বো যখন প্রতিজ্ঞা করেছে, তখন সে ঠিকই ওখানে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে।

দুপুরের পরেই রওনা হয়ে গেলাম আমরা। তরুণ চীফ আগে আগে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বোঝা বইতে কিছুতেই রাজি হলো না সে। তার পিছনে পিছনে চলেছে ইণ্ডিয়ান দু'জন, তাদের পিঠে আমাদের সামান্য কিছু সামগ্রী। সবশেষে আমরা চারজন, প্রত্যেকেই রাইফেল হাতে তৈরি। আমরা রওনা হতেই পিছনের ঘন জঙ্গল থেকে বনমানুষের বিকট উলুধ্বনি উঠল। হয়তো আমাদের চলে যেতে দেখে বিজয় উল্লাস করছে ওরা। পিছনে ফিরে গাছের সবুজ পাতার পর্দা ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু আওয়াজের জোর শুনে সহজেই অনুমান করলাম যে গাছের আড়ালে শত শত বনমানুষ এতক্ষণ ধরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল। তবে আমাদের আক্রমণ করার কোনো চেষ্টা দেখা গেল না ওদের মধ্যে।

আমি সবার পিছনে। অনেকটা ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছি আমরা। এখন আর বিশেষ ভয় নেই। আমার সামনের তিনজনের চেহারার দিকে চেয়ে হাসিই পেল আমার। এই কি সেই লর্ড রক্সটন যিনি সেদিন তাঁর বৈঠকখানায় গোলাপী আভার আলোতে আর ইরানী গালিচার মাঝে ফিটফাট সাহেব হয়ে বসে ছিলেন? আর এই কি সেই প্রফেসর যিনি এনমোর পার্কের বাসায় তাঁর বিশাল পাঠাগারে বিরাট ডেস্কটার পিছনে বসে ছিলেন? আর সব শেষে, এই কি সেই তীক্ষ্ণ চেহারার প্রফেসর যিনি সেদিন প্রাণী বিজ্ঞানীদের সভায় প্রতিবাদ করতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন? সারে লেনের কোন বেকার ভবঘুরের চেহারাও তো এত হতাশ আর গরীব দেখায় না। একথা সত্যি যে আমরা মাত্র এক সপ্তাহ হয় মালভূমির মাথায় উঠেছি, কিন্তু আমাদের বাড়তি জামাকাপড় সবই নীচের ক্যাম্পে রয়ে গেছে। আর এই একটা সপ্তাহ আমাদের সবারই জীবনের সবচেয়ে কঠিন সপ্তাহ গেছে। আমার উপর দিয়েই সবচেয়ে কম চোট গেছে, কারণ আমাকে বনমানুষের পাল্লায় পড়ে হয়রান হতে হয়নি। আমার কমরেড তিনজনের কারও মাথায়ই টুপি নেই, এখন রুমাল বেঁধেছেন তাঁরা মাথায়। জামাগুলো ফিতের মত ঝুলছে তাঁদের গায়ে। দাড়ি না কাটার ফলে সবার মুখেই বড় বড় দাড়ি গজিয়েছে, এখন চেহারা

চেনাই দায়। চ্যালেঞ্জার আর সামারলী দু'জনেই বেশ খুঁড়িয়ে হাঁটছেন, আর আমি চলেছি মাটির উপর দিয়ে পা টেনে টেনে। সকালের দুর্ঘটনায় জখম না হলেও বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছি, বাঁকা মুঠোর চাপে আমার ঘাড়টা আড়ষ্ট হয়ে আছে। আমাদের চারজনকে দেখাচ্ছে যেন চারজন হতভাগা। তাই আমাদের ইণ্ডিয়ান সঙ্গীরা যখন বারবার অবাক ভীত চোখে পিছনে ফিরে ফিরে দেখতে লাগল আমাদের, তখন মোটেও অবাক হলাম না আমি।

বিকালের দিকে লেকের ধারে পৌঁছে গেলাম। ঝোপ থেকে বেরিয়ে শান্ত পানির ধারে দাঁড়াতেই আমাদের ইণ্ডিয়ান সাথীদের মাঝে বেশ উত্তেজনা আর খুশির ভাব দেখা গেল। আঙুল দিয়ে ওরা বারবার লেকের দিকে দেখতে লাগল। পানির ওপর দিয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে অনেকগুলো সরু সরু লম্বা নৌকা। তখনও নৌকাগুলো কয়েক মাইল দূরে। কিন্তু খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে ওরা, আমাদের চেহারা চিনতে পারার মত কাছে এসে পড়ল। হঠাৎ উল্লসিত চিৎকারে ফেটে পড়ল ওরা। উত্তেজনায় সবাই নৌকার উপর দাঁড়িয়ে গেল। আনন্দে বৈঠা আর বর্শা আকাশের দিকে ঝাঁকাচ্ছে। তারপরই বৈঠা হাতে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং বাকিটুকু যেন প্রায় উড়ে চলে এল। পাড়ে নৌকা রেখে সবাই ছুটে এল আমাদের দিকে। তরুণ চীফের সামনে এসে সবাই উচ্চস্বরে সম্বর্ধনা জানাল।

শেষে তাদের মধ্যে থেকে একজন বৃদ্ধ লোক এগিয়ে এল। গলায় বড় বড় সুন্দর উজ্জ্বল পুঁথির মালা, হাতে পুঁতির বাহুবন্ধনী, কাঁধে হলুদ রঙের অপূর্ব সুন্দর কোন প্রাণীর চামড়া। সে এগিয়ে এসে খুব আদরের সাথে তরুণ চীফকে জড়িয়ে ধরল। তারপর আমাদের দিকে ফিরে তাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। জবাব শুনে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। একে একে সবাইকে আন্তরিকতার সাথে জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা জানাল বৃদ্ধ। তার হুকুমে আমাদের সম্মানে সবাই যার যার অস্ত্র মাটিতে রেখে মাটিতে শুয়ে সালাম জানাল।

ব্যক্তিগতভাবে আমার এসব আনুষ্ঠানিকতায় কেমন যেন একটু লজ্জাই লাগছিল। জন আর সামারলীরও দেখলাম আমার মতই অবস্থা, কিন্তু আমাদের প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যেন সূর্যমুখী ফুলের মতই দীপ্ত হয়ে ফুটে উঠেছেন, এমন ভাব। তিনি সবটাই রীতিমত উপভোগ করছেন।

'ওরা অনুন্নত হতে পারে,' দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন চ্যালেঞ্জার, 'কিন্তু ওদের এই যে উর্ধ্বতনের প্রতি শ্রদ্ধা এ থেকে আমাদের উন্নত ইউরোপেরও শিক্ষা নেয়ার জিনিস আছে।'

স্পষ্টই বোঝা যায় ওরা সবাই যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে। প্রত্যেকের হাতেই বর্শা না হয় সড়কি, লম্বা বাঁশের মাথায় পাথর বাঁধা, তীর ধনুক, গদা বা কোমরে পাথরের কুঠার ঝুলছে। আমরা যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে ওরা বারবার চাওয়া চাওয়ি করতে করতে 'ডোডা' 'ডোডা' উচ্চারণ করতে লাগল। তা

থেকে বোঝা গেল যে তারা এসেছে তাদের বুড়ো চীফের ছেলেকে উদ্ধার করতে, অন্যথায় প্রতিশোধ নিতে।

ওরা সবাই গোল হয়ে বসে একটা আলোচনা সভা করল। আমরা সামান্য একটু দূরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দু'জন যোদ্ধা তাদের বক্তব্য প্রকাশ করল। সব শেষে আমাদের তরুণ চীফ উঠে দাঁড়াল। হাত পা নেড়ে এমন অনবদ্য আর রক্ত গরম করা বক্তৃতা দিল সে যে তার ভাষা না বুঝলেও বিষয়বস্তু বুঝতে কোনই অসুবিধা হলো না আমাদের।

তরুণ চীফ বলল, 'ফিরে গিয়ে কি লাভ? আজ হোক কাল হোক আমাদের একদিন এদের মোকাবিলা করতেই হবে। তোমাদের সাথী বন্ধু বান্ধবকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমি বেঁচে ফিরে এসেছি, কিন্তু তাতে কি? অন্যেরা তো সবাই মারা পড়েছে। আমাদের কোন নিরাপত্তা নেই, কারও জন্যেই না। আজ আমরা তৈরি হয়েই একত্রিত হয়েছি।' এরপর আমাদের দেখিয়ে সে বলল, 'এই আশ্চর্য মানুষগুলো আমাদের বন্ধু। এঁরা প্রত্যেকেই অসম সাহসী যোদ্ধা। আর কোনদিন আমাদের এমন সুযোগ আসবে না, চলো আজ সবাই মিলে অগ্রসর হই। হয় বাকি জীবনটা সুখে শান্তিতে কাটাব আর না হয় সবাই মরব আজ। এছাড়া কোন্ মুখে মেয়ে মহলে মুখ দেখাব আমরা?'

সবাই ধীরে ধীরে উত্তেজনার চরমে পৌছল। বক্তার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই সবাই উল্লাস ধ্বনি করে নিজ নিজ অস্ত্র আকাশে উঁচিয়ে ধরল। বুড়ো চীফ এগিয়ে এল আমাদের দিকে, জঙ্গলের দিকে নির্দেশ করে কিছু বলল। জন হাতের ইশারায় তাকে আমাদের জবাবের জন্যে একটু অপেক্ষা করতে বলে আমাদের দিকে ফিরলেন।

'এখন সব কিছু আপনাদের উপর নির্ভর করছে,' আরম্ভ করলেন জন। 'আমি কেবল নিজের কথাই বলতে পারি। ওই বানরদের সাথে আমার বোঝাপড়া শেষ হয়নি। আমি যাব আমাদের এই ছোট বন্ধুদের সাহায্য করতে। আমাদের তরুণ সঙ্গীর মত কি?'

'আমি আছি আপনার সাথে,' জবাব দিলাম আমি।

'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার?'

'অবশ্যই আমিও যাব তোমাদের সাথে,' অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার।

'আর প্রফেসর সামারলী?'

'আমরা আমাদের এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি, লর্ড জন। লণ্ডন থেকে রওনা হবার সময়ে আমি ভাবিনি যে আমরা বনমানুষের বিরুদ্ধে অসভ্য মানুষের একটা দলকে নেতৃত্ব দেব।'

'সেটা আমরাও ভাবিনি,' হেসে জবাব দিলেন জন। 'কিন্তু আমাদের সামনে এই সমস্যা উপস্থিত, এখন আপনার রায় কি?'

'মনস্থির করা খুবই কঠিন,' শেষ পর্যন্তও তর্ক করলেন তর্কবাগিশ সামারলী। 'কিন্তু সবাই যখন যাওয়াই মনস্থ করেছেন তখন আমার পিছনে পড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না।'

'তা হলে এই সিদ্ধান্তই রইল,' বলে ওদের দিকে ফিরলেন জন। মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের রাইফেলে চাপড় মেরে রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরলেন তিনি।

সবাই একযোগে চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করল। বুড়ো চীফ আমাদের সবার সাথে হাত মেলালেন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আজ আর আক্রমণ করার সময় নেই। রাত কাটাবার জন্যে ওরা চারদিকে আগুন জ্বেলে ব্যূহ তৈরি করল। কয়েকজন জঙ্গলে গিয়েছিল, তারা ফিরে এল একটা বাচ্চা ইগুয়েনোডন সাথে নিয়ে। অন্যান্যগুলোর মত এটার কাঁধেও দেখলাম আলকাতরার দাগ।

একটু পরে ইণ্ডিয়ানদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে ওটাকে জবাই করার অনুমতি দিল। এবার বোঝা গেল ওগুলো কিসের দাগ। গরু দাগানোর মতই মালিকানা চিহ্নিত করার জন্যে দেয়া হয় আলকাতরার দাগ পোষা জন্তুর মত এগুলো। দেখতে বিশাল হলেও তৃণভোজী, নিরীহ। যেটুকু মগজ ওদের তাতে যে কোন বাচ্চা ছেলের পক্ষেও ওদের জড় করে তাড়িয়ে নিয়ে আসা সম্ভব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লেক থেকে বর্শা দিয়ে শিকার করা বিরাট আঁশওয়ালা গ্যানয়েড মাছের সাথে ইগুয়েনডনের টুকরাগুলো আগুনের উপর ঝলসানো হলো।

সামারলী বালুর উপর শুয়ে পড়লেন, কিন্তু আমরা বাকি তিনজন জলার পাড়ে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম নতুন কিছু জানার আশায়। দু'বার আমরা নীল কাদামাটির গর্ত দেখলাম। ঠিক যেমন দেখেছিলাম টেরাড্যাকটিলের আস্তানায়। এগুলো সবই পুরানো জ্বালামুখ। কেন জানি না জন এগুলোর বিষয়ে খুব আগ্রহ দেখালেন। কিন্তু প্রফেসর চ্যালেঞ্জার উৎসাহী হলেন একটা ফুটন্ত কাদার ডোবাতে। এক অজানা গ্যাস দৈত্যাকার সব বুদবুদের আকারে ভেসে উঠে ফুলে ফেটে যাচ্ছে। একটা ফাঁপা নলখাগড়া ভেঙে ওর ভিতরে ঢুকিয়ে অন্য মাথায় দিয়াশলাইয়ের আগুন দিলেন প্রফেসর। নীল শিখা জ্বলে উঠে বিস্ফোরণ ঘটল। আর স্কুলের বাচ্চার মত খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। আরও খুশি হলেন তিনি যখন উল্টো করে খুব পাতলা চামড়ার ব্যাগটায় নলখাগড়ার সাহায্যে গ্যাস ভরতেই সেটা শূন্যে উড়ল।

'দাহ্য গ্যাস, বাতাসের চেয়ে অনেক হালকা! নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে মুক্ত হাইড্রোজেন আছে। জি. ই. সির জ্ঞান ভাণ্ডারে এখনও বহু কিছু লুকিয়ে আছে, তরুণ বন্ধু!' বেশির ভাগ সময়েই জ্ঞান দান করতে হলে চ্যালেঞ্জার কেন জানি আমাকেই বেছে নেন; হয়তো সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবেই। 'তোমরা দেখবে কীভাবে জ্ঞানী মানুষ প্রকৃতিকে নিজের কাজে ব্যবহার করে।' গোপন উদ্দেশ্যের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন চ্যালেঞ্জার, কিন্তু আমাদের আর

খুলে বললেন না কিছু।

লেকের টলটলে পানির চেয়ে সুন্দর আর কিছুই আমার চোখে পড়ল না। আমাদের সাড়া পেয়ে আর সংখ্যায়ও আমরা ভারি হওয়ায় কোন জীবজন্তুই আর এদিকে ঘেঁষতে সাহস পায়নি। মাত্র কয়েকটা টেরাড্যাকটিল আমাদের মাথার উপর দিয়ে কিছুক্ষণ উড়ে আবার নিজেদের আস্তানায় ফিরে গেল। লেকটা বাদে চারদিক নিশ্চুপ হয়ে এসেছে এখন কেবল। ওটা যেন এখন আরও জীবন্ত। বিভিন্ন প্রাণীর প্রাচুর্যে লেকটা যেন চঞ্চল আর মুখর হয়ে উঠেছে। দূরের হলুদ চরগুলো এখন কালো কালো দাগে বোঝাই, কোনটা কচ্ছপের মত হামাগুড়ি দিচ্ছে, কোনটা সাপের মত এঁকেবেঁকে চলছে; কোনটা আবার স্থির। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে দু'একটা কালো আকৃতি থেমে থেমে চলে পানিতে নেমে যাচ্ছে। পানির উপরে এখানে সেখানে সাপের মত মাথা দেখা যাচ্ছে। দ্রুত পানি কেটে এঁকেবেঁকে চলছে ওরা। সামনে কোন ঢেউ বা ফেনা নেই, কিন্তু রাজহাঁসের মত পেছনে দু'দিকে ঢেউ তুলে এগুচ্ছে; হঠাৎ একটা জীব যখন আমাদের পাড়ে উঠে এল তখন দেখলাম প্রাণীটার দেহ পিপার মত, আর সেই অনুপাতে দাঁড়া অনেক বড়।

সামারলীও আমাদের সাথে যোগ দিলেন এসে। অদ্ভুত জীবটাকে দেখে দু'জনেই একসাথে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'প্লেসিওসরাস্!' সামারলী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একটা মিঠে পানির প্লেসিওসরাস্। এমন দৃশ্য দেখাও আমার ভাগ্যে ছিল! আমরা সত্যি ভাগ্যবান চ্যালেঞ্জার–জীববিজ্ঞানে আমরাই সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি।'

রাত অনেক গভীর না হওয়া পর্যন্ত সামারলী বা চ্যালেঞ্জার কাউকেই লেকের ধার থেকে ফিরিয়ে আনা গেল না। সারারাত ধরে জীবজন্তুর বিচিত্র সব আওয়াজ আর তাদের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ আমাদের কানে এল।

প্রত্যুষে ক্যাম্প ভাঙলাম আমরা। ভোরেই সবাই রওনা হলাম আমাদের বিচিত্র অভিযানে। আমার একটা বিশেষ শখ ছিল আমি কখনও সামরিক রিপোর্টার হব। এখন একবার ভাবলাম, কি কপাল আমার, আজ আমি শুধু সামরিক রিপোর্টারই নই, একজন সৈনিকও!

রাতেই গুহা থেকে আরও বেশ কিছু লোক এসে যোগ দিয়েছে। তাতে আমাদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করছে এরা, অর্থাৎ যথার্থই বনমানুষের বিরুদ্ধে এটা তাদের শেষ যুদ্ধ। আমরা চার-পাঁচশো লোক এগিয়ে চললাম অভিযানে। একটা ছোট দল চলেছে আগে আগে পথ প্রদর্শক আর বিপদ সঙ্কেত দাতা হিসেবে। তাদের পিছনে আমরা সবাই একযোগে দল বেঁধে এগুচ্ছি। ঘন জঙ্গলের কাছে এসে জন আর সামারলী ডান ধারে খুঁটি গাড়লেন। আমি আর চ্যালেঞ্জার নিলাম বাম ধার। পাথর যুগের কিছু লোক যুদ্ধে চলেছে সেন্ট জেমস স্টীট আর স্ট্র্যাণ্ডের নির্মিত অস্ত্রে সজ্জিত লোকের সাথে!

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না আমাদের। উচ্চ চিৎকারের সাথে একটা দল বেরিয়ে এল জঙ্গলের ভিতর থেকে। ওরা মুগুর আর পাথর নিয়ে বেরিয়েই ইণ্ডিয়ানদের দলের দিকে ছুটে এল। বীরোচিত হলেও নেহাৎই বোকার মত কাজ। সমতল জমিতে বাঁকা পায়ের বনমানুষদের চেয়ে এরা অনেক বেশি ওস্তাদ। বিশালদেহী বনমানুষগুলো কোন পাত্তাই পেল না, ওদের আঘাত সহজেই ক্ষিপ্রতার সাথে এড়িয়ে গিয়ে এরা পাল্টা আঘাত হানল। তীরের উপর তীর ওদের একের পর এক বিদ্ধ করল। একটা বিশাল বনমানুষ একেবারে আমার পাশ দিয়ে ছুটে গেল, দেখলাম ডজনখানেক তীর বিঁধেছে ওর বুকে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সে। দয়া পরবশ হয়ে ওর মাথায় একটা গুলি করে ওর সব যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে দিলাম।

এই আক্রমণে আমার কেবল মাত্র ওই একটি গুলিই ছোঁড়া হলো–কারণ এবারের আক্রমণ ছিল কেন্দ্রভাগে। আর ইণ্ডিয়ানদের কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন ছিল না। যে কয়জন বনমানুষ আক্রমণ করতে বেরিয়ে এসেছিল তাদের একজনও ফিরে যাবার সুযোগ পায়নি।

জঙ্গলে ঢুকতেই ঘটনা ধীরে ধীরে খারাপের দিকে গেল। এক এক সময়ে আমাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয়েছে, মাঝে মাঝে এমন অবস্থাও গেছে যে মনে হয়েছে আর বুঝি শেষ রক্ষা হলো না। লতাপাতার ভিতর থেকে এক একটা বনমানুষ লাফিয়ে পড়েছে ইণ্ডিয়ানদের মাঝে। গদার বাড়িতে তিন চারজনকে ঘায়েল করার আগে ওদের বর্শাবিদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। একজন তো সামারলীর রাইফেলই চ্যাপ্টা করে দিল, তাঁর মাথাটারও একই অবস্থা করত যদি না একজন ইণ্ডিয়ান চট করে ওর বুক না ফুঁড়ে দিত। উপর থেকে অন্যান্য বনমানুষগুলো আমাদের ওপর পাথর আর লাঠি ছুঁড়ে মারছে। কখনও কখনও নিজেরাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমাদের উপর, না মরা পর্যন্ত যতটুকু ক্ষতি করা সম্ভব তা করতে কোন ত্রুটি করছে না ওরা। একবার তো আমাদের মিত্র বাহিনীর রণেভঙ্গ দেয়ার জোগাড় হয়েছিল। আমাদের রাইফেলের শক্তি ওদের মনোবল ফিরিয়ে দেয়াতেই ওরা আবার ফিরে আসে। ফিরে বুড়ো চীফের দক্ষ পরিচালনায় তারা এমন পাল্টা আক্রমণ করেছে যে বনমানুষরা কোনমতে পালিয়ে বাঁচল।

সামারলী নিরস্ত্র, আমি সমানে গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছি, অন্য ধার থেকেও অনবরত গুলির শব্দ আসছে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে দেখলাম আতঙ্কিত সমর্পণের আভাস। চিৎকার করে যে যেদিকে পারল পালাতে লেগেছে ওরা। বিজয় উল্লাসে হর্ষধ্বনি করতে করতে ইণ্ডিয়ানরা পিছু নিল ওদের। এতদিনের বিবাদ, ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা, সব কিছুরই শোধ সুদে আসলে নেবে আজ ওরা।

আমরা চারজন একত্রিত হয়ে ওদের পিছু পিছু আরও কিছুদূর গেলাম। কেবল শোনা যাচ্ছে ধনুকের টঙ্কার, বনমানুষের আর্ত-চিৎকার আর ইণ্ডিয়ানদের উল্লাস-ধ্বনি।

'মনে হচ্ছে সব শেষ,' বললেন জন। 'আমার মনে হয় শেষ কাজটুকু সারার দায়িত্ব ওদেরই দেয়া উচিত। হত্যাকাণ্ড যত কম দেখি রাতে ততই ভাল ঘুম হবে আমাদের।'

খুনের নেশায় চোখ দুটো চকচক করছে চ্যালেঞ্জারের। তাঁর চলাফেরা এখন লড়াইয়ের মোরগের মতই গর্বিত। 'আমাদের সৌভাগ্য,' বললেন তিনি, 'আজ আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশ নিলাম, এই ধরনের যুদ্ধই পৃথিবীর মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে এসেছে চিরকাল। দেশে দেশে যুদ্ধ, সেটা কি? নিরর্থক–আসল বিজয় হচ্ছে সেটা, যখন বাঘ দেখেছে সে আদিম গুহাবাসীদের সাথে এঁটে উঠতে পারছে না; অথবা হাতি যখন বুঝেছে যে তার একজন প্রভু আছে। এগুলোই হচ্ছে মানুষের অর্থবহ বিজয়। এই মালভূমির মানুষের ভবিষ্যৎ এখন উজ্জ্বল।'

কোন একটা গোঁড়া বিশ্বাস নিয়ে যুদ্ধে না নামলে এমন হত্যাযজ্ঞ সম্ভব নয়। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সামনে এগুতে এগুতে দেখলাম শত শত বনমানুষ মরে পড়ে আছে চারপাশে। তীর আর বর্শায় গাঁথা দেহ। চিৎকার আর হুঙ্কারের তাড়া খেয়ে ওরা কোন্ দিকে যে পালাচ্ছে তা সহজেই বোঝা যায়; নিজেদের আস্তানায় পালাচ্ছে। শেষ বারের মত রুখে দাঁড়াল ওরা। কিন্তু প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে আবার ছত্রভঙ্গ হতে বাধ্য হলো। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন বীভৎস হত্যাকাণ্ড চলছে। প্রায় আশি নব্বই জন পুরুষ বনমানুষ যারা শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল, তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তাদেরই পদ্ধতিতে নীচে ফেলে দেয়া হলো। উপায় ছিল না ওদের; ইণ্ডিয়ানরা অর্ধ চক্রাকারে ঘিরে বর্শা উঁচিয়ে তাড়া করেছিল। এক মিনিটেই শেষ হয়ে গেল সব।

ধ্বংস করা হলো গোটা শহরটা। মেয়ে বনমানুষ আর বাচ্চাগুলোকে বন্দী করা হলো দাস হিসাবে। দীর্ঘকালের অকথিত শত্রুতার এইভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটল।

এই বিজয়ে আমাদের বেশ সুবিধা হলো। আমরা নির্ভয়ে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে সব দরকারী জিনিস নিয়ে এলাম। সেই সাথে আবারও জাম্বোর সাথে আমরা যোগাযোগ করার সুযোগ পেলাম। বেচারা জাম্বো দূর থেকে এতগুলো বনমানুষকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে খুবই ভয় পেয়েছে।

'পালিয়ে আসুন, মাস্‌সাস, (মিস্টারস) চলে আসুন,' চিৎকার করে বলল জাম্বো, 'ওই প্রেতের দেশে থাকলে আপনাদের ঠিকই শেষ করবে।'

'উচিত কথাই বলেছে জাম্বো,' একটু রোষের সাথেই বললেন সামারলী। 'যথেষ্ট অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে ইতিমধ্যেই। এখন সভ্য জগতে ফিরে যাবার চেষ্টায় আমাদের সব শক্তি আর বুদ্ধি নিয়োগ করা উচিত হবে।'

চোদ্দ

প্রত্যেক দিনের ঘটনা আমি লিখে চলেছি। শেষ করার আগে যেন লিখতে পারি যে, 'আমাদের মাথার উপর থেকে কালো মেঘ কেটে গেছে, মুক্তির আলো দেখতে পাচ্ছি আমরা,' মনে প্রাণে সেই কামনাই করি। তবে এমন দিনও আসতে পারে যেদিন এই অদ্ভুত দেশে কোন আশ্চর্য ঘটনা বা জন্তু জানোয়ার সম্পর্কে নতুন তথ্য জেনে আমরা আমাদের অনিচ্ছা-বন্দী দশায় খুশিই হব। তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আটকা পড়ে থাকার জন্যে আমাদের কোনো অনুতাপ আর থাকবে না।

বনমানুষদের একেবারে বিলুপ্ত করে ইণ্ডিয়ান লোকেদের এই বিজয় আমাদের ভাগ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। আমরা এখন মালভূমিতে রাজার সম্মান পেয়ে আসছি। স্থানীয় বাসিন্দারা আমাদের শ্রদ্ধা আর ভয় মিশ্রিত চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে। ওদের ধারণা আমরা কোন অলৌকিক শক্তির সাহায্যেই ওদের বিজয়ে সাহায্য করেছি। নিজেদের ভালর জন্যেই ওদের উচিত ছিল এমন শক্তির অধিকারী মানুষগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় দেয়া–কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা মুখ ফুটে বলেনি যে কি উপায়ে আমরা নীচে নামতে পারি।

ওদের ভাবভঙ্গির ভাষা থেকে যতটা বোঝা গেছে তা হচ্ছে একটা গুহা ছিল (আমরা তার নীচের অংশটা দেখেছি), কিন্তু গত বছর প্রবল ভূমিকম্পে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা নীচে নামার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই ওরা মাথা নাড়ে অথবা কাঁধ ঝাঁকায়। হয়তো বা ওরা চায় না যে আমরা ওদের ছেড়ে চলে যাই।

বিজয়ের পরে যে সব বনমানুষ বেঁচে ছিল, নিজেদের গুহার কাছেই ওরা তাদের বসবাসের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। মালভূমি পার হয়ে এপাশে আসার সময়ে তাদের বিলাপ সত্যিই বড় করুণ। এখন থেকে ওরা বেড়ে উঠবে ওদের প্রভুর তত্ত্বাবধানে। রাতের অন্ধকারে এখনও আমাদের কানে আসে মেয়ে বনমানুষের হু হু কান্না। কাঠ কাটা আর পানি টানাই এখন ওদের প্রধান কাজ।

দু'দিন পর আমরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে ওদের গুহায় ফিরে এলাম। ওরা ওদের গুহাতেই থাকার জন্যে আমাদের অনেক অনুরোধ করল, কিন্তু লর্ড জন কিছুতেই রাজি হলেন না। কারণ গুহায় থাকলে আমরা ওদের আওতার মধ্যে থাকব, তখন শক্তিশালী আর বিপজ্জনক মনে করে আমাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারে ওরা।

আমরা তাই স্বাধীন ভাবে বাইরে থাকলাম। আমাদের রাইফেল সব সময়েই প্রস্তুত, কিন্তু ওদের সাথে বেশ ভাল সম্পর্কই বজায় রাখলাম আমরা। মাঝে মাঝে

ওদের গুহা পরিদর্শন করেছি–অদ্ভুত জায়গা ওগুলো। প্রাকৃতিক নাকি মানুষের তৈরি তা আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি। সবগুলো গুহাই আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল একটা অপেক্ষাকৃত নরম স্তরে প্রায় একই উচ্চতায় রয়েছে; উপরে আগ্নেয় বেসল্ট আর নীচে শক্ত গ্র্যানিট।

গুহাগুলোর মুখ মাটি থেকে প্রায় আশি ফুট উঁচু। ছোট ধাপের লম্বা সিঁড়ি রয়েছে উপরে ওঠার। সিঁড়ি এত সরু যে ভারি কোন জন্তুই ওটা বেয়ে উপরে উঠতে পারবে না। গুহার ভিতরটা মোটামুটি গরম আর শুকনো। কোনটা অল্প কোনটা বা বেশি গভীরে প্রবেশ করেছে পাহাড়ের গায়ে। মসৃণ দেয়ালে অদ্ভুত সব জীবজন্তুর ছবি; ইগুয়েনোডন, ডাইনোসর, ফিউনা ইত্যাদি; সবই কাঠ কয়লা দিয়ে আঁকা।

যখন ভাল মত জানলাম যে ইগুয়েনোডনগুলো আমাদের গরু ছাগলের মতই এই স্থানীয় বাসিন্দাদের গৃহপালিত পশু তখন উপলব্ধি করতে বাকি রইল না যে কেবল প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্র হাতে থাকলেও মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব।

তিনদিনের মাথায় আমরা আবিষ্কার করলাম যে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষেরও মাঝে মাঝে বিপদ আসে। চ্যালেঞ্জার আর সামারলী গেছেন লেকের পাড়ে। কয়েকজন ইণ্ডিয়ান তাঁদের নির্দেশে হারপুন দিয়ে তাঁদের দেখিয়ে দেয়া প্রাণীগুলো শিকার করছে। জন আর আমি আছি গুহার পাশে আমাদের ক্যাম্পে। হঠাৎ বিভিন্ন কাজে রত ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার উঠল, সাবধান! সাবধান! সবার মুখে একটাই কেবল শব্দ 'স্টোয়া'! তৎক্ষণাৎ ছেলে মেয়ে জোয়ান বুড়ো সবাই একসাথে ছুটল নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে। উন্মত্তের মত সবাই সিঁড়ি দিয়ে গুহার মুখের দিকে দৌড়াচ্ছে।

উপরে চেয়ে দেখলাম সবাই হাতের ইশারায় আমাদের দ্রুত উপরের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলছে। আমরা রাইফেল আর গুলির ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে ছুটলাম বিপদের পরিমাণ যাচাই করতে।

হঠাৎ জঙ্গলের গাছের ভিতর থেকে দশ বারোজন ইণ্ডিয়ান ছুটে বেরিয়ে এল। জানপ্রাণ নিয়ে দৌড়াচ্ছে ওরা। ওদের ঠিক পিছনেই ধাওয়া করে আসছে দুটো জন্তু। আমাদের ক্যাম্পে যে হানা দিয়েছিল আর সেই রাতে আমাকে যে তাড়া করেছিল–ঠিক তেমনি জন্তু। জানোয়ার দুটো দেখে আমরা বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। দিনের বেলা আর কোন দিন দেখিনি, আজ সূর্যের আলোয় দেখলাম ওদের ব্যাঙের মত মাথার আবগুলো অনেকটা মাছের আঁশের মত দেখাচ্ছে; রামধনুর মত বিভিন্ন রঙ ছড়াচ্ছে ওগুলো।

হাঁ করে শোভা দেখার আর সময় নেই আমাদের। মুহূর্তের মধ্যে ওরা পলাতক ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পায়ের নীচে যারা চ্যাপ্টা হলো তাদের রেখে আবার লাফ দিল। বোঝা যাচ্ছে, ওদের শিকার পদ্ধতিই হচ্ছে প্রকাণ্ড দেহের তলে শিকারকে পিষে মারা। অন্যান্য পলাতক ইণ্ডিয়ানরা ভয়ে চিৎকার

করতে করতে ছুটছে। এই দুটো দানবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একেবারেই অসহায় ওরা; একের পর এক মারা পড়ছে ওরা প্রচণ্ড আক্রমণে। ছোট্ট ইণ্ডিয়ান দলটার ছয়জন মাত্র জীবিত এখন। আমরা দু'জন এগিয়ে এলাম ওদের সাহায্যে, কিন্তু তাতে কেবল আমাদের বিপদই বাড়ল। একশো গজ দূর থেকে আমরা দু'জনই ম্যাগাজিনের সবকটা গুলি শেষ করলাম জানোয়ার দুটোর ওপর। কিন্তু আমাদের গুলি যেন কাগজের তৈরি! কোন প্রতিক্রিয়াই পরিলক্ষিত হলো না জন্তু দুটোর মাঝে। ওরা যে সরীসৃপ প্রকৃতির সেটাই হয়তো জখমের প্রতি ওদের এই বেপরোয়া ভাবের প্রধান কারণ। আমরা দু'জনেই ওদের বুক লক্ষ্য করে এতগুলো গুলি করার পরেও ওদের যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব। ওদের কোন মগজ নেই, পুরো মেরুদণ্ড জোড়া বুদ্ধি আর স্নায়ু। আধুনিক অস্ত্র দিয়ে ওদের ঘায়েল করা খুবই শক্ত–প্রায় অসম্ভব।

তবে একটা কাজ হলো। শব্দ আর রাইফেলের আগুন দেখে ওরা ইণ্ডিয়ানদের ছেড়ে এবার আমাদের দিকে ধাবিত হলো। তাতে ইণ্ডিয়ানরা এবং আমরা দু'জন সবাই নিরাপদে সিঁড়ি পর্যন্ত যাবার সুযোগ পেলাম।

আমাদের কনিকাল বিস্ফোরক বুলেটও যেখানে কিছু করতে পারল না, সেখানে স্থানীয় লোকদের তীরে কিছুটা কাজ হলো। তীরের মাথায় স্ট্রোফেনথাস বিষ মাখানো, সেটা আবার পচা মাংসের মধ্যে রেখে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত। কিন্তু তীর দিয়ে সাথে সাথে কোন কাজ হলো না, কারণ সরীসৃপের দেহের রক্ত সঞ্চালনের সাথে বিষ মিশতে বেশ দেরি হয়। তবে তীরের বিষক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত তারা মারা যাবে এটা ঠিক।

জন্তু দুটো গুহার নীচে বিফল আক্রোশে হুঙ্কার দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যেক গুহার মুখ থেকে শিস ছেড়ে তীর বিঁধছে ওদের গায়ে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে একেবারে সজারুর কাঁটার মত তীর বেরিয়ে রয়েছে ওদের দেহ থেকে–কিন্তু তবু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের। তখনও সমানে হুঙ্কার ছেড়ে চলেছে। যে পথে শত্রু পালিয়েছে সেই সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠেই একটা জন্তু ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে; শেষ পর্যন্ত বিষ কাজ করেছে।

ইণ্ডিয়ানদের একজন ভারি গলায় একটা ডাক ছেড়ে তার চ্যাপ্টা মাথাটা মাটিতে ঠেকাল। অপর জন্তুটা চক্রাকারে কিছুক্ষণ ঘুরল, চড়া গলায় আর্তনাদও করল, তারপরে সে-ও ধরাশায়ী হলো। খানিকক্ষণ ছটফট করে দ্বিতীয়টাও স্থির হয়ে এল।

লেখার জন্যে আমার ডেস্ক হচ্ছে একটা খালি মাংসের টিন, আর বাকি অন্যান্য উপকরণ হচ্ছে একটা ভোঁতা পেনসিল আর অবশিষ্ট একটা দুমড়ানো নোট বই। কোনদিন যদি এর চেয়ে ভাল সুযোগ সুবিধা পাই তবে এই আক্কালা ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে বিশদ ভাবে লিখব। ওদের সাথে আমাদের কেমন কাটল, আর অদ্ভুত এই মেপল হোয়াইট ল্যাণ্ডের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা। প্রায় এক

মাস হয়ে এল আমরা এখানে আছি। ছোটকালের বিশেষ ঘটনাগুলো যেমন মনে গেঁথে থাকে, এখানকার প্রতি ঘন্টার বিস্ময়কর আর উত্তেজনাময় ঘটনাগুলোও আমার মনে ঠিক তেমনি উজ্জ্বলভাবে গেঁথে রয়েছে–ভুলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

সময় এলে বিশদ ভাবে আমি বর্ণনা করব সেই জোছনা রাতে বাচ্চা ইচিথিওসরাসটা কেমন করে ইণ্ডিয়ানদের জালে ফেঁসে সরু নৌকাটা উল্টে দেয়ার জোগাড় করেছিল। দেখতে ওটা অর্ধেক সীল আর অর্ধেক মাছের মত। দুটো চোখ মাথার দুপাশে অনেকটা বাইরে, যেন খুঁড়ে বের করা হয়েছে, আর তৃতীয় চোখটা ঠিক মাথার মাঝখানে।

সেই একই রাতে লেকের একটা সবুজ সাপ নলখাগড়ার ভিতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে চ্যালেঞ্জারের মাঝিকে লেজে পেঁচিয়ে নিয়ে গেল। আরও লিখব আমি সেই বিরাট সাদা জিনিসটার কথা–ওটা জন্তু নাকি সরীসৃপ আজও জানি না আমি। লেকের পুব দিকের জলায় থাকে। রাতের বেলায় সেটার গা থেকে আলো বের হয়, অন্ধকারে জ্বলে ওটা। ইণ্ডিয়ানরা ওকে ভীষণ ভয় পায়, কিছুতেই ওদের কাছে নেয়া গেল না। দু'বার আমরা নিজেরাই অভিযান চালিয়ে ওকে দেখেছি–কিন্তু জলা যায়গার ঘন আগাছা আর শ্যাওলার মধ্যে দিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কাছে যেতে পারিনি। আমি এটুকু বলতে পারি যে আকৃতিতে একটা গরুর চেয়ে কিছু বড় হবে, আর ওটার শরীর থেকে মৃগনাভির মত একটা অদ্ভুত সুগন্ধি আসে।

সেদিন চ্যালেঞ্জারকে তাড়া করেছিল উটপাখির চেয়েও বড় একটা ছুটন্ত পাখি। দৌড়ে কোনমতে একটা উঁচু পাথরে চড়ে বসলেন চ্যালেঞ্জার, কিন্তু তার আগেই পাখিটা তাঁর পায়ে ঠোকর দিল, বুটের গোড়ালিটা কেটে রয়ে গেল ওর ভয়ঙ্কর বাঁকা ঠোঁটে। যেন বাটাল দিয়ে কেউ কেটে নিয়েছে জুতোটা। শকুনের মত গলা, মাথাটা দেখতে বিকট, ঠিক যেন একটা চলন্ত যম। লর্ড জনের গুলি খেয়ে পাখিটা মাটিতে পড়ে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ডানা ঝাপটাল কিছুক্ষণ। হয়তো একদিন পাখির ওই চ্যাপ্টা ভীষণ দর্শন মাথাটা আলবেনির বৈঠকখানায় অন্যান্য জীবজন্তুর মাথার মাঝে দেখার সৌভাগ্য আমার হবে।

'ফোরোরেকাস!' চ্যালেঞ্জার হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন। 'মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রায় বারো ফুট লম্বা।'

প্রশ্ন উঠতে পারে যে আমরা দেশে ফেরার চেষ্টা না করে মিছে এখানে কেন সময় নষ্ট করছি। এর উত্তর হচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের সব চেষ্টাই বিফল হয়েছে।

একটা জিনিস আমরা খুব স্পষ্টভাবেই টের পেয়েছি, সেটা হচ্ছে এই ইণ্ডিয়ানরা আমাদের জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত, কিন্তু আমাদের এখান থেকে চলে যাবার ব্যাপারে ওরা বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে রাজি নয়।

যখনই আমরা বড় একটা গাছ কেটে সেটা বয়ে নিয়ে গিয়ে পুল তৈরি করার

কথা কিংবা চামড়ার ফিতে দিয়ে দড়ি তৈরি করে দেয়ার কথা বলেছি তখনই ওরা কেবল হেসে মাথা নেড়েছে। এমনকী বুড়ো চীফ পর্যন্ত আমাদের সাহায্য করতে নারাজ।

কেবল মারিটাস–চীফের ছেলের-হাবেভাবে বোঝা যেত যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের আটকে রাখায় সে সত্যিই ব্যথিত। বনমানুষের সাথে যুদ্ধে জয় হওয়ার পর থেকেই ওরা আমাদের অতিমানব বলে ধরে নিয়েছে। ওদের ধারণা আমাদের বিশেষ কোন অলৌকিক শক্তি আছে এবং আমরা যতদিন ওদের সাথে থাকব ততদিন ওদের আর কোন দুর্ভোগ সইতে হবে না। আমাদের প্রত্যেককে অবাধে একটা করে বউ আর একটা করে নিজস্ব গুহা নেয়ার জন্যে অনেক সাধাসাধি করছে ওরা–তবু যদি নিজের আত্মীয় স্বজনের কথা ভুলে ওদের সাথে মালভূমিতে থেকে যাই! আমাদের সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করলেও ওদের ভাবগতিক দেখে আমরা ঠিক করলাম যে মালভূমি ছাড়ার পরিকল্পনা ওদের কাছ থেকে গোপন রাখব। আমাদের ভয় যে ওরা শেষ পর্যন্ত না আমাদের জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করে।

ডাইনোসরের ভয় থাকা সত্ত্বেও আমি গত তিন সপ্তাহে দু'বার আমাদের পুরানো ক্যাম্পে গেছি। অবশ্য ডাইনোসরেরা রাতের বেলাই সাধারণত বের হয় শিকারে। দেখলাম, জাম্বো নিষ্ঠার সাথে আমাদের মালপত্র পাহারা দিচ্ছে নীচের ক্যাম্পে। দূরে বিশাল সমতল ভূমির দিকে চেয়ে থেকে থেকে আমার চোখে জ্বালা ধরে গেল কিন্তু কোন সাহায্য আসার চিহ্ন চোখে পড়ল না।

'শিগগিরই এসে পড়বে ওরা, মাস্‌সা মালোন,' বলল জাম্বো, 'এক সপ্তাহ পার হবার আগেই দড়ি নিয়ে ফিরে আসবে লোক ইণ্ডিয়ান গ্রাম থেকে। আপনাদের আমরা নামিয়ে আনব।' জাম্বোর গমগমে গলায় অভয়বাণী শুনে মনটা অনেক হালকা হয়ে গেল আমার।

দ্বিতীয়বার ফেরার পথে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো। এবারে সারা রাত একাই কাটিয়েছি আমি 'ফোর্ট চ্যালেঞ্জারে'। সকালে চেনা পথ ধরে ফিরে চললাম আমি। টেরাড্যাকটিলের ডেরার কাছাকাছি আসতেই দেখলাম এক অদ্ভুত জিনিস এগিয়ে আসছে আমার দিকে। একটা বেতের ঘণ্টার আকারের খাঁচার ভিতরে একটা মানুষ। আরও আশ্চর্য হলাম আমি কাছে গিয়ে যখন দেখলাম যে ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, স্বয়ং লর্ড জন। আমাকে দেখে তিনি তাঁর আবরণের ভিতর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। কেমন যেন গোলমেলে ঠেকল আমার কাছে ব্যাপারটা।

'এই যে, ম্যালোন, তোমার সাথে এখানে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি,' বললেন জন।

'ঘটনাটা কি,' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'ওর ভিতরে ঢুকে কি করছেন আপনি?'

'টেরাড্যাকটিল বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'কিন্তু কেন?' মাথায় কিছুই ঢুকল না আমার।

'আশ্চর্য জীব ওরা, তাই না? কিন্তু মিশুক নয় মোটেও! অপরিচিতদের সাথে খুব দুর্ব্যবহার করে–মনে নেই তোমার? তাই আমি এটার আশ্রয় নিয়েছি, এখন আর ঠোকর দিতে পারবে না।'

'কিন্তু ওই জলাতে আপনার কি কাজ?'

আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি। চেহারায় একটু দ্বিধা প্রকাশ পেল।

'তোমার কি ধারণা যে প্রফেসররা ছাড়া আর কারও কিছু জানার থাকতে পারে না?

'আমি ওদের একটু কাছে থেকে দেখতে চাই।'

'আপনার ব্যাপারে নাক গলানোর জন্যে কিছু মনে করবেন না আবার।'

'না হে, তরুণ বন্ধু। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের জন্যে একটা বাচ্চা টেরাড্যাকটিল সংগ্রহ করতে হবে আমাকে। না, তোমাকে আসতে হবে না সঙ্গে, এই খাঁচার ভিতরে আমি নিরাপদ, কিন্তু তোমার কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। আসি তা হলে, রাত্রে ক্যাম্পে দেখা হবে।'

আমি ফিরে চললাম, জন খাঁচা নিয়ে রওনা হলেন তাঁর পথে।

জনের ব্যবহার সেদিন আমার কাছে একটু অদ্ভুত মনে হয়েছিল, কিন্তু প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের আচরণ যেন আরও বেশি অস্বাভাবিক। দেখা গেল ইণ্ডিয়ান মেয়েদের প্রতি তাঁর বেশ দুর্বলতা। ইদানীং সবসময়েই তাঁর পিছনে একদল ভক্ত ইণ্ডিয়ান মেয়ের ভিড় দেখা যায়। ব্যঙ্গ নাটকের সুলতানের মত আগে আগে দর্পের সাথে হাঁটেন চ্যালেঞ্জার আর বিস্ফারিত চোখে সামান্য গাছের বাকল পরা ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মিছিল চলে তাঁর পিছনে।

সামারলী তাঁর পুরো সময়টা মালভূমির পোকামাকড় আর পাখি নিয়ে কাটান। যেটুকু অবসর পান তা কাটান চ্যালেঞ্জারের সাথে ঝগড়া করে–কেন আজ পর্যন্ত নীচে নামার ব্যবস্থা করতে পারলেন না।

প্রতিদিন সকালে চ্যালেঞ্জার তাঁর ভক্তের দল নিয়ে একা একা কোথায় চলে যান। যখন ফেরেন তখন ভাব দেখে মনে হয় গোটা পৃথিবীর সব দায়িত্ব যেন তাঁরই কাঁধে। একদিন দলবল সহ আমাদের সবাইকে নিয়ে গেলেন তিনি তাঁর গোপন আস্তানায়।

একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গা, পামগাছে ঘেরা। পাশেই একটা গ্যাস-বুদ্বুদের জলা, ওটার চারদিকে ইগুয়েনডনের চামড়ার পাতলা পাতলা ফালি; কাছেই রয়েছে লেকের সেই বিরাট মৎস্য-সরীসৃপের পাকস্থলীর তৈরি চুপসান আবরণ। বিরাট ছালার মত জিনিসটা সেলাই করে চারদিক আটকানো, কেবল একদিকে একটা ছোট ফাঁক রাখা হয়েছে। লম্বা নলখাগড়ার নল দিয়ে জলা থেকে গ্যাস সংগ্রহ করে

ওই ছোট ফাঁকটা দিয়ে থলেতে ভরা হচ্ছে। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল থলেটা ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে। আকাশে উড়ে যাবার উপক্রম হতেই চ্যালেঞ্জার লাফিয়ে ওটাকে ধরে চামড়ার ফিতে দিয়ে মজবুত করে গাছের সাথে বেঁধে দিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই থলেটা বেশ বড় হয়ে ফুলে উঠল। গাছের সাথে বাঁধা চামড়া ফিতেয় বেশ জোর টান পড়ছে, বোঝা গেল বেশ ভারি ওজনও এখন সহজেই তুলতে পারবে ওটা। চ্যালেঞ্জার তাঁর নতুন তৈরি কীর্তির দিকে চেয়ে গর্বিত পিতার মত হাসি হাসি মুখ করে দাড়িতে আঙুল চালাতে লাগলেন। সামারলীই প্রথমে নীরবতা ভাঙলেন।

তীক্ষ্ণ গলায় তিনি বললেন, 'ওতে চড়িয়ে আমাদের নিয়ে যাবার মতলব নিশ্চয়ই করেননি আপনি?'

'এর ক্ষমতা আমি সবাইকে প্রদর্শন করার পরে আর কারও মনে কোন দ্বিধা থাকবে না বলেই আমার বিশ্বাস,' জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার।

'এখনি, এই মুহূর্তে আপনি আপনার মাথা থেকে এই পাগলামির ভূত নামাতে পারেন। দুনিয়ার অমূল্য কোন জিনিসের লোভ দেখিয়েও কেউ আমাকে ওতে চড়াতে পারবে না।' বলে জনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন সামারলী, 'তোমার কি মত?'

'এটা কিরকম হয় দেখতে চাই আমি,' জবাব দিলেন জন। তাঁর চোখে অবিশ্বাস।

'সবাই দেখবে,' বললেন চ্যালেঞ্জার। 'কিছুদিন ধরেই নীচে নামার সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আমি মাথা খাটাচ্ছি। আমরা সবাই নিশ্চিত যে বেয়ে নীচে নামা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আর কোন সুড়ঙ্গ পথও নেই। যেদিক দিয়ে আমরা উপরে উঠেছি সেখানে ফিরে যাবার মত ব্রিজ তৈরিও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং বেলুন ছাড়া উপায় কি? হ্রদের বিশাল জন্তুর পাকস্থলী আর মালভূমির প্রাকৃতিক গ্যাস আমার সমসার সমাধান এনে দিয়েছে, ফলাফল দেখুন!'

একহাতে ছেঁড়া জ্যাকেটের সামনের দিক ধরে অন্য হাতে গর্বভরে বেলুনটার দিকে দেখালেন চ্যালেঞ্জার।

বেশ গোল হয়ে ফুলে উঠেছে বেলুনটা, বাঁধা চামড়ার দড়িতে জোর টান পড়ছে।

'নেহাত পাগলামি,' ফুঁসে উঠলেন সামারলী।

জন বেশ উৎসাহিত। আমার কানে কানে বললেন, 'বুদ্ধি আছে বটে বুড়োর।' তারপর চ্যালেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের জন্যে ঝুড়ি বা বাস্কেটের কি হবে?'

'এর পরেই আমি সেদিকে মনোযোগ দেব। কি দিয়ে তৈরি হবে, কেমন করে বাঁধা বা ঝুলানো হবে, সেসব পরিকল্পনা আমার তৈরিই আছে। আপাতত আমি দেখাতে চাই বেলুনটা আমাদের প্রত্যেকের ভার নিতে কতখানি সক্ষম।'

'সবাই একসাথে যাব না আমরা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে প্যারাশুটের মত করে নামব। প্রতিবারই বেলুনটাকে নীচে থেকে টেনে উপরে তোলা হবে। একজনের ভার নিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে হালকা ভাবে মাটিতে নামিয়ে দিলে তখন আর কি চাই? এর ভার নেয়ার ক্ষমতা নিজের চোখেই দেখুন আপনারা।'

বেসল্টের একটা বড় চাক নিয়ে এলেন চ্যালেঞ্জার। পাথরটার মাঝের দিকটা একটু সরু–দড়ি বাঁধতে সুবিধা। চামড়ার দড়ি বাঁধলেন প্রফেসর পাথরের সাথে। আমাদের সাথে আনা দড়ি দিয়ে জালের মত তৈরি করে বেলুনের উপর বিছিয়ে দড়ির মাথা নিজের হাতে তিন পাক ঘুরিয়ে বেঁধে দিলেন। এখন যে কোন চাপই এক জায়গায় না পড়ে অনেকটা জায়গার উপর সমান ভাবে ভাগ হয়ে বেলুনের ওপর পড়বে।

প্রীত হাসি হেসে চ্যালেঞ্জার বললেন, 'এইবার আপনাদের আমি আমার বেলুনের বহন ক্ষমতা দেখাব।' বলে ছুরি দিয়ে চামড়ার দড়িগুলো কেটে দিলেন তিনি।

বেলুনটা ভীষণ বেগে উপরের দিকে উঠল। মুহূর্তে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে টেনে শূন্য করে নিয়ে চলল বেলুন। ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনমতে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরলাম আমি। প্রফেসরের সাথে আমিও শূন্যে উঠে গেলাম। জন ছুটে এসে জাপটে ধরলেন আমার পা। আমার মনে হলো তিনিও যেন শূন্যে উঠে আসছেন।

পুরো অভিযানে এমন বিপর্যয় আর ঘটেনি। চারজন অভিযানকারী একটা দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে শূন্যে, কল্পনায় এরকম ছবি ভেসে উঠল আমার। ভাগ্য ভাল বেলুনটার ভার তোলার অসীম ক্ষমতা থাকলেও দড়িটার ভার সহ্য করার ক্ষমতা সীমিত ছিল, ছিঁড়ে গেল ওটা। আমরা স্তূপাকার হয়ে মাটিতে পড়লাম, দড়ির জালটা পড়ল আমাদের ওপর। যখন টলতে টলতে আবার উঠে দাঁড়ালাম ততক্ষণে বেলুনটা পাথরের চাকসহ অনেক উপরে উঠে গেছে এবং তখনও মহা বেগে উপরেই উঠছে। নীল আকাশে বেসল্টের চাকটাকে একটা কালো বিন্দুর মতই দেখাচ্ছে।

'চমৎকার!' চেঁচিয়ে উঠলেন চ্যালেঞ্জার, 'একটা পুরোপুরি সন্তোষজনক প্রদর্শনী! এতখানি সাফল্য আমি নিজেও আশা করতে পারিনি। চিন্তা নেই, অল্প সময়ের মধ্যেই আর একটা বেলুন তৈরি করে ফেলব আমি। সেই বেলুনে চড়েই আমরা একে একে সবাই নিরাপদে নীচে নামব।'

'ঘোঁৎ' করে একটা শব্দ তুলে সামারলী তাঁর অসন্তোষ আর অবজ্ঞা জানালেন।

সেদিনই সন্ধ্যায় আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হলো। আমাদের নীচে নামার চেষ্টায় একমাত্র তরুণ চীফেরই কিছুটা সহানুভূতি আছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের এখানে আটকে রাখার পক্ষপাতি নয় সে। অন্ধকার হবার পরপরই চীফের ছেলে

আমার হাতে গোল করে মোড়ানো একটা গাছের বাকল দিল। কেন জানি না হয়তো আমরা প্রায় সমবয়সী বলেই সব সময়েই কিছু বলতে হলে আমার সাথেই যোগাযোগ করে সে। বাকলটা আমার হাতে দিয়ে উপরে একসারি গুহার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল তারপরে নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইশারায় ঘটনাটা গোপন রাখতে বলে আবার চুপি চুপি ফিরে গেল সে নিজের গুহায়।

আগুনের আলোর সামনে নিয়ে ওটা খুললাম আমরা। এক বর্গফুট মত হবে গাছের ছালটা। ভিতরের পিঠে কয়েকটা লম্বা দাগ কাটা। বেশির ভাগই সোজা দাগ, কয়েকটা মাথার দিকে দু'ভাগ হয়ে গেছে, কোনটা আবার ডানে বা বামে বেঁকে গেছে।

কাঠ কয়লা দিয়ে ভিতরের সাদা পিঠে পরিচ্ছন্নভাবে আঁকা হয়েছে দাগগুলো।

আমি বললাম, 'এটা আমাদের জন্যে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা হবে। দেয়ার সময়ে ওর মুখের ভাব থেকেই বোঝা গেছে।'

'যদি সে ঠাট্টা না করে থাকে,' বললেন সামারলী, 'মানুষের প্রাথমিক উন্নতিগুলোর মধ্যে ঠাট্টাও একটা।'

'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা সঙ্কেত,' গম্ভীর ভাবে বললেন চ্যালেঞ্জার।

'ধাঁধার আসরের মতই মনে হচ্ছে,' নাক চুলকাতে চুলকাতে মন্তব্য করলেন জন। ঘাড় লম্বা করে দেখছিলেন তিনি সামনে বিছানো বাকলটা, হঠাৎ উত্তেজিতভাবে খপ করে ওটা হাতে তুলে নিলেন।

'আশ্চর্য!' চিৎকার করে উঠলেন জন, 'আমি বোধহয় বুঝতে পেরেছি ধাঁধার উত্তর। এখানে দেখুন, কয়টা দাগ আছে? আঠারোটা, আমাদের মাথার ওপরও ঠিক আঠারোটা গুহাই আছে।'

'মারিটাস আমার হাতে ওটা দিয়ে গুহাগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল, আমি জানালাম। 'কিন্তু তাতে কি?'

'তা হলে আর সন্দেহ নেই যে এটা ওই গুহাগুলোরই নক্সা। কোনটা বেশি গভীর কোনটা কম। কিন্তু এই যে, একটার নীচে একটা কাটা চিহ্ন। সবচেয়ে গভীর গুহা বোঝাবার জন্যেই হয়তো চিহ্নটা দেয়া হয়েছে।'

লাফিয়ে উঠলাম আমি, 'কিংবা এটার মুখ খোলা এমনও হতে পারে!'

'আমার মনে হয় আমাদের তরুণ বন্ধুই ঠিক ধরেছে,' বললেন চ্যালেঞ্জার। 'নইলে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এসে এটা দিয়ে যাবে কেন? গুহাটা যদি ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে থেকে থাকে তা হলে ওটা এদিকের মুখের সমান উঁচুতে হলেও একশো ফুটের বেশি নামতে হবে না আমাদের।'

'একশো ফুট!' ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন সামারলী, 'এতদূর নামব কি করে আমরা?'

'আমাদের এখনও একশো ফুটের বেশি দড়ি আছে,' আমি বলে উঠলাম। 'দড়ি বেয়ে নামতে কোন অসুবিধা হবে না।'

'কিন্তু গুহার ইণ্ডিয়ান বাসিন্দাদের ব্যাপারে কি করা হবে?' আপত্তি জানালেন সামারলী।

'এসব গুহায় কেউ থাকে না,' বললাম আমি। 'গুদাম হিসাবে এগুলো ব্যবহার করে ওরা। এখনই একবার গিয়ে তদন্ত করে দেখে আসলে কেমন হয়?'

এক ধরনের বিটুমিন যুক্ত শুকনো কাঠ আছে মালভূমিতে। এরাউকারিয়া জাতের। ইণ্ডিয়ানরা মশাল হিসাবে ব্যবহার করে ওগুলো। প্রত্যেকে ওর একটা করে ডাল সাথে নিয়ে সেই গুহার শ্যাওলা পড়া সিঁড়িতে পৌঁছলাম আমরা। উপরে উঠে দেখলাম বিরাট কয়েকটা বাদুড় ছাড়া সত্যিই আর কোন প্রাণী নেই গুহায়। ইণ্ডিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোন ইচ্ছা ছিল না আমাদের, তাই বেশ কিছু দূর ভিতরে ঢুকে তারপরে মশাল জ্বালালাম। বেশ সুন্দর শুকনো গুহাটা, মসৃণ দেয়ালে এই অঞ্চলের নানান ধরনের ছবি আঁকা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললাম আমরা। কিছুদূর যেতেই সবাইকে হতাশ করে শেষ হয়ে গেল গুহা। একটা পাথরের দেয়াল পথ আটকে দাঁড়িয়েছে আমাদের। পাথরে এমন একটা ফাটল বা গর্ত নেই যে কোন ইঁদুরও পার হতে পারবে। অপ্রত্যাশিত বাধাটার সামনে আমরা ব্যথিত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে, কোন কিছু ধসে পড়ে যে বন্ধ হয়েছে এই গুহা তা নয়; আদৌ খোলাই ছিল না এটা কোনদিন।

'হতাশ হবার কিছু নেই,' বললেন আমাদের অদম্য প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। 'এখনও আমাদের বেলুনে চড়ে নামার পথ খোলা রয়েছে।'

চ্যালেঞ্জারের কথায় ককিয়ে উঠলেন সামারলী।

'আমরা ভুল গুহায় ঢুকিনি তো?' বললাম আমি।

চার্টের ওপর আঙুল দিয়ে দেখালেন জন, 'না, এটাই ডান দিক থেকে সতেরো নম্বর আর বাম দিক থেকে দুই নম্বর গুহা, কোন ভুল নেই।'

আমি ওঁর আঙুলের তলার দাগটার দিকে চেয়ে উৎফুল্ল হয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'পেয়েছি! সবাই আমার পিছন পিছন আসুন।'

তাড়াতাড়ি ফিরে চললাম আমরা। 'এইখানেই আমরা মশাল জ্বেলেছি, তাই না?' দিয়াশলাইয়ের পোড়া কাঠিগুলো দেখলাম আমি।

'ঠিক,' সমর্থন করলেন জন।

'নক্সায় গুহাটাকে দুটো শাখায় ভাগ হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। আমার বিশ্বাস একটু এগিয়ে গেলেই ড্রান হাতে পড়বে গুহার অন্য লম্বা শাখাটা।'

আমার কথামত ঠিকই ডানদিকে অপেক্ষাকৃত বড় শাখাটা পাওয়া গেল। ডানদিকের গুহা ধরে দ্রুত এগিয়ে চললাম। হঠাৎ কালো আঁধার ভেদ করে দূরে একটা গাঢ় লাল রঙের আলোর ঝিলিক দেখতে পেলাম। সবাই প্রায় ছুটে এগিয়ে গেলাম ওটার দিকে। কোন শব্দ, কোন তাপ বা কোন গতি নেই, তবু জ্বলছে। গুহার তলায় বালুকণাগুলো আলোর ছটায় অমূল্য মণিমাণিক্যের মত চকচক করছে।

'চাঁদ!' চিৎকার করে উঠলেন জন, 'এপারে এসে পড়েছি আমরা, চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে।'

সত্যিই পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যাচ্ছে গুহার মুখে। গুহার মুখটা বেশ ছোট, একটা জানালার চেয়ে বড় হবে না। নীচে উঁকি দিয়ে দেখলাম ওখান থেকে মাটি বেশি দূরে নয়–নামা খুব সহজ হবে। মাটি থেকে কিছুটা উপরে বলেই নীচে থেকে এটা আমাদের চোখে পড়েনি। সবাই উল্লসিত মনে ফিরে এলাম। পরদিন সন্ধ্যায় নীচে নামার উদ্যোগ করব।

আমাদের যা কিছু করার গোপনে আর জলদি করতে হবে। কারণ শেষ মুহূর্তে হয়তো ইণ্ডিয়ানরা আমাদের আটকে রাখতে পারে। জিনিসপত্র সবই ফেলে যাব আমরা, কেবল সঙ্গে নেব আমাদের রাইফেল আর গুলি। কিন্তু প্রফেসর চ্যালেঞ্জার গোঁ ধরলেন তাঁর ভারি বাক্সটা অবশ্যই নিতে হবে।

ধীরে ধীরে সারাটা দিন কেটে সন্ধ্যা নামল। আমরা যাবার জন্যে তৈরি হলাম। বাক্সটা অনেক কষ্টে ওই ছোট সিঁড়ি বেয়ে ওপরে তুললাম। উপরে উঠে শেষবারের মত চাইলাম আমি এই অদ্ভুত জায়গাটার দিকে। হয়তো শিগগিরই এটা আর এমন থাকবে না; শিকারী আর অনুসন্ধানকারীর দল এসে এখানকার পবিত্রতা নষ্ট করবে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের কাছে এটা থাকবে ভালবাসায় ভরা এক অপরূপ স্বপ্ন রাজ্য। এখানে আমরা অনেক সাহস দেখিয়েছি, অনেক ভুগেছি আর শিখেছি। বামদিকের গুহাগুলো রাতের আঁধারে প্রফুল্ল লালচে আভা ছড়াচ্ছে। একটু দূরে দেখা যাচ্ছে লেকটা। থিরথির করে কাঁপছে পানি। অন্ধকার জঙ্গল থেকে একটা জন্তু প্রচণ্ড হুঙ্কার দিল। মেপল হোয়াইট ল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে ওই কণ্ঠ যেন আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আমরা গুহা পথে এগিয়ে চললাম। এবার বাড়ি ফিরব।

দু'ঘণ্টা পরে আমরা সব মালসহ মালভূমির নীচে জড় হলাম। চ্যালেঞ্জারের মালটা নামাতেই আমাদের যা একটু বেগ পেতে হলো। মালপত্র সব ওখানেই রেখে আমরা রওনা হলাম জাম্বোর ক্যাম্পের উদ্দেশে। ভোরের দিকে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। দূর থেকে অবাক হয়ে লক্ষ করলাম একটা নয় প্রায় গোটা বারো আগুন জ্বলছে ওখানে। উদ্ধারকারী দল ইণ্ডিয়ান গ্রাম থেকে পৌঁছেচে। বিশজন ইণ্ডিয়ান এসেছে, সাথে এনেছে প্রচুর দড়ি আর পুল তৈরির সরঞ্জাম। যাক, আমাদের জিনিসপত্র বয়ে নেয়ার লোকের আর অভাব হবে না। কালই রওনা হবো আমরা আমাজনের দিকে।

পনেরো

এখানে আমি আমাদের আমাজনের বন্ধুদের–বিশেষ করে সিনরপেনালোসা আর ব্রাজিলের সরকারী কর্মচারীদের আমাদের ফিরতি পথে বিশেষ সুযোগ সুবিধা করে দেয়ার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দক্ষিণ আমেরিকায় আমাদের নিয়ে যে সব কথাবার্তা আর ঔৎসুক্য দেখা গেল তাতে মনে করেছিলাম যে লোক মুখে ছড়িয়ে পড়া গল্প শুনেই ওরা এতটা উৎসাহী। কিন্তু ব্যাপারটা যে এতদূর ছড়িয়েছে, সারা ইউরোপে আমাদের নিয়ে তর্ক বিতর্কের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে সেটা বুঝলাম আমরা অনেক পরে। আমাদের জাহাজ আইভেরিনা যখন সাউদ্যাম্পটন থেকে পাঁচশো মাইল দূরে, তখন থেকেই নানা পত্র পত্রিকা থেকে আমাদের কাছে রেডিও বার্তা আসতে লাগল। আমাদের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত যে কোন ছোট্ট ফিরতি খবরও ওরা অনেক টাকা দিয়ে কিনে নিতে রাজি। এতেই বোঝা গেল যে শুধু বিজ্ঞান জগৎ নয়, সাধারণ জনগণও আমাদের খবর জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম যে জুওলজিক্যাল ইন্সটিটিউটের সভার আগে আমরা কেউ মুখ খুলব না।

সাউদ্যাম্পটনে নামার পর বহু সাংবাদিকই আমাদের কাছ থেকে কথা বের করার চেষ্টা করল, কিন্তু আমরা তাদের জানালাম নভেম্বরের সাত তারিখে জুওলজিক্যাল হলের সভার আগে আমরা কেউ কিছু বলব না। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল সব লোক ওই ছোট জায়গায় আঁটবে না তখন কুইনস হলের ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু সেখানেও যে জায়গা হবে না তা আগে বুঝতে পারলে এলবার্ট হলেই হয়তো এই অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা নেয়া হত।

এবার আমাদের খবরের কাগজের ভাষাতেই শুনুন মীটিঙে কি ঘটেছিল। হেড লাইন সহ পুরো খবরটাই তুলে দিলাম এখানে:

হারানো পৃথিবী
কুইনস হলে ঐতিহাসিক সভা
ভীষণ হট্টগোল
আশ্চর্য ব্যাপার–ওটা কি?
রিজেন্ট স্ট্রীটে রায়ট!
(বিশেষ রিপোর্ট)

বহু আলোচিত জুওলজিক্যাল ইন্সটিটিউটের সভা গত সন্ধ্যায় কুইনস হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্সটিটিউটের তরফ থেকে পাঠানো কমিটির রিপোর্টই এই

সমাবেশের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সভায় যা ঘটেছে তা সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা কেউ কোনদিনও ভুলতে পারবে না।

টিকিট কেবল বিজ্ঞানী আর তাঁদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাত আটটায় মীটিং শুরু হবার কথা কিন্তু তার অনেক আগেই হল ভরে গিয়েছে। বিক্ষুব্ধ জনতাকে অযৌক্তিকভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা পৌনে আটটায় ধাক্কাধাক্কি করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। এই ঠেলাঠেলিতে পুলিশের এইচ বিভাগের ইন্সপেক্টার স্কোবল সহ কয়েকজন আহত হয়। হতভাগ্য ইন্সপেক্টরের পা ভেঙে গেছে বলে হাসপাতালের বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

এইভাবে জনতার গেট ভাঙার ফলে কুইনস হলে আর তিল ধারণের ঠাঁই রইল না। এমনকী প্রেসের জন্যে নির্ধারিত খালি জায়গার উপর হামলা করে সেই জায়গাও দখল করে নেয় জনতা।

অনুষ্ঠানের চারজন প্রধান তারকার জন্যে আনুমানিক হাজার পাঁচেক লোক অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক সময় মতই দেখা দিলেন তাঁরা হলের মঞ্চে। শুধু ইংল্যাণ্ডের নয়, ফ্রান্স এবং জার্মানীর সব বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণও উপস্থিত ছিলেন হলে। সুইডেন থেকেও এসেছিলেন সেখানকার সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ প্রফেসর সেরজিয়াস, উপসালা ইউনিভার্সিটি থেকে।

চার নায়ক হলে ঢোকার সাথে সাথেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তিন চার মিনিট ধরে চিৎকার করে তাঁদের সম্বর্ধনা জানায়। তবে চুলচেরা বিচার করলে ঠিকই ধরা পড়ত যে যারা তালি দিচ্ছিল তারা সবাই এঁদের সম্মানার্থে দিচ্ছিল না।

হাততালি, উত্তেজনা আর চিৎকার একটু শান্ত হতেই চেয়ারম্যান, ডারামের ডিউক খুব অল্প কথায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন।

তার পরেই এলেন প্রফেসর সামারলী। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোথায় কি ঘটেছিল কেমন করে ঘটেছিল তার একটা মোটামুটি বিবরণ দিলেন তিনি। (এই রিপোর্টে বিবরণ ছাপা হলো না; আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির এই অভিযান সম্পর্কে বিশদ বিবরণ এই কাগজেই ছাপা হবে তাঁর নিজস্ব লেখনীতে)। বিভিন্ন ধরনের প্রাণী যেগুলো আমরা পৃথিবীর বুক থেকে লোপ পেয়েছে বলে ধরে নিয়েছিলাম তাদের অনেকগুলোই তিনি ওই মালভূমিতে নিজের চোখে দেখে এসেছেন বলে জানালেন।

আশা করা গেছিল যে প্রাণিতত্ত্ব কমিটির নেতা হিসাবে প্রফেসর সামারলীর বক্তৃতার পরে প্রফেসর সেরজিয়াসের ধন্যবাদ জ্ঞাপন আর একজনের সমর্থনের পরেই সভার কাজ শেষ হবে; কিন্তু ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল।

প্রথম থেকেই কিছু কিছু বিরোধিতার আভাস পাওয়া গেছে। ঠিক এই সময়ে এডিনবারার ড. ইলিংওয়ার্থ হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চেয়ারম্যানের কাছে জ্ঞাপন করলেন যে শেষ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে একটা সংশোধনীর প্রয়োজন আছে বলে

তিনি মনে করেন।

চেয়ারম্যান তাঁকে তাঁর বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিলেন।

প্রফেসর সামারলী সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে জানালেন যে ওই ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু। ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর ব্যাথিবিয়াসের আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখাটা বের হবার পর থেকেই তাঁদের এই মতবিরোধ।

চেয়ারম্যান জানালেন যে ব্যক্তিগত বিষয় এখানে আলোচনা করা যাবে না। ইলিংওয়ার্থকে বলতে দেয়া হলো সামারলীকে থামিয়ে। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ হলো:

'বছর খানেক আগে একজন কিছু অদ্ভুত কথা শুনিয়েছিলেন আমাদের। আজ চারজন লোক বলছেন আরও অদ্ভুত সব কথা। কিন্তু কথা হচ্ছে মুষ্টিমেয় চারজন লোকের কথাতে কি আমরা বিজ্ঞানে যুগান্তকারী এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ অবিশ্বাস্য কথাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারি? ইদানীং অনেক বিদেশী ভ্রমণকারী এ ধরনের গল্প বানিয়ে বলছে আর তাদের কথা বোকার মত বিশ্বাসও করেছে লোকজন। লণ্ডন জুওলজিক্যাল ইন্সটিটিউটও কি সেরকম বোকামির পরিচয় দেবে?

'আমি অস্বীকার করছি না যে এঁরা চারজনই স্বনামধন্য সৎ ব্যক্তি। কিন্তু মানুষের চরিত্র বড় জটিল। এমনকি প্রফেসরগণও খ্যাতির লোভে ভুল পথে চালিত হতে পারেন। প্রজাপতির মত আমরা সব মানুষই আলোর মাঝে পাখা ঝাপটাতে চাই, অর্থাৎ মধ্যমণি হয়ে থাকতে চাই। আমি রূঢ় হব না, তবে এই চারজনেরই পরস্পরকে সমর্থন করার বিভিন্ন ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে।

'আমাদের শোনানো হয়েছে যে তাড়াতাড়ি দড়ি বেয়ে নেমে পালাতে হয়েছে বলে বড় কোন নমুনা তাঁদের পক্ষে আনা সম্ভব হয়নি। প্রফেসর সামারলী যে সব ছোট ছোট নমুনা এনেছেন সেগুলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলে কোন প্রমাণ নেই। লর্ড রক্সটন দাবি করেছেন যে তাঁর কাছে ফোরোরেকাসের মাথা আছে, সেটা নিজের চোখে দেখলে সন্দেহমুক্ত হতে পারতাম।'

এইখানে লর্ড জন লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে জানতে চাইলেন তাঁকে মিথ্যাবাদী বলা হচ্ছে কি না। হলের ভিতরে হৈ চৈ লেগে গেল। পিছনে মেডিক্যাল ছাত্রদের মধ্যে কিছু হাতাহাতিও হয়ে গেল। চেয়ারম্যান উঠে দাঁড়িয়ে বহু কষ্টে লোকজনকে একটু শান্ত করে ইলিংওয়ার্থকে অল্প কথায় তাঁর বক্তব্য শেষ করার নির্দেশ দিলেন।

'আমার আরও অনেক কিছুই বলার ছিল, কিন্তু মহামান্য চেয়ারম্যানের নির্দেশ শিরোধার্য করে এই বলেই আমি শেষ করতে চাই যে আজকের বক্তব্যগুলো প্রমাণ সাপেক্ষ বলেই রেকর্ড করা হোক। পরে সঠিক তদন্তের জন্যে আরও বড় এবং আরও বিশ্বাসযোগ্য কমিটিকে পাঠানো যেতে পারে।'

এই মন্তব্যে হলের ভিতরে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। শ্রোতাদের মতবাদ

দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। দেখা [illegible] বিরো[illegible]টিও নেহাত ছোট নয়। চিৎকার আর গোলমালের মধ্যে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এগিয়ে এলেন। তিনি দু'হাত তুলে দাঁড়াতেই ধীরে ধীরে হট্টগোল কমতে কমতে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

'এখানে উপস্থিত অনেকেরই হয়তো মনে আছে কয়েক মাস আগে প্রফেসর সামারলীও ঠিক এই রকমই বোকার মত প্রতিবাদ করেছিলেন। আজকের বক্তা যেসব জঘন্য নীচ শ্রেণীর মন্তব্য করেছেন তাতে বহু কষ্টে আমাকে তাঁর সমপর্যায়ে নেমে এসে কথা বলতে হচ্ছে।

'কমিটির তরফ থেকে প্রফেসর সামারলীই আজ তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন এই সভায়, তবে আমিই ছিলাম এই অভিযানের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। আমিই তাঁদের সবাইকে নিয়ে গেছি অজানা জায়গায়, আমিই সব দেখিয়েছি আবার আমিই নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি।

'যা হোক, গত সভার অভিজ্ঞতায় সাবধান হয়ে গেছি আমি। এবারে তাই যে কোন যুক্তিবাদী মানুষকে নিঃসন্দেহ করার মত প্রমাণ নিয়েই ফিরেছি।'

ইলিংওয়ার্থ দাঁড়িয়ে উঠে দেখতে চাইলেন সেই প্রমাণ।

'প্রফেসর সামারলীর বক্তৃতা, কীট পতঙ্গ আর প্রজাপতির নমুনা, ছবি, কোন কিছুই আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। এবার আপনিই বলুন কিসে সন্তুষ্ট হবেন আপনি?'

ইলিংওয়ার্থ জানালেন যে প্রাগৈতিহাসিক কোন প্রাণীর নমুনা দেখতে চান তিনি।

'তা দেখালে সন্দেহ দূর হবে তো আপনার?'

ইলিংওয়ার্থ অবিশ্বাসের হাসি হেসে জানালেন যে হবে।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার হাত তুলে ইশারা করতেই দেখা গেল মিস্টার ম্যালোন চেয়ার ছেড়ে মঞ্চের পিছনে চলে গেলেন। একটু পরেই বিশালদেহী একজন নিগ্রোর সাথে ধরাধরি করে একটা ভারী বাক্স এনে প্রফেসরের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলেন। হলে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে তখন। উত্তেজনায় শ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে দর্শকমণ্ডলী।

বাক্সের ঢাকনা টেনে সরিয়ে ফেললেন প্রফেসর। কয়েকবার তুড়ি বাজিয়ে ডাকলেন। সাংবাদিকদের আসন থেকে শোনা গেল তিনি ডাকছেন, 'ওঠো সুন্দরী, চেহারা দেখাও!'

এক মুহূর্ত পরেই নখের আঁচড় আর ঝটপটানির শব্দ তুলে বিদঘুটে বিকট কদাকার চেহারার একটা জীব বাক্সের কিনারায় চড়ে বসল।

দর্শকদের সব কটা চোখের ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি আঠার মত আটকে রইল জীবটার ওপর। চেয়ারম্যান ডিউক ভয়ে উল্টে অর্কেস্টার উপর পড়লেন। কিন্তু সেদিকে কেউ খেয়ালই করল না। প্রাণীটার মুখ এতই বীভৎস যে কল্পনাতেও কেউ এমন মুখ ভাবতে পারবে না। হিংস্র, ভীতিজনক মুখে দুটো লাল টকটকে

চোখ, ঠিক যেন জ্বলন্ত কয়লার কণা। লোভী লম্বা হিংস্র মুখটা আধ খোলা; ভেতরে হাঙরের মত দুই সারি ধারাল দাঁত দেখা যাচ্ছে।

দর্শকদের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। একজন ভয়ে চিৎকার করে উঠল। সামনের সারির দু'জন মহিলা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। দারুণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল সবাই। দিশেহারা জনতা কি করবে কিছুই বলা মুশকিল।

সবাইকে শান্ত করার জন্যে হাত তুললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। কিন্তু তাঁর এই হাত নাড়ায় ভয় পেয়ে জীবটা পাখা মেলল। রবারের মত বিশাল ডানা মেলে শূন্যে উড়ল সে। প্রফেসর প্রায় ধরে ফেলেছিলেন কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল। দশ ফুট পাখা মেলে চক্কর দিতে লাগল ওটা। তার গা থেকে ঝাঁঝাল একটা গন্ধ বাতাসকে ভারি আর বিষাক্ত করে তুলল।

গ্যালারির লোকেরা এই খুনী রক্তচক্ষু আর ভীষণ ঠোঁটওয়ালা প্রাণীটি তাদের কাছে এলেই ভয়ে চিৎকার করে উঠছে। এত আওয়াজে ভয় পেয়ে প্রাণীটার ওড়ার বেগ বেড়ে গেল। দেয়ালে আর ঝালরে বাড়ি খেয়ে খেয়ে ভীত উন্মত্ত হয়ে উঠল সে।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার চিৎকার করে উঠলেন, 'শিগগির কেউ জানালাটা বন্ধ করুন!' মঞ্চের উপরে মানসিক যাতনায় ছটফট করতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু হায়! তাঁর কথা মত কেউ জানালা বন্ধ করার আগেই জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল জীবটা।

ধপ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন চ্যালেঞ্জার। আর দর্শকমণ্ডলী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, ভয়ের কারণ দূর হয়েছে এখন।

এর পরের দৃশ্য বর্ণনাতীত। দুই ভিন্নমত পোষণকারী দলই এবার একত্র হয়ে একটা বিশাল ঢেউয়ের মত এগিয়ে গেল মঞ্চের দিকে। যতই এগিয়ে এল তাদের উল্লসিত চিৎকারও ততই জোরাল হলো। মঞ্চে উঠে তারা চার বীর নায়ককে মাথায় তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। এটা অবশ্যই বলা যায় যে প্রথমে কেউ কেউ তাঁদের কথা অবিশ্বাস করে ত্রুটি করলেও এই সম্মান দেখিয়ে তা তারা সুদে আসলে পরিশোধ করল।

ল্যাঙহ্যাম হোটেলের ওপাশ থেকে অক্সফোর্ডসাকার্স পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। প্রায় এক লক্ষ লোক জমা হয়েছিল হলের বাইরে। মহানায়ক চারজনকে দেখা মাত্রই উল্লসিত সম্বর্ধনার বিপুল রব উঠল জনতার মাঝে।

রাত বারোটার সময়ে বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে জনতা লর্ড রক্সটনের বাড়ির কাছে এসে আনন্দের গান–'দে আর জলি গুড ফেলোস'–গেয়ে তবে মুক্তি দেয় ওঁদের।

গ্ল্যাডিসের কল্পনায় আকাশে বিচরণ করছিলাম আমি এতদিন। কিন্তু এবার যেন শক্ত মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লাম। সে কি বেঁচেই আছে না মারা গেছে? তার কাছ থেকে সাউদ্যাম্পটনে কোন চিঠি বা টেলিগ্রামই আমি পাইনি। হয়তো বা

কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে তার;–থাকলে আবার কল্পনার আকাশে উড়ব আমি।

স্ট্রাদামের ছোট্ট ভিলায় পৌঁছলাম রাত দশটায়। এক ছুটে সামনের উঠান পেরিয়ে দুমাদুম কিল মারলাম দরজায়। ভিতরে গ্ল্যাডিসের গলার আওয়াজ শুনলাম। পরিচারিকা দরজা খুলতেই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ড্রইংরুমে হাজির হলাম আমি। পিয়ানোর পাশে নিচু সোফায় বসে আছে গ্ল্যাডিস। তিন কদমে হাজির হলাম আমি তার পাশে।

গ্ল্যাডিসের হাত দুটো আমার হাতে তুলে নিয়ে ভাবাবেগে ডাকলাম, 'গ্ল্যাডিস! ওহ্ গ্ল্যাডিস!'

অবাক হয়ে সে আমার মুখের দিকে চাইল। কোথায় যেন একটু বদলে গেছে ও। তার চোখের ভাষা, কঠিন ভাবে চোখ তুলে চাওয়া–চাপা ঠোঁট, সবই আমার কাছে নতুন লাগল। হাত টেনে নিল গ্ল্যাডিস।

'এসবের মানে কি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'গ্ল্যাডিস!' আর্তনাদ করে উঠলাম আমি, 'কি হয়েছে তোমার? তুমি আমার গ্ল্যাডিস–ছোট্ট গ্ল্যাডিস হাঙ্গারটন নও কি?'

'না,' জবাব দিল সে, 'আমি গ্ল্যাডিস পট্‌স্। এসো তোমার সাথে আমার স্বামীর পরিচয় করিয়ে দেই।'

জীবন কত অযৌক্তিক, কত অবাস্তব! যন্ত্রচালিতের মত মাথা ঝুঁকিয়ে লাল চুলওয়ালা ছোট্ট মানুষটার সাথে হাত মেলালাম আমি। হাতাওয়ালা চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বসেছিলেন উনি এতক্ষণ।

'বাবা আপাতত আমাদের এখানে থাকতে দিয়েছেন। আমাদের নতুন বাসা ঠিকঠাক করা হচ্ছে,' মৃদু স্বরে বলল গ্ল্যাডিস।

'ও, আচ্ছা?'

'তুমি পারায় আমার চিঠি পাওনি তা হলে?'

'কই, কোন চিঠি আমি পাইনি তো?'

'দুর্ভাগ্য–চিঠিতে সব পরিষ্কার করে লেখা ছিল।'

'যাকগে, এখন সবই পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার।'

'আমি উইলিয়ামকে তোমার ব্যাপার সবই বলেছি–আমাদের মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই,' বলল গ্ল্যাডিস। 'আমি দুঃখিত–কিন্তু একটা খুব গভীর টান থাকলে কি তুমি আমাকে এখানে একা ফেলে পৃথিবীর অন্য মাথায় চলে যেতে পারতে? খুব চোট পাওনি তো তুমি?'

'আরে না–বিন্দুমাত্র না। আচ্ছা চলি।'

'একটু মিষ্টি মুখ করে যান,' ছোটখাট লোকটি বললেন।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেই একটা অদম্য ইচ্ছা জাগল আমার মনে। ঝট্ করে আবার দরজা খুলে আমি ফিরে গেলাম আমার সফল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে। একটু অপ্রতিভভাবে ভয়ে ভয়ে চাইলেন তিনি আমার দিকে।

'আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সম্ভব হলে নিশ্চয়ই দেব,' বললেন তিনি।

'কি করেছেন আপনি, গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছেন, মেরু আবিষ্কার করেছেন নাকি চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন উড়ে–কি করে সম্ভব করলেন আপনি এটা?'

'প্রশ্নটা কি একটু বেশি ব্যক্তিগত হয়ে গেল না?'

'তা হলে অন্তত এটা বলুন, আপনার পেশা কি?'

'আমি একজন উকিলের কেরানী। জনসন আর মেরিডেইলস-এর দুই নম্বর লোক।'

শুভরাত্রি জানিয়ে চলে এলাম ওখান থেকে। মনের ভিতরে আমার রাগ, দুঃখ আর অট্টহাসি যেন একসাথে টগবগ করে ফুটছে।

লর্ড জনের বাসা। আমরা চারজনই একসাথে হয়েছি, হাসি গল্পের মাঝে আমরা অভিযানেরই স্মৃতিচারণ করছি।

রাতের খাওয়ার পরে লর্ড জন জানালেন যে তাঁর কিছু বক্তব্য আছে। আলমারী থেকে ছোট্ট একটা বাক্স বের করে এনে আমাদের সামনে টেবিলের উপর রাখলেন তিনি।

'একটা কথা,' বললেন জন, 'হয়তো আপনাদের আগেই জানানো উচিত ছিল আমার, কিন্তু আমি নিজে নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলতে চাইনি। সবাইকে আশা দিয়ে পরে নিরাশ করার কোনই মানে হয় না। কিন্তু কেবল আশা নয় এবার আমি নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি। মনে আছে আমরা টেরাড্যাকটিলের আস্তানায় যেদিন প্রথম যাই? ওটা ছিল একটা জ্বালামুখ, নীল কাদা ছিল ওখানে।'

প্রফেসরেরা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন।

'ঠিক ওই রকম নীল কাদা আমি আর এক জায়গায় দেখেছি, সেটা হচ্ছে "ডি বীয়ার্সে", কিম্বার্লির বিখ্যাত হীরা খনিতে। আমার মাথায় তখন কেবল হীরা ঘুরছিল। একটা বেতের খাঁচামত বানিয়ে আমি একদিন সারাদিন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এগুলো তুলেছি।'

বাক্সটা খুলে টেবিলের ওপর উপুড় করে দিলেন জন। সিমের বীচির মত আকার থেকে কাজুবাদামের আকারের পর্যন্ত সব রকম হীরাই রয়েছে।

'আগে জানাইনি কারণ হীরা বড় আকারের হলেও তার মূল্য খুব কম হতে পারে। কাটার ওপর নির্ভর করে হীরার দাম। তাই প্রথমদিন এসেই আমি "স্পিঙ্কস" এ একটা হীরা নিয়ে গিয়ে কাটিয়ে দাম যাচাই করতে দিয়েছিলাম।'

আর একটা ছোট্ট বাক্স পকেট থেকে বের করে খুলে নিজের হাতের ওপর ঢাললেন তিনি। সুন্দর একটা ঝিলিক দেয়া হীরার টুকরো গড়িয়ে পড়ল। এত সুন্দর হীরা সচরাচর চোখে পড়ে না।

'এটা দাঁড়িয়েছে তার ফল,' বললেন জন, 'সবগুলোর দাম দুই লক্ষ পাউণ্ড

হবে বলেই জহুরীর ধারণা। আমি মনে করি এগুলো আমাদের সবার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়া উচিত। এক একজনের ভাগে তা হলে পড়ছে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড।'

চ্যালেঞ্জার বললেন, 'যদি সত্যিই তুমি সমান ভাগের জন্যে জোরাজুরি করো তবে আমার টাকা দিয়ে আমি একটা নিজস্ব যাদুঘর বানাব। এটা আমার অনেক দিনের স্বপ্ন।'

'আপনি কি করবেন, প্রফেসর সামারলী?'

'আমি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে খড়ি মাটির ফসিলের চূড়ান্ত শ্রেণী বিভাগ শেষ করার কাজে মন দেব।'

'আমার টাকা আমি খরচ করব আবার একটা সুগঠিত দল নিয়ে মালভূমিতে ফিরে আরও অনুসন্ধানের কাজে,' বললেন জন। 'আর আমাদের তরুণ বন্ধু নিশ্চয়ই বিয়েতে কাজে লাগাবে তোমার অংশ?'

'না, বিয়ে করছি না আমি এখন,' একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম আমি। 'আপনার আপত্তি না থাকলে আপনার সঙ্গী হয়ে আবার মালভূমিতে যেতে চাই আমি।'

কোন কথা না বলে লর্ড রক্সটন টেবিলের উপর দিয়ে তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

***

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!

www.Banglapdf.net